বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক (১৯৯১-২০০৯)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে এম.ফিল.ডিগ্রী প্রদানের শর্তাবলীর অংশবিশেষ পূরণের নিমিত্তে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

আশরাফুন নাহার
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ
মে, ২০১৮।

প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, জনাবা আশরাফুন নাহার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের (২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষের) একজন নিয়মিত এম.ফিল গবেষক। তাঁর রেজিস্ট্রেশন নং ৭০। তিনি আমার তত্ত্বাবধানে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণকরত: "বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক (১৯৯১-২০০৯)" শীর্ষক মৌলিক গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছেন। আমার জানামতে উক্ত শিরোনামে ইতোপূর্বে কোনো মৌলিক গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়নি।

জনাবা আশরাফুন নাহার এ গবেষণা কর্ম বা থিসিসটি পুরোপুরি বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করেন নি। আমি তাঁর থিসিসের প্রতিটি অধ্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি এবং থিসিসটি ইতিহাসে এম.ফিল.ডিগ্রি প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০।

গবেষকের ঘোষণাপত্র

আমি আশরাফুন নাহার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষের একজন পূর্ণকালীন এম.ফিল. গবেষক। আমার রেজিস্ট্রেশন নং ৭০। আমার গবেষণার শিরোনাম হলো "বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক (১৯৯১-২০০৯)"। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী আমার সম্মানিত গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক। ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত এ গবেষণা কর্মটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণা। এ থিসিসের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ইতোপূর্বে কোথাও কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন বা প্রকাশিত হয়নি। থিসিসের অংশবিশেষ বা কোনো অধ্যায় ইতোপূর্বে কোথাও প্রদর্শিত হয়নি।

আশরাফুন নাহার
এম.ফিল. গবেষক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

"বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক (১৯৯১-২০০৯)" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পকে থিসিস আকারে গড়ে তুলতে আমাকে সক্ষমতা দানের জন্য আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জাগতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রথমেই আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণার সুদীর্ঘ কয়েকটি বছর তিনি নিরলসভাবে আমার গবেষণাকর্মের খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত বিস্তারিত দেখেছেন, সংশোধন করেছেন, সঠিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করার দিক নির্দেশনা দান করেছেন এবং আমার থিসিস লিখতে ব্যবহৃত তথ্য উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আরো কতিপয় শিক্ষক মণ্ডলীর কাছেও আমার এ থিসিস লেখার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছি। তারা হলেন যথাক্রমে- অধ্যাপক ড. আহমেদ কামাল, অধ্যাপক ড. নূরুল হুদা আবুল মনসুর, অধ্যাপক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রমূখ। এছাড়া আমার সহপাটি বন্ধু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তপন কুমার পালিত ও রাজীব কুমার মণ্ডল থিসিস বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান শাহীন, ঢাকা কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. হাফিজুর রহমান বিভিন্ন সময়ে নানা পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

উপরোক্ত একাডেমিক ও গবেষণা বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত আমার পরিবারের কয়েকজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তারা হলেন আমার মা মোসাঃ জায়দা খাতুন, বড় বোন মোসাঃ রোকেয়া বেগম, বোন জামাই মো. ইকবাল সিদ্দিকী, বড় ভাই রোকন, মেজো ভাই খোকন এবং ছোট ভাই আশরাফুল। আমার স্বামী মো. নাজমুল হক আমাকে সব সময় থিসিস লেখার জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও ধন্যবাদ দান করছি।

পরিশেষে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভসসহ যেসব লাইব্রেরি ও নথিশালা ব্যবহার করেছি, সেসব গ্রন্থাগার ও নথিশালার গ্রন্থাগারিক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে আমার গবেষণাকর্মে সহায়তা দান করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষকরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার শেখ মো. জামাল ভাইকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থিসিসটি অনেক যত্নসহকারে বাধাঁই করেছেন মো. সোবহান। আমি তাকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তবে মুদ্রণ প্রমাদ ও অন্যান্য সকল ত্রুটির দায়িত্ব আমার নিজের।

পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আরেকবার শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আশরাফুন নাহার।

সার-সংক্ষেপ

"বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক (১৯৯১-২০০৯)" শীর্ষক বর্তমান এম.ফিল. অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পর্ক উন্নয়নে বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা এবং সমাধানের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধোত্তরকালে, বিশেষকরে একুশ শতকের শুরুতে সমগ্র বিশ্বে একদিকে যেমন শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের প্রক্রিয়া। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মিয়ানমার স্বৈরাচারী সামরিক শাসন দ্বারা আবদ্ধ অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তবে স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হবার পর সারা বিশ্বে সামরিক উত্তেজনা প্রশমনের ফলে মিয়ানমারেও শিল্প-কারখানা ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের পথ দ্রুততর হয়। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মিয়ানমারের ওপর আরোপিত অবরোধ শিথিল করায় মিয়ানমারের নিজস্ব পদ্ধতিতে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য খাতগুলো আরো সুস্পষ্টরূপ ধারণ করে। ফলে মিয়ানমারের পক্ষ থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করে তোলার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মিয়ানমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা আসিয়ান-এর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ২০০৯ সালের দিকে দেশটি প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়। ঠিক এই পটভূমিকায় বাংলাদেশের সঙ্গে ৯০-এর দশকের শুরু থেকে মিয়ানমারের সম্পর্কের ক্ষেত্র বহুমূখী রুপ পরিগ্রহ করে।

"বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক (১৯৯১-২০০৯)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই পাঁচটি অধ্যায়ে যে সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তা হলো - (১) ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির সংক্ষিপ্ত চিত্র, (২) চট্টগ্রামের আরাকানী রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা, (৩) বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ, (৪) বাংলাদেশ-মিয়ানমার বাণিজ্যিক সম্পর্ক, (৫) উপসংহার।

পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত অভিসন্দর্ভের মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে ভূমিকায় গবেষণার পরিসর ও যৌক্তিকতা, প্রকাশনা পর্যালোচনা, উপাদান, পদ্ধতি এবং অধ্যায় বিভাজন আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির অংশে দুটি দেশের জাতীয় স্বার্থই যে সম্পর্কের ভিত গড়ে দিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চট্টগ্রামের আরাকানী রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার দুটি দেশের মধ্যে যে সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং এর প্রভাব বাংলাদেশের ওপর কিভাবে পড়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধের প্রেক্ষাপটে সমুদ্র আইন, এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, এর প্রভাব এবং সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার বাণিজ্যিক সম্পর্কে দুদেশের বাণিজ্য চিত্র, এর প্রভাব, চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ, প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি এবং মিয়ানমারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ সড়ক বিষয়ে দুদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় উপসংহারে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের প্রকৃতি মূল্যায়ন করা হয়েছে।

এক নজরে বাংলাদেশ

অফিসিয়াল নাম	: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
রাজধানী	: ঢাকা
স্বাধীনতা দিবস	: ২৬শে মার্চ
ভৌগোলিক অবস্থান	: দক্ষিণ এশিয়ায় ২০"৩৪° উত্তর থেকে ২৬"৩৮° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যবর্তী এবং ৮৮"০১° পূর্ব হতে ৯২"৪১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে বাংলাদেশ অবস্থিত।
এলাকা	: ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার
আঞ্চলিক সমুদ্র	: ১২ নটিক্যাল মাইল
জনসংখ্যা	: ১৩০,০৩ মিলিয়ন (আদমশুমারি ২০০১)
ঘনত্ব	: ৮৮১ প্রতি বর্গ কিলোমিটার (জনগণনা- ২০০১)
বৃদ্ধির হার	: ১.৫৪
অঞ্চলভিত্তিক জনসংখ্যা	: পল্লী- ৭৬.৫৭% এবং শহুরে- ২৩.৪৩%
শিক্ষার হার (৭+)	: উভয় লিঙ্গ- ৪৫.৩, পুরুষ- ৪৯.৬, মহিলা ৪০.৬ (জনগণনা ২০০১) উভয় লিঙ্গ- ৬১.৩, পুরুষ- ৬৫.৯, মহিলা ৫৬.৫ (অন্তত ১ম গ্রেড এ সমাপ্ত)
শিক্ষার হার (১৫+)	: উভয় লিঙ্গ- ৪৭.৫ পুরুষ-৫৩.৯, মহিলা ৪০.৮ (জনগণনা-২০০১)
মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়	: টাকা ২৮৪৪৩ (৪৬৩ মার্কিন ডলার) (২০০৪-০৫, বিবিএস)
ভাষা: জাতীয় ভাষা	: বাংলা- ৯৮%, এছাড়া ইংরেজি ভাষার ব্যবহারও হয়।
জাতীয়তা	: বাংলাদেশী
ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা	: মুসলিম (৮৯.৭%), হিন্দু (৯.২%), বৌদ্ধ (০.৭%), খ্রিস্টান (০.৩%), সর্বপ্রাণবাদী এবং উপজাতীয় ধর্মে বিশ্বাসী (০.১%)
সময়	: গ্রিনিচ মান সময় + ৬.০০ ঘন্টা
প্রধান ঋতু	: শীতকাল (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী), গ্রীষ্মকাল (মার্চ-জুন), বর্ষাকাল (জুলাই-অক্টোবর)
প্রধান নদী	: পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও কর্ণফুলী (উপনদী সহ মোট ২৩০টি নদী - বিবিএস পকেট বই ২০০৩)
শ্রেষ্ঠ পর্যটন মৌসুম	: অক্টোবর থেকে মার্চ
মুদ্রা	: টাকা
বিনিময় হার	: ১ ডলার (ইউএস) = ৪৬.৯০৬ টাকা (২০০১)

উৎস: Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, http://www.banbeis.gov.bd/bd_pro.html

এক নজরে মিয়ানমার

অফিসিয়াল নাম	: দ্যা রিপাবলিক অব দ্যা ইউনিয়ন অব মিয়ানমার
অফিসিয়াল রাজধানী	: নাই পি তাও (Nay Pyi Taw)
অর্থনৈতিক রাজধানী	: ইয়াঙ্গুন
সরকার পদ্ধতি	: সামরিক শাসন (মার্চ, ২০১১ সালে সামরিক সরকার থেকে বেসামরিক সংসদীয় সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে)।
স্বাধীনতা দিবস	: ৪ঠা জানুয়ারী (৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৮ ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে)।
ভৌগোলিক অবস্থান	: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ২২.০০ উত্তর এবং ৯৮.০০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে মিয়ানমার অবস্থিত।
আয়তন	: ৬৭৬,৫৭৬ বর্গ কিলোমিটার
উপকূল	: ১,৯৩০ কিলোমিটার
জনসংখ্যা	: ৫৫ লাখ (প্রায়) (জুলাই, ১৯৯৭)
জন্মহার	: ২৯.৫৪/১০০০ জনসংখ্যায় (১৯৯৭)
মৃত্যুহার	: ১১.৪১/ ১০০০ জনসংখ্যায় (১৯৯৭)
বৃদ্ধির হার	: ১.৮১% (১৯৯৭)
শিক্ষিতের হার	: ৯০% প্রায়
মাথাপিছু মোট প্রবৃদ্ধি	: ১,১২০ মার্কিন ডলার (১৯৯৬)
ভাষা	: বার্মিজ, সংখ্যালঘুদের তাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে।
জাতীয়তা	: বর্মি
ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যা	: বৌদ্ধ ৮৯%, খ্রিস্টান ৪%, মুসলিম ৪%, সর্বপ্রাণবাদী ১%, অন্যান্য ২%
জাতিগোষ্ঠী	: একশ'র বেশি জাতিগোষ্ঠী, প্রধান বর্মণ ৬৮%, শান ৯%, কারেন ৭%, রাখাইন ৪%, চীনা ৩%, ভারতীয় ২%, সোম ২%, অন্যান্য ৫%
ভূমি সীমানা	: মোট ৫,৮৭৬ কিলোমিটার
জলবায়ু	: দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ু, জুন থেকে সেপ্টেম্বর; উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু, ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল
প্রধান নদী	: ইরাবতী
প্রাকৃতিক সম্পদ	: পেট্রোলিয়াম, কাঠ, মূল্যবান পাথর, প্রাকৃতিক গ্যাস, জলবিদ্যুৎ, টিন, দস্তা, তামা, দুষ্প্রাপ্য ধাতু, কয়লা, মার্বেল
মুদ্রা	: কিয়াট
বিনিময় হার	: ১ ডলার (ইউএস) = ৬.০৬০০ কিয়াট (১৯৯৭)

উৎস: Facts at a Glance: Myanmar (Burma) http://www.edwebproject.org/seasia/facts.myanmar.html

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নম্বর
প্রত্যয়ন পত্র	ঃ	I
ঘোষণাপত্র	ঃ	II
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ঃ	III
সার-সংক্ষেপ	ঃ	IV
এক নজরে বাংলাদেশ	ঃ	V
এক নজরে মিয়ানমার	ঃ	VI
সূচিপত্র	ঃ	VII
ভূমিকা	ঃ	০১-২০
প্রথম অধ্যায়ঃ		
ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতি	ঃ	২১-৫০
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ		
চট্টগ্রামের আরাকানী রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা	ঃ	৫১-১০৪
তৃতীয় অধ্যায়ঃ		
বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ	ঃ	১০৫-১৪৫
চতুর্থ অধ্যায়ঃ		
বাংলাদেশ-মিয়ানমার বাণিজ্যিক সম্পর্ক	ঃ	১৪৬-১৮২
পঞ্চম অধ্যায়ঃ		
উপসংহার	ঃ	১৮৩-১৯৪
আলোকচিত্র	ঃ	১৯৫-২০৪
গ্রন্থপঞ্জী	ঃ	২০৫-২২০

ভূমিকা

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দুটি দেশ। একসময় বাংলাদেশ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল, যদিও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। অন্যদিকে নু-এটলী (Nu-Attlee Treaty) চুক্তির অধীনে বার্মা (বর্তমান নাম মিয়ানমার) ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা এবং বিনিয়োগ, পর্যটন, দ্বিপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে উভয় দেশরই ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিকত্তোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার উভয়েরই ২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, যা নাফ্ নদী দ্বারা নির্দেশিত। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যে গভীরতম সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য উভয় দেশের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও দ্বিপক্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান প্রয়োজন। কেননা আরাকানের মংডু, বুথিডং হতে আসামের মনিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গনে নেতাজি সুভাষ বসু, কর্নেল শাহনেওয়াজ ও ক্যাপ্টেন রশিদ আলীর 'আজাদ হিন্দু ফৌজের' অমর কীর্তি কাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গর্বিত পটভূমি। একদা দুই দেশের জনগণের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের অজস্র নজির রয়েছে। ইতিহাসের পটভূমিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেই সৌভ্রাতৃত্বের পুনরুজ্জীবনই আমাদের কাম্য।[১]

ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত বার্মা[২] ও বাংলাদেশের[৩] মধ্যে বহু পূর্ব থেকেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের চট্রগ্রাম ছিল আরাকান রাজ্যের দখলে এবং এই সময়ে ত্রিপুরা ছিল তার করদ রাজ্য।[৪] ১৭৬০ সালে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশের নবাব মীর কাশিমের নিকট হতে চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলাগুলোর রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি চট্টগ্রামের রাজস্ব, উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়।[৫] কিন্তু অব্যাহত 'মগ'[৬] আক্রমণ কোম্পানির প্রচেষ্টা ব্যাহত করলে আরাকান রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে এই অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে।[৭] কিন্তু আরাকানে ক্রমাগত অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার জন্য কেবলমাত্র চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছাড়া কোনো বাস্তব সম্পর্ক গড়ে ওঠতে পারেনি।[৮]

এরই সাথে কোম্পানি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে আরাকানীদের বসতি দানের নীতি গ্রহণ করে। এর কারণ ছিল দক্ষিণাঞ্চলে মগদের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক গড়ে তোলা ছাড়াও দক্ষিণের অনাবাদি অংশ আবাদি করে তোলা। ১৭৮৫ সালে বর্মীরাজ বোধপয়া আরাকান দখল করে আরাকানকে বার্মার একটি প্রদেশে পরিণত করেন। এরফলে উদ্ভূত সীমান্ত সমস্যা স্বাভাবিকভাবেই বার্মা ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগকে অনিবার্য করে তোলে।[৯] কারণ ১৭৮৫ সালের মধ্যে কোম্পানি বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে ১৭৮৫ সালে বর্মীরাজ বোধপয়া আরাকান দখল করলে বার্মা বাংলাদেশের নিকটতম দক্ষিণ-পূর্ব প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আরাকান দখলের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম সীমান্তের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে বার্মা ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ শুরু হয়।[১০]

মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। মধ্যযুগে আরাকানে বাংলা সাহিত্যের যে বিশাল ভাণ্ডার আরাকান অমাত্যসভার পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া রচিত হয়েছিল তা এখনও বাংলাদেশের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।[১১] আরাকানের রাজসভায় আলাওল, দৌওলত কাজী ও মাগন ঠাকুরের মতো কবিগণ বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেছিলেন।[১২] আরাকানের কিছু অঞ্চল বাংলা অঞ্চলের অংশ বলেই সে সময় গণ্য হতো। একসময় রেঙ্গুন (বর্তমান ইয়াঙ্গুন) ছিল অজস্র বাঙালির আত্ম প্রতিষ্ঠার শহর, কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাদের একজন ছিলেন।[১৩]

বিশ্বের প্রথম যে কয়েকটি দেশ স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করে তারমধ্যে মিয়ানমার ছিল অন্যতম। ১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারি মিয়ানমার ৬ষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।[১৪] কামাল উদ্দিন আহমেদ লিখেছেন, বার্মা নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন করেছেন-

> "The government of Burma does not accept as principal, the solution of a country's internal problems by direct help and intervention of a foreign country's armed organization. However due to the existence of questions requiring immediate communications and actions, and also due to desire to live fraternally as neighbor, the government of Burma has recognized the state of Bangladesh and its government".

আর তখন থেকেই সরকারিভাবে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক শুরু হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি মিয়ানমারের সৌহাদ্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বাংলাদেশ প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ (Abdus Samad Azad) ১৯৭২ সালে বার্মা সফর করেন। তখন থেকেই বাংলাদেশ সম্পর্ক শক্তিশালী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেসময় সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এবং উচ্চ পর্যায়ে বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবন করে। এরপর উভয় দেশের মধ্যে বেশ কয়েকবার রাজনৈতিক সফর বিনিময় হয়। ১৯৭২ সালের ২৮শে মে ঢাকা ও রেঙ্গুন যৌথ সফরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জোটনিরপেক্ষ ও সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় মর্যাদার জন্য সমমর্যাদার ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। যা এখনও বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।[১৫]

এরই পথধরে ঢাকায় মিয়ানমারের দূতাবাস এবং রেঙ্গুনে বাংলাদেশের দূতাবাস এবং সিটুওয়ে-তে একটি কনস্যুলার অফিস খোলা হয়। বাংলাদেশ প্রথম দেশ হিসেবে মিয়ানমারের (Nay Pyi Taw) সাথে কূটনৈতিক মিশনের কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর থেকে বিচ্ছিন্ন দু-একটি ঘটনা ছাড়া এই সীমান্ত শান্তিপূর্ণই ছিল। কেবল ৮০'র দশকে মিয়ানমারের আরাকান (রাখাইন) থেকে প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের ঘটনা কিছুটা উত্তেজনা ছড়ায়। ১৯৯১ সালে নাসাকা বাহিনী টেকনাফের কাছে বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর) রেজুপাড়া সীমান্ত চৌকি বা বিওপি আক্রমণ করলে এ সমস্যার শুরু হয়। কাজেই বাংলাদেশের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অস্বিত্বের জন্য মিয়ানমারসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি এবং 'পূর্বমুখী নীতি' বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য রোহিঙ্গাসহ কোন ইস্যুতেই মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের বিরোধ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।[১৬]

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক ঃ আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের ভূমিকা

বাংলাদশ-মিয়ানমার তাদের ভৌগোলিক অর্থাৎ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত কারণে কিছু একই আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। উভয় দেশই তাদের পারস্পরিক অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন সার্ক, আসিয়ান, আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (এআরএফ), এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (এসিইউ), বিসিআইএম এবং বিমসটেক-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করছে এবং সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা চালাচ্ছে, যা সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করে। উভয়ই তাদের অন্তর্ভুক্ত সংস্থার কাঠামোর মধ্যে নীতিসমূহ দ্বারা সহযোগিতা ও সমন্বয় করার চেষ্টা করে। যা উভয় দেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। এইসব সংস্থার আয়োজিত বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে উভয় দেশের নেতাদের সাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার সুবিধা পায় যারফলে নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়। উপরন্তু, বিশ্ব রাজনীতি বৃহৎ শক্তিবর্গ অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং চীনের দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়। আবার কিছু আঞ্চলিক শক্তি যেমন ভারত, পাকিস্তানও দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। এই সমস্ত দেশসমূহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি আগ্রহী যা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। যাইহোক যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা থাকা স্বত্ত্বেও উভয় দেশই প্রাথমিক সম্পর্ক স্থাপনে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। মিয়ানমার দীর্ঘদিন যাবৎ বাইরের বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় বাংলাদেশের সঙ্গে কার্যকর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রেও কিছু স্বতন্ত্র পন্থা লক্ষ্য করা যায়। যা চীনের ছত্রছায়ায় ভৌগোলিকভাবে মিয়ানমারের বিনিয়োগ বাংলাদেশের প্রতি দুর্বলতার চিত্র তুলে ধরে; মিয়ানমার তার ছোট প্রতিবেশী বাংলাদেশের প্রতি অনেকটায় স্বেচ্ছাচারী। বাংলাদেশের প্রতি মিয়ানমারের মনোভাব ও আচরণ সর্বদা ক্ষুব্ধ। এই বিষয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, ভারত ও চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের তাত্ত্বিক সম্পর্কের দিক উন্নয়ন হয়েছে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয়। মিয়ানমারের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আলোচনার টেবিলে বসেছে। অপরপক্ষে, ভারত ও চীন মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতার পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করেছে এবং তার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।[১৭]

কাজেই আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ দুদেশের সম্পর্ক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। The South Asian Associatoion for Regional Cooperation (SAARC) বা সার্ক ১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদস্য দেশগুলো হলো- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান এবং আফগানিস্তান। সার্ক সদস্য দেশ সমূহের মধ্যে অর্থনীতি, কৃষি, পরিবেশগত এবং অন্যান্য অনেক দিক নিয়ে কাজ করে। সার্ক মূলত যে সমস্ত বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করে সেসব ক্ষেত্রগুলো হলো- কৃষি এবং গ্রাম, জৈবপ্রযুক্তি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শুক্তি, পরিবেশ, অর্থায়ন প্রক্রিয়া, মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য যোগাযোগ এবং মিডিয়া, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, দারিদ্র বিমোচন, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি, নিরাপত্তার দিক, সামাজিক উন্নয়ন, পর্যটন এবং ব্যবসা এবং অর্থ। এছাড়াও সার্ক কিছু কনভেনশন গ্রহণ করে। যার মাধ্যমে শিশুদের নিয়ে কাজ করে। এই

সমস্ত কার্যক্রম এবং উদ্যোগের মাধ্যমে সার্ক দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং সংহতি প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে।

The Associatoion of Southeast Asian Nations (ASEAN) বা আসিয়ান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য গড়ে উঠে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দশটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা, যা ১৯৬৭ সালের ৮ই আগস্ট ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে, ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার এবং ভিয়েতনাম সদস্যপদ লাভ করে। এর লক্ষ্য তার সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক বিবর্তন ত্বরান্বিত করা, আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার সুরক্ষা এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা। আসিয়ান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ করে যৌথ প্রচেষ্টায় তাদের জনগণের মধ্যে শান্তি, স্বাধীনতা এবং উন্নতির জন্য আশির্বাদ হিসেবে বিবেচিত।[১৮]

১৯৯৪ সালে ASEAN Regional Forum (ARF) বা এআরএফ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সদস্য দেশের মধ্যে রাজনৈতিক এবং জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে। বাংলাদেশ ২০০৬ সালে এর সদস্য হয়। এতে ২৭টি রাষ্ট্র একসাথে কাজ করছে- অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ব্রুনেই দারুসসালাম, কম্বোডিয়া, কানাডা, চীন, ইরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, মঙ্গোলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, রুশ ফেডারেশন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, তিমুর লেসথে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভিয়েতনাম।[১৯]

Asian Clearing Union (ACU) বা এসিইউ এশিয়ার কিছু দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমন্বয়ে গড়ে উঠা লেনদেন নিষ্পন্ন সংস্থা। ১৯৭৪ সালে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সহজে লেনদেন সম্পন্ন করার তাগিদ থেকে এ সংস্থা গড়ে তোলা হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্য সংখ্যা ৬টি ছিল। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগুলো হচ্ছে-বাংলাদেশ ব্যাংক, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (ভারত), সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ দ্যা ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান, নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ শ্রীলংকা। ১৯৭৭ সালে সেন্ট্রাল ব্যাংক অব মিয়ানমার, ১৯৯৯ সালে রয়্যাল মনিটারি অথরিটি অফ ভুটান এবং ২০০৯ সালে মালদ্বীপ রয়্যাল মনিটারি অথরিটি সংস্থাটিতে যোগ দেয়। এর মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের পন্থা সহজ হয়।[২০]

Bangladesh-China-India-Myanmar Forum for Regional Cooperation (BCIM) বা বিসিআইএম হলো বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডর। এই করিডর প্রধানত সড়ক পথের দ্বারা গড়ার কথা হয়েছে। এই করিডরের মোট দৈর্ঘ্য ২৮০০ কিলোমিটার। বিসিআইএম করিডর এর প্রধান লক্ষ্য হলো ভারত এর পূর্ব অঞ্চলের প্রধান ও দেশের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র কলকাতার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম চীন এর প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র কুনমিং এর উন্নত যোগাযোগ ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো। করিডরটি পশ্চিমবঙ্গ এর রাজধানী কলকাতা থেকে শুরু হয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা হয়ে আসাম-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে আবার ভারত-এ প্রবেশ করে শিলচল শহরে পৌঁছায়। এরপর এটি হ্ফল হয়ে ভারত-

মিয়ানমার সীমান্ত অতিক্রম করে মিয়ানমারের শহর মান্ডালায় পৌঁছায়। শেষে মিয়ানমার-চীন সীমান্ত অতিক্রম করে চীন এর কুনমিং শহরে পৌঁছায়।[২১]

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) বা বিমসটেক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশকে নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক জোট। ১৯৯৭ সালের ৬ই জুন বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের একটি বৈঠকে ব্যাংককে একটি নতুন আন্তঃআঞ্চলিক জোট সৃষ্টি করা হয় এবং সভায় অংশগ্রহণকারী মূল আলোচকদের দেশের নামের অধ্যাক্ষর অনুযায়ী এই জোটের নাম দেয়া হয়- BIST-EC - Bangladesh, India, Sri Lanka & Thailand Economic Cooperation। প্রসঙ্গত, মিয়ানমার এই প্রারম্ভিক সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশ নেয়। পরবর্তীতে, ১৯৯৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মিয়ানমারকে পূর্ণ সদস্য হিসেব গ্রহণ করা হয়। মিয়ানমারের সদস্য হিসেবে যোগদানের পর সংগঠনের নামটি কিছুটা পরিবর্তন করে BIMST-EC করা হয়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের ২য় বৈঠকে নেপালকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়া হয়। পরবর্তীতে, ২০০৩ সালে নেপাল ও ভূটানকে সংগঠনটির পূর্ণ সদস্যের পদ প্রদান করা হয়। ২০০৪ সালের ৩১শে জুলাই সংগঠনের প্রথম আনুষ্ঠানিক শীর্ষ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ সংগঠনটির নাম পরিবর্তনের পক্ষে মত দেন। এবং সংগঠনটির পরিবর্তিত নাম- BIMSTEC বা Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical & Economic Cooperation। বিমসটেক এর সদরদপ্তর বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত। বিমসটেক এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং বঙ্গোপসাগর উপকূলের দেশগুলোর মধ্যে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগীতার ক্ষেত্র তৈরি করা। এছাড়া ব্যবসা, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, পর্যটন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পোশাক ও চামড়া শিল্প সহ আরো অনেকগুলো ক্ষেত্র বিমসটেক এর মূল উদ্দেশ্যভুক্ত।[২২] যেহেতু এ সমস্ত আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন উন্নয়নে সহায়তা করা। তাই বাংলাদেশ-মিয়ানমার এ সমস্ত সংস্থার সদস্য হওয়ায় পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থানের ফলে এক অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে যা উভয়ের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করবে।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক ঃ বৃহৎ শক্তিসমূহের ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দরিদ্র দেশ। দেশটি অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত, দুর্ভিক্ষ এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। উপরন্তু বাংলাদেশ মিয়ানমারের পূর্বাঞ্চলের আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সম্মুখীন হয়।[২৩] অন্যদিকে মিয়ানমারে দীর্ঘমেয়াদি গৃহযুদ্ধ চলমান থাকায় শিশু শ্রম, মানব পাচার, বাক স্বাধীনতার অভাব সহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের নজির দৃশ্যমান; এছাড়াও পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘমেয়াদী সামরিক শাসনের অধীন একটি দেশ। মিয়ানমার প্রজাতন্ত্র (মিয়ানমারের ঔপনিবেশিক নাম বার্মা; ১৯৮৯ সালে জান্তা সরকার দেশটির নাম বার্মা পরিবর্তন করে মিয়ানমারে রাখে। মিয়ানমারের জান্তা সরকার দেশটির নামের সাথে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করে। দেশটির সরকারি নাম 'ইউনিয়ন অব মিয়ানমার'-এর স্থলে 'দ্যা রিপাবলিক

অব দ্যা ইউনিয়ন অব মিয়ানমার' রাখা হয়;) দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্যে অবস্থিত এবং বাংলাদেশ, চীন, ভারত, লাওস এবং থাইল্যান্ডের সীমান্তবর্তী দেশ। এরফলে, মিয়ানমারের ভৌগোলিক অবস্থান পাশ্চাত্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে পাশ্চাত্যের কৌশলগত উপস্থিতি এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে সক্ষম, যা দ্রুত অর্থনৈতিক এবং সামরিক উভয়ভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই মিয়ানমার এবং এশিয়ার গুরুত্ব দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২৪] এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কয়েকটি কারণ হলো-

প্রথমত, মিয়ানমারে বাংলাদেশের ঔষধ, তৈরি পোষাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসহ হালকা শিল্পপণ্যের চাহিদা রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে মিয়ানমারের চাল, গ্যাস ও জলবিদ্যুৎ প্রয়োজন।
দ্বিতীয়ত, ভারত-চীনের চাপের মধ্যে মিয়ানমারেরও নতুন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন।[২৫]

তৃতীয়ত, প্রতিবেশী বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার এশিয়ার দুটি স্বল্পোন্নত দেশ। ভৌগোলিক সংযুক্তি ছাড়াও বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের ঐতিহাসিক ও ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার সম্পর্ক রয়েছে। ভৌগোলিকভাবে ভারতের মতো মিয়ানমারও বাংলাদেশের সীমানার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। ভূকৌশলগতভাবে চীনের পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্যও মিয়ানমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে হিসেবে কাজ করে।[২৬]

এটা ঠিক যে, সামনের দিনগুলোতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ব অর্থনৈতিক অভিমুখ ইতিমধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে অর্থাৎ পূর্বমুখী হয়েছে। কাজেই বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মতো পূর্বমুখী কূটনীতিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তাছাড়া মিয়ানমার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ যা পশ্চিমাশক্তির প্রয়োজন। মিয়ানমারে তাদের অস্ত্র বিক্রি করা প্রয়োজন। মার্কিন কোম্পানি শেভরন (CHEVRON) মিয়ানমারের গ্যাসক্ষেত্রগুলোর বিরাট অংশের মালিক। ঐ গ্যাস যে পাইপলাইনে রপ্তানি হয়, সেটাও বানিয়েছে মার্কিন কোম্পানি হ্যালিবার্টন (Halliburton)। ব্রিটিশ মোটর কোম্পানি রোলস-রয়েস (Rolls-Royce) এবং পর্যটন কোম্পানি ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস (Orient-Express) এর মতো অনেকের ব্যবসা রয়েছে মিয়ানমারে। দেশটি ব্রিটেনের অস্ত্র বাণিজ্যের নিয়মিত ক্রেতা। ফরাসি কোম্পানি টোটালও (TOTAL) মিয়ানমারের গ্যাস সম্পদের অন্যতম ভাগিদার। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ইসরায়েলও বাদ নেই। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর প্রশিক্ষণ তাদের হাত দিয়েই হয়।[২৭]

ভারত ও চীন এশিয়ায় প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায়, তাদের স্বার্থ ও উদ্বেগ তাদের ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করেছে। বিশেষকরে মিয়ানমারের ক্ষেত্রে এই স্বার্থগুলি অবিচ্ছিন্ন। এর কারণ মূলত উভয় দেশই মিয়ানমারের সীমানার সঙ্গে জড়িত। মিয়ানমার চীনের সাথে ২,১৮৫ কিলোমিটার সীমানা এবং ভারতের সাথে ১,৬৪৩ কিলোমিটার সীমানা ভাগ করে। দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক যে, মিয়ানমার সবসময় ভারত-চীন সম্পর্কের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌশলগত উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিয়ানমারের কৌশলগত অবস্থান ভারত ও চীনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[২৮]

কাজেই মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্কন্নোয়নে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, ভূরাজনৈতিক ও সামরিক বিবেচনাপ্রসূত একটি সুদূর প্রসারী সিদ্ধান্ত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত আগ্রহ এশিয়ার দিকে সরে যাচ্ছে। সামরিক বিশ্লেষক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা এর বেশ কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেন। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ স্টিফেন ওয়াল্ট (Stephen Martin Walt) মনে করেন যে এই পরিবর্তনের কারণ চারটি-

১. ইউরোপ কোনো বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে নেই যে যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষা প্রয়োজন হবে;
২. ইরাক ও আফগানিস্তানে ব্যর্থতা থেকে স্পষ্ট যে মধ্যপ্রাচ্যে জাতি গঠন চেষ্টা ভুল;
৩. এশিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব; এবং
৪. এ ধারণা যে এশিয়ায় চীনের উত্থান ঘটছে এবং তা মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া দরকার।

এই চারটি কারণের সব বিষয়ে একমত না হলেও এটা স্বীকার করতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের অনেকেই এশিয়ায় বিশেষকরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের প্রভাব-বলয় ক্রমবর্ধমান বলে মনে করেন। চীনের অর্থনৈতিক সাফল্য এই ধারণাকে আরও জোরদার করেছে।[২৯]

উল্লেখযোগ্যভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'দশকের পর দশক ধরে এশীয় প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে আসছে' উল্লেখ করে মার্কিন প্রশাসনের যুক্তি হচ্ছে যে, এটি বেইজিংয়ের সাথে 'শক্তিশালী প্রগতিশীল অংশীদারিত্ব বা strong progressive partnership'-এ আগ্রহী। মার্কিন নেতৃত্বের ভূমিকা সুরক্ষিত করতে প্রশাসন এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ছয়টি বিষয় চিহ্নিত করে- (১) দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তা জোটকে শক্তিশালী করা; (২) উদীয়মান শক্তির সঙ্গে মার্কিন সম্পর্ক জোরদারকরণ; (৩) আঞ্চলিক বহুমুখী সংস্থার সঙ্গে জড়িত; (৪) বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ; (৫) শক্তিশালী সামরিক উপস্থিতির প্রতিষ্ঠা; (৬) গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের অগ্রগতি। কাজেই এই সমস্ত পদক্ষেপকেই এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিষয় হিসাবে উল্লেখ করা যায়।[৩০]

এরফলে উদীয়মান অর্থনীতির এই অঞ্চলটিতে কৌশলগত কারণেই যুক্তরাষ্ট্র নিজের আধিপত্য বিস্তার এবং চীনের প্রভাব কমিয়ে আনতে চায়। বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থেই মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক সংস্কার চায়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে নতুন নীতি কৌশল। যুক্তরাষ্ট্র কোনো অঞ্চলে শুধু অর্থনৈতিক সহায়তা কিংবা শান্তি ও স্থিতিশীলতার দিকটিকেই প্রাধান্য দেয় না, নিরাপত্তাও তাদের বড় বিবেচনার বিষয়। এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে চীনের যে ক্রম সম্প্রসারণশীল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বলয় গড়ে উঠেছে মার্কিন প্রশাসনকে তা ভাবিয়ে তুলেছে।[৩১]

১৯৮৮ সালে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর এবং গণতন্ত্রের সমর্থনে সহিংসতার কারণে দেশটির ওপর অনেকবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এরমেধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা শক্তিশালী অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে।[৩২] তবে সকল দেশ এই বিষয়ে সম্মত হয়নি। মিয়ানমারের সঙ্গে শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক থাকায় চীনের সঙ্গে রাশিয়াও

মিয়ানমারের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরোধিতা করে। উভয়ই সংলাপের নীতিমালা সমর্থন করে এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে সদস্য হিসেবে তারা মাঝে মাঝে মিয়ানমারকে আন্তর্জাতিক চাপ ও সমালোচনা থেকেও রক্ষা করে।[৩৩] রাশিয়ার সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ২০০৭ সালে দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত পারমাণবিক গবেষণা চুক্তিটিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক পারমাণবিক অস্ত্র বৃদ্ধি পরিকল্পনার প্রক্রিয়া বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেসময় আন্তর্জাতিকভাবেই দাবিগুলি করা হয়েছে এমন নয়, বরং জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে বলা হয় যে, উত্তর কোরিয়া মিয়ানমার, ইরান ও সিরিয়ায় পারমাণবিক প্রযুক্তি রপ্তানি করছে।[৩৪] ফলে মিয়ানমারের সঙ্গে বৃহৎ শক্তিসমূহের সম্পর্ক বিভন্ন দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মিয়ানমারের সঙ্গে চীনের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। দেশটি দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এবং মার্কিন অবরোধের আওতায় থাকায় এর পুরো অর্থনীতিই চীনের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া মিয়ানমার চীনা অস্ত্রেরও বড় বাজার। দেশটির অবকাঠামো, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, খনিজ ও গ্যাস খাতে চীনের রয়েছে বিপুল বিনিয়োগ। মিয়ানমারের বৈদেশিক বিনিয়োগের ৯০ ভাগই চীন থেকে আসে।[৩৫]

চীনের জন্য মিয়ানমার কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পশ্চাদ্ভূমি দিয়ে ভারত মহাসাগরে সরাসরি প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে, যাতে দক্ষিণ চীন সাগর এবং মালাক্কা চ্যানেলের অসুবিধাগুলি এড়ানো যায়। মিয়ানমারের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা চীনের নিজস্ব আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং জ্বালানি সরবরাহের চ্যানেলগুলির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন এবং সিঙ্গাপুর সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তায় কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করেছে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রভাব ও নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কৌশলগতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবেই মিয়ানমারের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে চাইবে না।[৩৬]

মিয়ানমারে চীনের ভূমিকা নিরবচ্ছিন্ন, কারণ এটি দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার (ভারত চতুর্থ অবস্থানে) এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের বৃহত্তম উৎস। ১৯৮৯ সালে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করা হলে উল্লেখযোগ্যভাবে মিয়ানমারে চীনের প্রভাবের ক্ষেত্র ব্যাপকতা পায়। চীন মিয়ানমারের বন্দর উন্নয়নে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করেছে, ফলে ভারত মহাসাগরে আরও বেশি প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের আধিপত্য এবং এর বিশাল শক্তি সংরক্ষণের কারণে মিয়ানমারের প্রতি চীনের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত আগ্রহ রয়েছে। কোকা দ্বীপে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পোস্ট স্থাপন করায় তা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। চীন এর পাশাপাশি মিয়ানমারের সমুদ্র বন্দরগুলিতে চীনা নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সক্ষম ডক যুক্ত করা, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানি সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি করে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করে। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে পারস্পরিক সুবিধা এবং স্বার্থের জন্য শক্তশালী কৌশলগত অংশীদারিত্ব তৈরি হয়েছে। কৌশলগত বিশ্লেষণ অনুসারে এটা ঠিক যে, চীন বাংলাদেশের কৌশলগত গুরুত্বকে স্বীকার করে। কারণ বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির ভারতের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন যা সার্ক ও আসিয়ানের মধ্যকার একটি সেতু হিসেবে কাজ করে এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে ভারত

মহাসাগরে প্রবেশাধিকার প্রদান করে। উপরন্তু, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কূটনৈতিক তৎপরতার মতো মিয়ানমারের কাছে চীনের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ। বেইজিং মিয়ানমারের অবকাঠামো, খনি প্রকল্প, জলবিদ্যুৎ বাঁধ এবং তেল ও গ্যাস পাইপলাইনগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করছে যা দক্ষিণ চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা মেটাতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের প্রতি ক্রমবর্ধমান চীনা অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা কি দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ অথবা দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করবে তা সম্ভাব্য সংঘাতের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে পশ্চিমা শক্তিসমূহের নিজস্ব কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার ওপর নির্ভরশীল।[৩৭]

এটা উল্লেখযোগ্য যে, মিয়ানমার চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ইউনান এর অন্তর্গত অন্তর্দেশীয় প্রদেশগুলির জন্য ভারত মহাসাগর একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিয়ানমারের কাচিন সীমান্তবর্তী রাজ্যে খনি, রাবার এবং অন্যান্য শিল্পে ইউনানিজ কোম্পানিগুলো বড় বিনিয়োগকারী। এভাবে, ইউনান প্রদেশ মিয়ানমারের সীমান্তে জাতিগত সংঘর্ষের শান্তির ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। তাই চীন-এর মিয়ানমার নীতিই নির্দেশনা দিচ্ছে ইউনানের অর্থনীতিতে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৩৮]

চীন মিয়ানমারের রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, সংস্কৃতি, নিরাপত্তা ও অন্যান্য এলাকায় মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য প্রণয়নকে গতিশীল করার জন্য যোগাযোগ ও সহযোগিতার সমন্বয় সাধন করে দ্বিপাক্ষিক বিনিময়ের মাধ্যমে সুসংহতভাবে দেশটিতে বেইজিং অর্থনীতির উপস্থিতি বৃদ্ধি করছে।[৩৯] চীন মিয়ানমার ও দক্ষিণ চীনের ইউনান প্রদেশের মধ্য দিয়ে গ্যাস পাইপলাইনের সরবরাহ, হাইওয়ে এবং উচ্চ গতির রেললাইন নির্মাণের পরিকল্পনা করছে যাতে জনগণ ও মালবাহী জাহাজ কিউকপিউ (Kyaukpyu) থেকে ম্যান্ডালয় (Mandalay)-এর মধ্য দিয়ে ইউনান (Yunnan) ভ্রমণের সুযোগ পাবে। এটি পরবর্তীতে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, এভাবে ত্রি-জাতি মহাসড়কের মাধ্যমে মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ইউনান পর্যন্ত সংযোগ সম্ভব হবে।[৪০]

চীনের কোম্পানিগুলোও কিউকপির ন্যাচারাল হার্বারে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিক বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। উভয় পক্ষই রুইলি-কিউকপিউ (Ruili- Kyaukpyu) রাস্তা নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করে যা চীন-মিয়ানমারের করিডোর হিসাবে কাজ করবে। এটি বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং পরে দূরবর্তী লিঙ্কে চীনের শক্তি নিরাপত্তার সহায়ক হিসেবে প্রয়োজন।[৪১]

সাধারণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তিকে স্বাগত জানায় এবং এভাবে আঞ্চলিক পরিবেশে রূপরেখার দ্বারা অংশীদারিত্ব এবং বন্ধুত্বপূর্ণ রাজ্যের অন্তর্বর্তী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্বিন্যস্ত করে চীনের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। ২০০৫ সালে বুশ প্রশাসনের প্রস্তাব ছিল চীন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমাজে একটি 'দায়িত্বশীল অংশীদার বা responsible stakeholder' হবে এবং একই সাথে বেইজিংয়ের সম্ভাবনাকেও তুলনা করা হয়। ওবামা প্রশাসনের সাথে 'কৌশলগত আশ্বাস বা strategic reassurance'-এর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে চীন একই রকমের আধিকারিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সহযোগিতা এবং ভারসাম্য অব্যাহত রাখে। কাজেই মার্কিন প্রশাসন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীন এর

হুমকি মোকাবিলা এবং ভারসাম্য রক্ষার জন্যই প্রস্তুত হয় নি, বরং দক্ষিণ চীন সাগরে মুখোমুখি চীনা শক্তিশালী অবস্থান চ্যালেঞ্জ করার জন্যও প্রস্তুত।[৪২]

মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থানও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত "পূর্বমুখী নীতি" এবং শক্তির উৎস হিসাবে মিয়নমারকে গুরুত্ব দেয়। ভারত তার নিজস্ব কৌশলগত সুবিধার জন্য সামরিক জান্তার সঙ্গে গভীর অর্থনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী। বিশেষজ্ঞদের মতে, মিয়ানমার সরকার গণতান্ত্রিক সংস্কারের পদক্ষেপ নেওয়ার পর এবং পশ্চিমারা অবরোধ তুলে নিতে শুরু করায় দেশটিতে যে বিশাল বাজারের সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে ভারত নিজেদের বঞ্চিত করতে চায় না। হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের রিনাউদ এগ্রিতিয়্যু (Reynaud Agristeu) বলেন, মিয়ানমারের বাণিজ্যিক অংশীদার হতে ভারত তার নীতির পরিবর্তন করেছে। তিনি বলেন, 'মিয়ানমার গোটা বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর ভারত এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছে না'। একসময় ভারত সুচির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল। কিন্তু নয়াদিল্লী (ভারত) ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি এসে তাদের নীতি পাল্টায়। তারা মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। কাজেই ভারত এর সুক্ষ্ম নীতির পরিবর্তন দৃশ্যমান।[৪৩]

ফলে ভারতও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের নীতি অর্থাৎ পূর্বমুখী নীতি নিয়ে দেশটির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। ভারতের সঙ্গেও রয়েছে মিয়ানমারের গ্যাস খাতে চুক্তি ও বিনিয়োগ। বিনিয়োগে আগ্রহী জাপানও। মিয়ানমারের সঙ্গে চীন ও ভারত উভয়েরই দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমার ও ভারতের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। ভৌগোলিক এই অবস্থানগত কারণেও দেশটি মার্কিন প্রশাসনের মনোযোগের অন্যতম কারণ। গণতন্ত্রহীনতার কারণে মিয়ানমারের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্র কখনই দেশটির নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে ওঠেনি। চীনের সঙ্গে শক্তির খেলায় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মিয়ানমারের গুরুত্ব অপরিসীম।[৪৪]

কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের কাছে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয়েরই ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। মিয়ানমার সীমান্তের সঙ্গে ভারতীয় অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরামের মতো সন্ত্রাস প্রবণ অঞ্চল জড়িত।[৪৫] ভারতীয় উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির বিদ্রোহী সংগঠন মিয়ানমারকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করে। একইভাবে, মিয়ানমারের এই এলাকা থেকে বিদ্রোহীরা ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। অতএব, উভয়ের স্বার্থে এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে দমনে একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারে যা চীনের ইউনান প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত সমস্যা সমাধানের অনুরূপ।[৪৬] ভারতের যথেষ্ট সহযোগিতা ছাড়া মিয়ানমারের সঙ্গে এই অঞ্চলের বিদ্রোহ ও অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। ভারতের পূর্ব নীতির ওপর জোর দেয়ার কারণে ইন্দো-মিয়ানমার সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান মিয়ানমার-চীন সম্পর্ক এ অঞ্চলে ভারতের স্বার্থকে ক্ষুন্ন না করা পর্যন্ত বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া সম্পদ সমৃদ্ধ মিয়ানমারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘ সময় ভারতকে তার শক্তি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এ অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ সমস্যা মোকাবিলা বা চীনের উত্থান মোকাবিলা করতে ভারতকে তার নিকট-প্রতিবেশীর দিকে ইতিবাচক নীতি সহ একটি অঞ্চলব্যাপী ব্যাপক নীতি গ্রহণ প্রয়োজন।[৪৭]

ভারত-মিয়ানমার এর কৌশলগত সম্পর্কের চাবিকাঠি হলো বিদ্রোহ দমনে সহযোগিতা করা এবং ভারতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণ হলো ভারতকে উপেক্ষা করে মিয়ানমারের 'প্রভাব এলাকা বা area of influence' অন্য কোনও বৃহৎ শক্তির প্রভাবে না চলে যায়।[৪৮] ভারতের জন্য মিয়ানমারের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হলো- মিয়ানমার বঙ্গোপসাগরের পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলবর্তী এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিবেশী। মিয়ানমারের অবাধ মেলামেশা ভারতের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি; মিয়ানমারের উত্তরে চীনের সীমান্ত রয়েছে যা চীন-ভারতের বিতর্কিত সীমান্ত। সামরিক বিশ্লেষকদের ধারণা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে মিয়ামারের সংযোগের ফলে মিয়ানমারের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবের রূপরেখার ক্ষেত্রগুলো থেকে বিভিন্ন কৌশলগত জটিলতার উদ্ভব হতে পারে। ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং চীনের দক্ষিণ-এশীয় প্রদেশগুলির মধ্যে মিয়ানমার বাফার হিসাবে কাজ করে।[৪৯]

ভূ-রাজনৈতিকভাবে, লাওস ও থাইল্যান্ডের সঙ্গে মিয়ানমারের সীমান্ত সংযোগ থাকায় মিয়ানমারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ভারতের পূর্বমুখী নীতি যুক্ত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ভারত-মিয়ানমারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বিতর্কিত ইস্যু না থাকায় একটি কার্যকর কৌশলগত সম্পর্ক অতি সহজেই অর্জনযোগ্য।[৫০]

মিয়ানমারের মধ্যে ভারত ও চীনের স্বার্থ একে অপরের পরিপূরক কেননা উভয় দেশের প্রদেশগুলিতে স্থলবেষ্টিত সীমান্ত ভূ-খন্ডে রেল-সড়ক সংযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মিয়ানমার উভয় দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য শক্তির একটি প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। যদিও মিয়ানমারের মধ্যে চীন ও ভারত নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তবু উভয় দেশের জাতীয় স্বার্থে কোনো সরাসরি বিরোধ বা হুমকি নেই। তথাপি ২০১০ সালে মিয়ানমারে প্রথম নির্বাচন হওয়ার পর থেকে চীন ও ভারত উভয়ই নতুন প্রশাসনের কাছ থেকে অনেক বেশি প্রাপ্তির জন্য নিজেদের সম্পর্ক শক্তিশালী করছে। কৌশলগতভাবে ভারত ও চীন উভয়ই বিশ্বাস করে যে, মিয়ানমারের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্কই ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর বা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আধিপত্যের মূল চাবিকাঠি।[৫১]

এ অঞ্চলে মিয়ানমারের আরেকটি গুরুত্ব হলো সমুদ্র সংশ্লিষ্টতা। অর্থ্যাৎ নৌবাহিনী বা যুদ্ধজাহাজ সংক্রান্ত। ভারত মহাসাগরের এই অংশে বিশেষকরে মালাক্কা প্রণালীর মুখ পর্যন্ত ভারতীয় নৌবাহিনীর রয়েছে কার্যত একচ্ছত্র আধিপত্য। চীন সেখানে তার প্রভাব বাড়াতে চাইলেও ভারতের তাতে আপত্তি থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র যদি মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন করতে পারে, তবে সেটাও তাদের জন্য চীনা প্রভাব মোকাবিলায় সাহায্য করবে।[৫২]

কাজেই এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা প্রথমবার নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার পর সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার নামে তারা ইন্দোনেশিয়ার উত্তরাঞ্চলের একটি বিমানবন্দর তৈরি করতে সক্ষম হয়। ভারতের সঙ্গে মিয়ানমারেরও আন্দামান সাগরে কৌশলগত অবস্থান রয়েছে যা পারস্য উপসাগর থেকে দক্ষিণ চীনের সাগর পর্যন্ত ভারত মহাসাগরের জাহাজ লেনের কাছাকাছি অবস্থিত; তাই নৌবাহিনী প্রবেশাধিকারের বিষয়টি জড়িত রয়েছে।[৫৩]

তাই মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের কারণকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক বিবেচনাপ্রসূত একটি সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা উচিত। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চীন মিয়ানমারে তার উপস্থিতি বাড়াতে চেষ্টা করছে। ২০১০ সালের তথ্যানুযায়ী, এশিয়ায় চীনের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ৩শ' বিলিয়ন। এটি দেশের বাইরে চীনা বিনিয়োগের মোট প্রায় ৭২ শতাংশ। চীন এই বিনিয়োগ রক্ষায় তার রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে চাইবে; এটাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, চীন যদি এশিয়ায় তার বিনিয়োগ ও প্রভাবকে নিরঙ্কুশ করতে পারে; তবে তার পক্ষে পশ্চিম গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্লেষক ও নীতি নির্ধারকদের একাংশের মধ্যে এ ধরনের একটা আশঙ্কা রয়েছে। এসব বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় বিশেষকরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের মনোযোগ বাড়াচ্ছে। যেহেতু পূর্ব এশিয়ায় বিশেষকরে দক্ষিণ চীন উপসাগরে প্রভাব বলয় বিস্তারের আর কোনো সুযোগ নেই, সেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মিয়ানমারকে তার প্রভাবে আনা কিংবা চীনা প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে আনা খুব জরুরী।

বিশ্লেষকদের ধারণা চীন ও মিয়ানমারের দৃঢ় সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের কারণে হুমকির মুখে পড়তে পারে; এ আশঙ্কায় চীন উৎকণ্ঠিত। ঐতিহ্যগতভাবে মিয়ানমারের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক বেশ ভালো। দুই দেশের বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৫৪] কাজেই যুক্তরাষ্ট্র যে দীর্ঘমেয়াদী বিবেচনায় মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টা করছে চীন তাকে খুব সহজেই মেনে নেবে তা মনে করা অসঙ্গত। চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; ২০১০ সালে দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৪ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার। এই সময় চীনের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৬ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু চীন প্রত্যক্ষভাবে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ না করে এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশে তার উপস্থিতি ও প্রভাব বাড়িয়ে ভারসাম্য তৈরি করতে চায়।[৫৫]

তবে মিয়ানমারের প্রধান নদী ইরাবতীতে চীনের বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, ক্রমবর্ধমান চীনা অভিবাসন, বিপুল বাণিজ্যিক ঘাটতি ইত্যাদি কারণে মিয়ানমারের জনগণ চীনের প্রতি বিরূপ। কাজেই সবদিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের নতুন পূর্বযাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৫৬] আর প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ওপর এসব পরিবর্তনের প্রভাব পড়বে, সেটাই স্বাভাবিক। মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের যেসব অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনায়ও তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মিয়ানমারের যেহেতু প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, সেহেতু বাংলাদেশের উচিত বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে সমাধান করা। অন্যদিকে চীন বাংলাদেশে তার বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহী এবং এটি একটি বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের চেয়ে বেশি।[৫৭]

মিয়ানমারের প্রধান রক্ষক হলো চীন। চীন মালাক্কা প্রণালী দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার জ্বালানি সহজ পথে নিজ দেশে নিয়ে আসতে চায় এবং সেইসঙ্গে মিয়ানমারের গ্যাস বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে নেওয়ার ইচ্ছা চীনের। মিয়ানমারের ওপর চীনের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বও মোটামুটি একচেটিয়া। কারণ ভারত ও চীনের মধ্যে বাফার রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করে মিয়ানমার।[৫৮] আর মিয়ানমার-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের উত্তরোত্তর উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ তার থেকে লাভবান হবে, না ক্ষতির সম্মুখীন হবে সেটা অপেক্ষা করে দেখার বিষয় নয়, প্রয়োজন এই ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা।[৫৯] কাজেই সবদিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ-

মিয়ানমারের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উৎস, তথ্য ও উপাত্তের ব্যবহার

বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর এ পর্যন্ত তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও সমন্বিত পুস্তক রচিত হয়নি। অথচ বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল এবং মিয়ানমারের মতো প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশের মধ্যকার বিরাজমান সম্পর্কের বিভিন্ন দিক সমন্ধে সমকালীন ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের জানা উচিত অথবা ধারণা থাকা স্বাভাবিক বিষয়। বিশেষকরে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারক ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মন্ডলীর এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান ও ধারণা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। বস্তুত এ প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিবোধ থেকেই বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পর্কে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে।

গবেষণা কর্মটি লিখতে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় প্রকার উৎসের ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভের মৌলিক উৎস সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস হতে। এছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক প্রকাশিত-অপ্রকাশিত এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ ব্যবহার করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত প্রকাশিত বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাথে সমকালীন পত্রিকা হিসেবে- *আজাদ*, *সংবাদ*, *ইত্তেফাক*, *ইনকিলাব*, *সমকাল*, *প্রথম আলো*, *আজকের কাগজ*, *The Bangladesh Observer* - এর সাহায্য নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক উপাত্তের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকায় অবস্থিত মিয়ানমার দূতাবাসে সংরক্ষিত সরকারি বিবৃতির স্মারকলিপি, ঘোষণা, বাৎসরিক প্রতিবেদন, বাংলাদেশ-মিয়ানমারের কমকর্তাদের মধ্যে যৌথ মিটিং এর কার্য বিবরণী, বিভিন্ন সময়ে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উল্লেখযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত। মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের *Export Promotin Bureau (EPB)* এবং *Bangladesh Bank* -এ সংরক্ষিত মৌলিক নথিপত্র। এছাড়াও *Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), National Archives of Bangladesh, Chamber of Commerce and Industry Rangoon, National Archives of Myanmar* এবং *Rangoon University Library*-এর মতো সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যসমূহ।

প্রকাশিত দ্বৈতয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে মুষ্টিমেয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ। এরমধ্যে মো. সিরাজুল ইসলাম (১৯৯৮) লিখিত, *ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক* (১৬৪৭-১৮৮৫) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী) মিয়ানমারের সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্কের উত্থান-পতনের দ্বন্ধ এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইঙ্গ-বর্মী বেশ কয়েকটি যুদ্ধের ওপর লিখিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (১৯৯৬) লিখিত, *বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও সাম্প্রতিক বিশ্ব* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী) দক্ষিণ এশিয়া ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ওপর লিখিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এম এ হালিম (১৯৮৬) লিখিত,

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ব্র্যাক প্রকাশনা, জুলাই ১৯৯৬) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর লিখিত আরেকটি অসাধারণ মৌলিক গ্রন্থ। Nasir Uddin (ed.), (2012), *To Host or To Hurt: Counter Narratives on Rohingya Refugee Issue in Bangladesh,* (Dhaka: Institute of Culture and Development Research (ICDR) রোহিঙ্গাদের ইতিহাস, উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ নিয়ে লিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। মো. আলী চৌধুরী (২০০৪) লিখিত, *Bengal-Arakan Relations (1430-1666),* (Kolkata: Firma KLM Private Limited) বাংলা-আরাকান সম্পর্কের ওপর গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক গ্রন্থ। Martin Smith (1999) লিখিত, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity* (University Press, Dhaka) মিয়ানমারের জাতিসমূহের মধ্যে রাজনীতি এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্রোহের ওপর একটি মৌলিক প্রবন্ধ। Muzaffar Ahmed (1989) লিখিত, *Bangladesh Foreign relations: Changes and Directions* (University Press, Dhaka) বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ওপর আরেকটি মৌলিক প্রবন্ধ। Harun Ur Rashid (2001) লিখিত, *Foreign Relations of Bangladesh,* Rishi publications (Varansi) বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ওপর অপর একটি মৌলিক প্রবন্ধ। Shwe Lu Maung (1989) লিখিত, *Burma-Nationalism and Ideology-analysis of society culture and politics* (The university press Limited, Dhaka) মিয়ানমারের জাতীয়তাবাদ, সামাজিক সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক আদর্শের ওপর বিশ্লেষণাত্মক অনবদ্য মৌলিক গ্রন্থ যা আমাকে অধ্যায়গুলো লিখতে যথেষ্ট সহায়তা দান করেছে।

তবে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের ওপর উপরোক্ত গবেষণা পুস্তক ও প্রবন্ধগুলোতে বিষয়ভিত্তিক আকারে ধারাবাহিক আলোচনা বা বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন করা হয়নি। বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তকে কেবলমাত্র ইস্যু বা বিষয়ভিত্তিক ইতস্তত বা বিখণ্ডিত আকারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় বর্তমান গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের একটি পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক চিত্র উপস্থাপন করা। ফলে বর্তমান গবেষণাকর্মে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং উপসংহারে এর প্রকৃতি, ফলাফল ও প্রভাব উভয় দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরূপণ করার প্রয়াস লাভ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিসর, অধ্যায় বিভাজন

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এর আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপ্তি ১৯৯১-২০০৯ পর্যন্ত। ১৯৮৯ সালে দেশটি বার্মা নাম পরিবর্তন করে মিয়ানমার নাম ধারণ করে। দেশটি দীর্ঘকাল (১৯৬২-২০০৯) সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। ৯০-এর দশকের পর দেশটির রাষ্ট্রীয় নীতিতে বিশ্বমুখী হওয়ার পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় এবং ২০০৯ সালের দিকে দেশটি সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের অভিমুখে যাত্রা করে। ২০১০ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। মিয়ানমারের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ দিকটি বিবেচনায় রেখে অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপ্তি ১৯৯১-২০০৯ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) সম্পর্কে বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে। কিন্তু এসব গবেষণা পরিচালিত হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারত-বার্মা সম্পর্ক প্রাধান্য লাভ করেছে। বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক সমন্ধে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন রতন লাল চক্রবর্তী, তাঁর গবেষণার সময়কাল ১৭৮৫-১৮২৪ পর্যন্ত। এরপর মো. সিরাজুল ইসলাম 'ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক' শিরোনামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন যার সময়কাল ১৬৪৭-১৮৮৫। এরপর সুধাংশু রঞ্চন রায় আরো একধাপ এগিয়ে 'বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক' শিরোনামে এম.ফিল অভিসন্দর্ভ রচনা করেন যার সময়কাল ১৮৮৬-১৯৪৭। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সময়কাল ১৯৯১-২০০৯। যদিও গবেষণার স্বার্থে এ সময়ের আগে ও পরে কিছু সময়কে এই অভিসন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের বিভিন্ন দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক (১৯৯১-২০০৯)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই পাঁচটি অধ্যায়ে যে সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তা হলো-

প্রথম অধ্যায় : ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির সংক্ষিপ্ত চিত্র
দ্বিতীয় অধ্যায় : চট্টগ্রামের আরাকানী রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা
তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ
চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশ-মিয়ানমার বাণিজ্যিক সম্পর্ক
পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণা কর্মটি লিখতে আমি ঐতিহাসিক ও Empirical বা ফলিত উভয় প্রকার গবেষণা পদ্ধতির ব্যবহার করেছি। বিভিন্ন মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেণীকরণ করার সাথে সাথে সেগুলোর মূল বক্তব্য বিভিন্ন অধ্যায়ে আমার বক্তব্যের সমর্থনে ব্যবহার করেছি। একইভাবে দ্বৈতয়িক উৎস বা প্রকাশিত পুস্তক, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, সংবাদপত্র ভিত্তিক তথ্য ও সম্পাদকীয় থেকে নেয়া তথ্য ও উপাত্তকে গবেষণার মৌলিক বক্তব্যের সমর্থনে বিভিন্নস্থানে সন্নিবেশ করেছি এবং এসব তথ্য ও উপাত্ত থেকে মাঝে মাঝে উদ্ধৃতি দান করেছি। আবার বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর বিভিন্ন সময়ে লিখিত যোগাযোগ পত্র বা Correspondence, স্মারকলিপি এবং প্রতিবেদনও এ গবেষণা কর্মে ব্যবহার করা হয়েছে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি সংগ্রহশালা থেকে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎস সংগ্রহ করেছি।

যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা

মিয়ানমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। যদিও দেশটি ৯০ দশক পর্যন্ত সামরিক শাসনের আড়ালে নিজেকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কিন্তু ৯০-এর পর দেশটি বিশ্বমুখী হওয়ার প্রয়াস চালায় এবং ২০০৯ সালের দিকে দেশটি প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের অবসান

ঘটিয়ে গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়। প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের অবসান এবং দেশটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকায় বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো এখানে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কাজেই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাছাড়া বাংলাদেশ মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট অধিকার লাভ করে চট্টগ্রাম-ম্যান্ডালয়-কুনমিং সড়ক প্রকল্পের মাধ্যমে চীন ও আসিয়ানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে আগ্রহী। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগের ধারণা একটি স্বাগত পদক্ষেপ যা এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক চিত্র পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক পদ্ধতির দৃষ্টান্ত থেকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, বিশ্বায়ন এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা স্থানান্তরের সঙ্গে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে হিসেবে ভূ-অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় উত্তর-পূর্ব অঞ্চল নিয়ে অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হয় যা ভারতের পূর্বনীতিতে প্রতিফলিত হয়। উভয় দেশের সরকার মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে সম্ভাব্য গ্যাস রপ্তানির পাশাপাশি রাখাইন রাজ্যে একটি যৌথ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনেও আগ্রহী।

তাছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে দেশটির রোহিঙ্গা ইস্যু, সমুদ্রসীমা বিরোধসহ বেশ কিছু বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা রয়েছে। রোহিঙ্গা সমস্যা শুধু বাংলাদেশ-মিয়ানমারের শরণার্থী সমস্যা নয়। এর গভীরতা ও ব্যাপকতা এখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ এশিয়ায়ও বিস্তৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিষয়টি ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছে।

কাজেই বর্তমান গবেষণাকর্মে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোর ওপর আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি লিখতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্তের ব্যবহার করা হয়েছে এবং এরফলে গবেষণা কর্মটি ১৯৯১-২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের একটি প্রামাণ্য দলিলে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা এটিকে একটি উৎস পুস্তক হিসেবে অধিক গবেষণার জন্য ব্যবহার করতে পারবে। দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস ও রাজনৈতিক কূটনীতির শিক্ষার্থীরা এ গবেষণার মধ্যে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দেখতে পাবেন যা উভয় দেশের কূটনৈতিক ইতিহাসের পুনর্গঠনে সহায়ক হবে। আবার বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারক কর্মকর্তাগণ এ গবেষণার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা লাভ করবেন। এভাবে উভয় দেশের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে এ গবেষণাকর্মের ন্যায্যতা, গুরুত্ব ও উপযোগিতা প্রতিপন্ন করা যায়।

তথ্যনির্দেশ-

১. Md. Shayeed Hossain, *Bangladesh-Myanmar Relations, 1972-2010,* Unpublished Ph.D thesis, Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi, August 2014, P.2; *দৈনিক ইত্তেফাক*- ১৮ জানুয়ারি, ১৯৯২।

২. এই অংশের বার্মা বলতে বর্তমান মিয়ানমারকে বোঝানো হলো। মিয়নমারের প্রাক্তন নাম বর্মা বা বার্মা, প্রাচীন নাম বক্ষদেশ। মিয়ানমারের আনুষ্ঠানিক নাম মিয়ানমার প্রজাতন্ত্র। (বর্মী- প্যিদাউঞ্জু থান্মাদা ম্যামা নাইঙ্গান্দাউ)। তৎকালীন বার্মার গণতান্ত্রিক সরকারের উৎখাতের পর সেখানকার সামরিক সরকার বার্মার নতুন নামকরণ করে 'মিয়ানমার'। bn.wikipedia.org/wiki/wgqvbgvi (মিয়ানমার - উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে)।

৩. এখানে 'বাংলাদেশ' বলতে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডকে বোঝাচ্ছে না। এখানে 'বাংলাদেশ' বলতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিকৃত 'বৃহৎ বঙ্গকে' বোঝানো হলো।

৪. S.M. Ali, Arakan rule in Chittagong (1550-1666 A.D), *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*. Vol. XII. No. 3, 1967, pp. 333-52.

৫. For detail see W.K.Firminger, *Historical Introduction of the Bengal Portion and the Fifth Report*, (Indian Series: Past and Present, 1962), pp. Cxiii-Cxv.

৬. 'মগ' শব্দটি সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। আরাকানের 'মগ' গণ পর্তুগীজ জলদস্যুদের সাথে একত্র হয়ে বেড়াত। মগেরা আরাকানের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও আরাকানের সমস্ত অধিবাসী জলদস্যু ছিল না এবং তারা 'মগ'ও নয়। রচনায় আক্রমণকারী আরাকানীদের মগ এবং পরে চট্টগ্রামে আগত আরাকানীদের আরাকানী হিসেবে উল্লেখ করা হলো।

৭. রতন লাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক (১৭৮৫-১৮২৪)*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৮৪, এশিয়াটিক প্রেস), পৃষ্ঠা-১।

৮. Ratan Lal Chakraborty, "Some Aspects of the Anglo-Arakanese Relations, 1760-1784", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XX, No. 3, (Dec.1975), pp. 41-50.

৯. Imtiaz Ahmed (Editor), *The Plight of the State Less Rohingyas,* (The university press limited, Dhaka- 2010), p. 3.

১০. রতন লাল চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা- ২।

১১. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ১৮২।

১২. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে - ডক্টর এনামুল হক এবং আবদুল করিম, *আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য*, [খিষ্টীয় ১৬০০-১৭০০অব্দ], (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৩৫), পৃ. ১১-৬৭।

১৩. ফারুক ওয়াসিফ, *মিয়ানমার : পূর্বযাত্রা শুভ হোক*, ১০ ডিসেম্বর, ২০১১, পৃষ্ঠা-১২, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2011-12-10/12.

১৪. Harun-ur-rashid, *Bangladesh Foreign Policy* (Dhaka: Academic Press and Publishers Library 2010), p.172

১৫. Kamal Uddin Ahmed, "Bangladesh-Burma Relations: The Political-Economic Dimensions" *BIISS Journal.* Vol. 7, No.4, (June, 1986), p.444; Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.*, P.33.

১৬. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.*, P.190; *Foreign relations of Myanmar*, https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Myanmar; *দৈনিক প্রথম আলো*- ২৫ নভেম্বর, ২০০৯.

১৭. Md. Shayeed Hossain, *Ibid.,* pp.221-222.

১৮. *Ibid.,* pp.222-224.

১৯. *Ibid.,* pp. 230-231.

২০. *Ibid.,* p. 253.

২১. Mohammad Masudur Rahman, Chanwahn Kim, Trade and investment potential among BCIM countries: Prospects for a dynamic growth quadrangle, *Jounal of International Trade Law and Policy*, vol.11, No.2, p.163.

২২. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.*, p. 247.

২৩. *BANGLADESH REFUGEES INTERNATIONAL*, https://www.refintl.org/where-wework/asia/bangladesh.

২৪. "*Myanmar and the US-What is really behind this relationship?*", Geopolitical Relations International, December 26, 2011, available at. http://www.english.rfi.fr/sites/images.rfi.fr/files/aef.

২৫. ফারুক ওয়াসিফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১২।

২৬. Nasim Mahmmud, *BANGLADESH-MYANMAR 40 YEARS OF DIPLOMATIC RELATIONS*. https://mygoldenbengal.wordpress.com/2014/05/18/bangladesh-myanmar-40-years-of-diplomatic-relations/.

২৭. ফারুক ওয়াসিফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১২।

২৮. Sonu Trivedi, "India-China make a Myanmar tryst", *The Online Asia Times*, August 5, 2013.

২৯. আলী রিয়াজ, *মিয়ানমার-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ও বাংলাদেশের ভাবনা*, ১৬ জানুয়ারী, ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৩, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2012-01-16/13।

৩০. Jurgen Haacke, "Myanmar: Now a site for Sino-US Geopolitical Competition?" Nicholas Kitchen (ed.), *The Institute for Development, Evaluation, Assistance and Solutions (IDEAS) Report,* 2012, pp. 53-60.

৩১. মোখলেসুর রহমান, *পরিবর্তনের পথে মিয়ানমার*, ২৫ নভেম্বর, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৩১, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2011-11-25/31.

৩২. *"Myanmar and the US-What is really behind this relationship?",* Geopolitical Relations International, December 26, 2011, available at. http://www.english.rfi.fr/sites/images.rfi.fr/files/aef.

৩৩. Sonia Farhana Rahman, *Bangladesh-Myanmar Bilateral Relations and Regional Implications*, M. Phil. thesis in International Relations, University of Dhaka, (Dhaka University Institutional Repository, July 2014), p. 80.

৩৪. *"Myanmar and the US-What is really behind this relationship?",* Geopolitical Relations International, December 26, 2011, available at. http://www.english.rfi.fr/sites/images.rfi.fr/files/aef.

৩৫. মোখলেসুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩১।

৩৬. Sonia Farhana Rahman, *op.cit.* p.82.

৩৭. Md. Kamal Uddin and Akkas Ahmed, "Bangladesh-myanmar relations: Continuity and Change," *Chittagong University Journal of Social Sciences*, Vol. 26, June 2008, p.92; Sonu Trivedi, "India-China make a Myanmar tryst", *The Online Asia Times*, August 5, 2013.

৩৮. Sonia Farhana Rahman, *Op.cit*, pp.82-83.

৩৯. Sonu Trivedi, "India-China make a Myanmar tryst", *The Online Asia Times*, August 5, 2013.

৪০. Sonia Farhana Rahman, *op.cit*, p. 83.

৪১. Sonu Trivedi, "India-China make a Myanmar tryst", *The Online Asia Times*, August 5, 2013.

৪২. Jurgen Haacke, *op.cit*, pp. 53-60.

৪৩. Md. Kamal Uddin and Akkas Ahmed, "Bangladesh-myanmar relations: Continuity and Change," *Chittagong University Journal of Social Sciences*, Vol. 26, June 2008, p.92; *দৈনিক প্রথম আলো*- ২৯ মে, ২০১২, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2012-05-29/8.

৪৪. মোখলেসুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩১।

৪৫. Udai Bhanu Singh, Myanmar's Relations with Bangladesh since 1988, *Institute for Defence Studies and Analyses*, New Delhi, May 15, 2009.

৪৬. Sonu Trivedi, "India-China make a Myanmar tryst", *The Online Asia Times*, August 5, 2013.

৪৭. Udai Bhanu Singh, Myanmar's Relations with Bangladesh since 1988, *Institute for Defence Studies and Analyses*, New Delhi, May 15, 2009.

৪৮. Sonu Trivedi, "India-China make a Myanmar tryst", *The Online Asia Times*, August 5, 2013.

৪৯. Subash Kapila, *"India-Myanmar Strategic Partnership: Indian Imperatives"*, Paper no.197, South Asia Analysis Group.

৫০. Sonia Farhana Rahman, *op.cit*, p. 84.

৫১. Sonu Trivedi, "India-China make a Myanmar tryst", *The Online Asia Times*, August 5, 2013.

৫২. আলী রিয়াজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৩।

৫৩. *"Myanmar and the US-What is really behind this relationship?",* Geopolitical Relations International, December 26, 2011, available at. http://www.english.rfi.fr/sites/images.rfi.fr/files/aef.

৫৪. *দৈনিক প্রথম আলো*- ৯ ডিসেম্বর, ২০১১।

৫৫. আলী রিয়াজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৩।

৫৬. ফারুক ওয়াসিফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১২।

৫৭. আলী রিয়াজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৩।

৫৮. ফারুক ওয়াসিফ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১২।

৫৯. আলী রিয়াজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৩।

প্রথম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে প্রথমত, ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য; দ্বিতীয়ত, এর আলোকে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি এবং তৃতীয়ত, সম্পর্কের নির্ধারকসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রুত উপনিবেশ সমূহের অবলুপ্তি এবং নতুন নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটতে থাকে। ভৌগোলিক সীমা, উৎপাদন ক্ষমতা, জনসংখ্যা, বার্ষিক আয় এবং সামরিক সামর্থের কারণে এসব রাষ্ট্রের অধিকাংশই ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে এ ধরনের রাষ্ট্রের সংখ্যাধিক্যের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্ব-পরিমন্ডলে এদের প্রভাব ও ভূমিকা বৃহৎ বা পরাশক্তির কাছে বিশেষভাবে বিবেচিত হতে থাকে। জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের বাইরে এসব দেশের ভূমিকা ও তৎপরতার দিকে লক্ষ্য রেখে বৃহৎ শক্তিবর্গ এসব দেশকে উত্তপ্ত অঞ্চল (Hot Spots) হিসেবে চিহ্নিত করে প্রভাব বলয় সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। যদিও কম দেশই বস্তুত তৎকালীন পরাশক্তির এই প্রভাব বলয় থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পেরেছে। এতদসত্ত্বেও ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলো দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিকভাবে নিজেদের মধ্যে কতকক্ষেত্রে সমঝোতা, সহযোগিতা এবং তাদের কতগুলো অভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসরণের মাধ্যমে বৃহৎ শক্তিগুলোর ওপরও তাদের চাপ ও প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। আর এই সূত্র ধরেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দুটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্র বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ভিত্তিতে আশা করা হয় ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে দুটি দেশের মধ্যে উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি হবে।

ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণে বিশ্লেষকরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এ জাতীয় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণে দুটি প্রচলিত ধারা রয়েছে।

প্রথমত, একটি রাষ্ট্রের আয়তন, জনসংখ্যা, জিএনপি (গড় জাতীয় উৎপাদন) এবং সামরিক শক্তির বিচারে দুর্বল দেশকেই ক্ষুদ্ররাষ্ট্র বলা হয়।
দ্বিতীয়ত, বিশ্ব রাজনীতিতে কম প্রভাব বিস্তারকারী বা প্রভাবহীন দেশ ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অথবা উভয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দেশও ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।[১]

সাধারণত তাত্ত্বিক বিশ্লেষকদের মতে, "ক্ষুদ্ররাষ্ট্র বলতে বোঝায় তাদের যে সমস্ত দেশ যেগুলো আয়তনে, জনসংখ্যায়, অর্থনীতির দিক দিয়ে বেশ অনুন্নত, অপর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী, সামরিক ক্ষেত্রে দুর্বল, কারিগরী দক্ষতাহীন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যারা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে না।"[২]

ডেভিড ভিটাল (David Vital) ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের চরিত্র বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে জনসংখ্যার ভিত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন, "A Small state is defined as having a populations with an upper limit of between 10-15 million."[৩]

যদিও ডিয়েটার এরহাউথ (Direter Eharhardt) মনে করেন, "তিন লাখের নিচে জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ ক্ষুদ্ররাষ্ট্র।" প্যাট্রিসিয়া ব্লেয়ার (Patricia Blair) এই তত্ত্বকে সমর্থন করে থাকেন।[৪]

তবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ. আর. কামালের (A.R. Kamal) মত অনেকটা ভিটালের কাছাকাছি। কামাল মনে করেন, "ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের জনসংখ্যা হবে ২০ মিলিয়নের নিচে আর বড় রাষ্ট্রের জনসংখ্যা হবে ১০০ মিলিয়নের উপর। অবশ্য তিনি ২০ থেকে ১০০ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাষ্ট্রকে মধ্যম প্রকৃতির রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করেন।"[৫]

অন্য একজন বিশ্লেষক রবার্ট রথস্টাইন (Robert Rothstein) সামরিক বাজেট ও সামরিক শক্তির ভিত্তিতে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে থাকেন। তাঁর মতে, "A Small state which recognizes that it cannot obtain security primarily by use of its capability and must rely fundamentally on the aid of other states, institutions and processes or developments to do so."[৬]

এ মতের বিপক্ষে বলা যায় অনেক দেশ সামরিকভাবে শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমন- মিয়ানমার।

কেউ কেউ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামর্থের ভিত্তিতে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে থাকেন। কার্ল ডব্লিউ ডয়েচ (Karl W. Deutsch) এ মতের সমর্থক।[৭] তার মতের সমর্থকদের মতে, "ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ও গড় জাতীয় উৎপাদনের ব্যাখ্যা কম এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারও নিম্ন পর্যায়ের।"

শাহিন আখতার এ বিষয়টির আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, "ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের বেশিরভাগ উন্নয়নশীল, দারিদ্র, সম্পদের অভাব, অভ্যন্তরীণ বাজারের সীমাবদ্ধতা, রপ্তানি বাণিজ্যে হাতে গোনা পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা এবং ঋণের ভারে ভারাক্রান্ত থাকে।"[৮]

হ্যানস মরগেনথো (Hans Morgenthau) - এর মতে, "ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যসমূহকে অবশ্যই তাদের জাতীয় স্বার্থের আলোকে বিচার করতে হবে। তাঁর মতে, ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে জাতির ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা।"[৯]

প্রতিটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে জাতীয় স্বার্থের বাস্তবায়ন। জাতীয় নিরাপত্তা তাদের জাতীয় স্বার্থের ভিত প্রস্তুত করে। পররাষ্ট্রনীতি গঠনে দেশগুলো তাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সত্তা অক্ষুন্ন রাখাকে গুরুত্ব দেয়। বৃহৎ শক্তির চাপ মোকাবিলায় এই সত্তা সমুন্নত রাখাকেই ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলো প্রয়োজনীয় মনে করে। এভাবে বিভিন্ন জন কেউ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গড় জাতীয় উৎপাদন ইত্যাদির ভিত্তিতে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সিঙ্গার (Singer) এবং স্মল (Small) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এর মাঝে পার্থক্য বোঝাতে বলেছেন, "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে দেশের কূটনৈতিক আদান প্রদান

কম, আন্তর্জাতিক ঘটনায় অংশগ্রহণ সীমিত ও যে দেশটিতে বিদেশী কূটনৈতিকদের আশা যাওয়া স্বল্প সেই দেশটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের অন্তর্গত"।[১০] যেমন- মিয়ানমার।

তাত্ত্বিকদের সংজ্ঞা অনুযায়ী, "Small power is different in kind and not nearly in degree."[১১]

হ্যারোল্ড নিকলসন (Harold Nicolson) তাঁর *The Evolution of Diplomatic Method* গ্রন্থে বলেছেন, "It was assumed that the great power were greater than the small power, Since they possessed a more extended range of interest wider responsibility and above all more money and more guns." এই সংজ্ঞা দিয়েই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারিত হয়ে যায়।[১২]

উপর্যুক্ত সকল সংজ্ঞায় ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের কিছু সাধারণ মাপকাঠি তুলে ধরা হয়েছে, যার ভিত্তিতে প্রকৃতপক্ষে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। সকল ক্ষুদ্ররাষ্ট্র যেমন কম জনসংখ্যা বা ক্ষুদ্র আয়তনের নয়। এর সবগুলোই দুর্বল, দরিদ্র বা অনুন্নত নয়। প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের অবস্থান ও সম্পর্কের ভিত্তিতেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করেই ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের অবস্থান নির্ধারিত হয়। ফ্রান্স একটি বৃহৎ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করলে ফ্রান্স ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত একটি রাষ্ট্র অথচ বেলজিয়ামের সাথে তুলনা করলে ফ্রান্স একটি বড় রাষ্ট্র এবং বেলজিয়াম ক্ষুদ্ররাষ্ট্র। অথচ লুক্সেমবার্গের তুলনায় বেলজিয়াম বড় রাষ্ট্র।[১৩]

এরকম দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় সম্পদ, আয়তন, জনসংখ্যা, সামরিক শক্তি সব মিলিয়ে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ শক্তি। এজন্যে ভারতকে বৃহৎ শক্তি, আঞ্চলিক শক্তি, এশীয় শক্তি অথচ প্রতিবেশী ভুটান ও নেপালের তুলনায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমার বৃহৎ শক্তি হলেও ভারতের তুলনায় এরা ক্ষুদ্র শক্তি।[১৪]

পূর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ অনেক দেশই ক্ষুদ্ররাষ্ট্রভুক্ত হতে পারে। সৌদিআরব ও কুয়েতসহ আরব বিশ্বের অনেক দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো ক্ষুদ্ররাষ্ট্রভুক্ত। তাই সংজ্ঞার ক্ষেত্রে যে মাপকাঠি ধরা হয়েছে তার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেয়া যায় না। কিন্তু সীমাবদ্ধতা রয়ে যায়। অতএব ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণে এলাকা ভিত্তিক তুলনা না করে সামগ্রিক বিষয় বিচার বিবেচনায় আনা জরুরী। এক্ষেত্রে মাইকেল হ্যান্ডেল (Micheal Handel) এর সংজ্ঞা অনেকখানি স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, ক্ষুদ্ররাষ্ট্র হচ্ছে - "Which are Smaller in area and population and have a low ranking in the international power hierarchy (Lower level of economic development, limited resources, weak military capability and inadequate technological known-hous) resulting in little or no influence on the balance of power in international system."[১৫]

ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোকে আবার তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অনুপনিবেশীকরণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্ব কথাটি পরিচিতি লাভ করেছে। প্রথম বিশ্বের অন্তর্গত উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহ, দ্বিতীয় বিশ্বের অন্তর্গত উন্নয়নশীল অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া, দূর প্রাচ্যের

ক্ষুদ্র, অনুন্নত দেশসমূহ যেগুলো আকার, আয়তন, সম্পদ, জনবল, অর্থনীতি, সামরিক দিক দিয়ে উপরোক্ত দুটো বিভাগের দেশসমূহ থেকে বহু নীচে অবস্থান করছে।

এই ক্ষুদ্ররাষ্ট্রসমূহের বৈশিষ্ট্য প্রায় এক তা হলো প্রায় সকল দেশই কমবেশী ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দীর্ঘদিনের শাসনে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়। ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে এরা দুর্বল হয়ে পড়ে। সম্পদের অভাব, নেতৃত্বের অভাব, কারিগরী ও শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, সীমিত সামরিক শক্তি এই দেশসমূহকে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেছনে ঠেলে দেয়। ফলে না চাইলেও বা অনিচ্ছাকৃত হলেও দেশগুলো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। এ থেকে মুক্তি পেতেই নিজেদের মধ্যে কার্যকরী সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রসমূহ ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। এমনি দুটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আসিয়ান ও দক্ষিণ এশিয়ার সার্ক।[১৬]

ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোর আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় আনা। অভ্যন্তরীণ অনেক বিষয় একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতি প্রণয়নে জড়িত থাকে। অটোভন বিসমার্ক (Otto Von Bismark) বলেছেন যে, "পররাষ্ট্রনীতি একটি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির প্রতিফলন।"[১৭] একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ নির্ধারকে কতগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন-

প্রথমত, ভৌগোলিক অবস্থান। এই অবস্থান হতে পারে স্থলবেষ্ঠিত, হতে পারে শক্তিশালী প্রতিবেশী পরিবেষ্ঠিত যা দেশটির পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে।
দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক সম্পদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি।
তৃতীয়ত, জনবল বা জনসম্পদ, জনগণের নৈতিক চরিত্র একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নির্ধারক হতে পারে।
চতুর্থত, রাজনৈতিক সংগঠন, প্রশাসনিক দক্ষতার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি।[১৮]

ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার এসবের বেশিরভাগই পুরনো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। অধিকাংশ অনুন্নত, অস্থিতিশীল, জাতীয় ঐক্য দোদুল্যমান, সীমিত সম্পদের অধিকারী এবং সাহায্য নির্ভর। এ জাতীয় রাষ্ট্র অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা মরিশ ইস্ট (Moorish Iest) উল্লেখ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁর মতে একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্র-

প্রথমত, বৈশ্বিক ঘটনাবলীতে কম অংশ গ্রহণ করে।
দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সংগঠনের কার্যাবলীতে বেশি অংশ নেয়।
তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইনের বিধিগুলোর প্রতি সমর্থন জানায়।
চতুর্থত, বৈদেশিক আচরণের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকে।

পঞ্চমত, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রকে তার বিরোধীতায় ঠেলে দেবে এমন আচরণ বা নীতি এড়িয়ে যায়।

ষষ্ঠত, বৈদেশিক সম্পর্কের বেলায় একটি সংকীর্ণ ব্যবহারিক ও ভৌগোলিক বিবেচনায় শ্রেণী বিন্যাস করে।

সপ্তমত, আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ঘন ঘন নৈতিক ও বিধিগত অবস্থান গ্রহণ করে।[১৯]

ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোর আরো বৈশিষ্ট্য হলো যে, তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার হাতিয়ার সরূপ জোট নিরপেক্ষ নীতি ও কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে থাকে।[২০] যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকেই ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলো দুটি পরাশক্তির প্রভাব বলয় থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিল। নিজেদের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীন সত্ত্বা রক্ষার অবিরত সংগ্রামে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকতেই ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলো জোটবদ্ধ হতে চায়নি। এক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে শরীক হয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্ররাষ্ট্র এই নীতি গ্রহণ করে কার্যকরী ফল পায়। এছাড়া উপযোগী কূটনীতি অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোকে বৃহৎ শক্তির দ্বন্দ্বের কবল থেকে রক্ষা করত।[২১]

ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা। নিজেদের নিরাপত্তা সংহত করতে দেশগুলো সদা তৎপর। এদের ওপর বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রভাব বিস্তারের অন্যতম কারণ দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেও এটি হতে পারে। যেমন- বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারতের আশা ছিল যে নিজ প্রভাব বলয়ে বাংলাদেশকে রাখতে পারলে দক্ষিণ এশিয়ায় নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখা যাবে এবং চিরশত্রু পাকিস্তানকে মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু স্বাধীনতার পর ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শ অনুযায়ী পরবর্তীকালে অভিভাবক সুলভ মনোভাবে পরিবর্তিত হলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক শীতল হয়।[২২]

সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে তা হলো বৃহৎ শক্তিসমূহ ও ক্ষুদ্ররাষ্ট্রসমূহ। বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইতালী। আর আফ্রো-এশীয় দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হতে থাকলে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপরোক্ত বৃহৎ শক্তিগুলো এসব ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের ওপর প্রভুত্ব করে নিজেদের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করেছিল। ফলে তারা বিশ্বে হয়েছে পরাশক্তি আর ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলো সকল দিক দিয়ে ক্ষুদ্র রয়ে যায়। মানসিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক সকল ক্ষেত্রেই তারা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে।[২৩]

দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশগুলোর কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো-

১. দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো কমবেশি ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২. ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশগুলোর ওপর অপেক্ষাকৃত শক্তিধর ভারতেরই কর্তৃত্ব ছিল।

৩. দক্ষিণ এশিয়ার চিরাচরিত ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব এ অঞ্চলের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪. প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল অনগ্রসরতা।[২৪]

ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলো সাধারণত পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলিকে মেনে চলতে চায় তা হলো-

১. বহির্বিশ্ব থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখা ও বিচ্ছিন্ন থাকা।
২. বৃহৎ প্রতিবেশীদের মধ্যে অবস্থিত হলে অধীনস্থ অবস্থান মেনে নেয়া।
৩. বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রেখে চলা।[২৫]

মাইকেল হ্যান্ডেল (Micheal Handel) এর সংজ্ঞার আলোকে এবং উপরোক্ত আলোচনা, বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠিতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। এই দুটি রাষ্ট্রের চরিত্রে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সব মাপকাঠি বিদ্যমান। দেশ দুটি সীমিত সম্পদ, দুর্বল সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অধিকারী। দেশ দুটিতে আরো রয়েছে দক্ষ নেতৃত্বের অভাব, দুর্বল আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামো। তাই ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সব বৈশিষ্ট্য নিয়েই বাংলাদেশ ও মিয়ানমার তাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেছিল, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল নিজেদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক।

পররাষ্ট্রনীতি

দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও উন্নতি সাধনের প্রয়োজনে বিভিন্ন উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি সরকার অনুসরণ করে চলে তাকেই 'জাতীয় নীতি বা National Policy' বলা হয়। এই জাতীয় নীতিকে মোটামুটিভাবে দুই অংশে ভাগ করা চলে অভ্যন্তরীণ নীতি ও বৈদেশিক নীতি। যে নীতি রাষ্ট্র নিজের ভূ-খন্ডে নিজের শক্তি ও সম্পদ দ্বারা অনুসরণ করতে পারে তাকে অভ্যন্তরীণ নীতি বলা হয়। কিন্তু যে নীতি অনুসরণ করতে হলে অন্য রাষ্ট্রের সাহায্য সহায়তার প্রয়োজন হয় তাকে পররাষ্ট্রনীতি বলা হয়।[২৬]

একটি রাষ্ট্র তার নিজ প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা, জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করে থাকে। পররাষ্ট্রনীতি দুটি পৃথক শব্দের যোগফল প্রথমটি পররাষ্ট্র অপরটি নীতি। পররাষ্ট্র অর্থ্যাৎ বিদেশ সংক্রান্ত নীতি হলো একটি দেশের কোনো একটি বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু কার্যাবলী যার সাহায্যে লক্ষ্য অর্জন ও স্বার্থ সংরক্ষণ হয়। প্যাডেলফোর্ড, লিংকন ও অলভে (Padelford, Lincoln, Olvey) এর মতে- "Policy is the over all result of the processes by which a state translates its broadly conceived goals and interest into spesitic courses of action in order to achieve its objectives and preserve its interest."[২৭]

প্রচলিত কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য একটি ধারণা হলো একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি সে দেশটির অভ্যন্তরীণ নীতির প্রতিফলন বা সম্প্রসারণ। কোনো রাষ্ট্রই বিচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকতে পারে না এবং এ কারণে তাদের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তারা একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও সম্পর্ক রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়। আর এই কাজটি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকেই দেশটির পররাষ্ট্রনীতি বা বৈদেশিক নীতি আখ্যা দেয়া হয়।[২৮] বৈদেশিক বা দেশের বাইরের সঙ্গে যা কিছু সম্পৃক্ত তা পররাষ্ট্রনীতির আওতায় আসে। প্রুশীয় কূটনীতিবিদ, রাজনীতিক, জার্মান একত্রীকরণের নায়ক বিসমার্ক এক কথায় ব্যাখ্যা করেছিলেন যে "পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারিত রূপ।"[২৯]

পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র অপর একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ কারণে দেখা যায় মার্কসবাদ-লেলিনবাদ আদর্শের ধারক দুটি কম্যুনিস্ট দেশে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বজায় থাকার কথা থাকলেও কেবল জাতীয় স্বার্থগত দ্বন্দ্বের কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মতবাদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে না। বরং প্রত্যেক দেশই তার জাতীয় স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দেয়।[৩০]

একটি রাষ্ট্র জাতীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তার অভ্যন্তরীণ নীতি গ্রহণ এবং প্রয়োগ করে। এটি অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে এটি অন্য রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া অনুসারে যে নীতিমালা প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় সুবিধাজনকভাবে তা করে। যেমন- উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং পারস্পরিক কাজ নথিভুক্ত এবং সাধারণ বিষয় বাস্তবায়নের জন্য যৌথভাবে কাজ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একটি নিয়মানুগ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ম অনুযায়ী উক্ত আচরণের সম্পর্ককে একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বলা হয়। দেশীয় এবং বৈদেশিক উভয় নীতিই জাতীয় স্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং পারস্পরিক পুনর্বহাল করা হয়।[৩১]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিল, তার লক্ষ্য ও মূলনীতিগুলো এখনও তাই রয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, তত্ত্বগতভাবে বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও মূলনীতির মধ্যে যে সাদৃশ্য থাকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার কোনো ব্যতিক্রম নেই। আয়তন, লোকসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামরিক শক্তির চলকের নিরিখে বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্র। তাই পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য অন্বেষণ ও মূলনীতি অনুসরণের বেলায় একটি বহৎ শক্তি বা অর্থনীতির মানদন্ডে উন্নত রাষ্ট্রের তুলনায় তার আচরণ ভিন্ন হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্টগুলি স্থান পায়।[৩২]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অন্য রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য অর্জনে কতকগুলো নীতির দ্বারা পরিচালিত, যাদের মূলনীতি বলা যায়। সংবিধানের ২৫(১), ২৫(২) এবং ৬৩ ধারায় এসব মূলনীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৩] পররাষ্ট্র সমূহের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বেশকিছু সাদৃশ্য থাকে। বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগের ২৫ অনুচ্ছেদে পররাষ্ট্রনীতি, তার মূলনীতি ও ভিত্তি বর্ণিত আছে।[৩৪] বাংলাদেশের জন্মলগ্নে ১৯৭১ সালের ২০শে এপ্রিল প্রণীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সুস্পষ্টভাবে জাতিসংঘ সনদের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং বিশ্বসম্প্রদায়ভুক্ত একটি জাতি হিসেবে সকল দায়-দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।[৩৫]

পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ সন্নিবেশিত হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন' করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অভিমুখ নির্ধারণ করে ৪টি মূলনীতি বা মূলস্তম্ভ উল্লেখ করা হয়েছে-

ক. জাতীয় সমতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা;
খ. শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াস;
গ. নিজস্ব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনে প্রত্যেক জাতির অধিকারের স্বীকৃতি এবং
ঘ. সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের সমর্থন।[৩৬]

কার্যকরী, বাস্তবসম্মত পররাষ্ট্রনীতি একটি দেশকে তার লক্ষ্য হাসিলের সুযোগ দেয়। বাংলাদেশও তার পররাষ্ট্রনীতির সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিল, হাসিল করতে চেয়েছিল বিবিধ উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সাল সহ বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হলেও পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তির কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মূলনীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ৫টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায়। যেমন-

১. আত্মরক্ষা বা জাতীয় সত্তার উন্নয়ন;
২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন;
৩. বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ ও প্রয়োজনবোধে সম্প্রসারণ অথবা জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা;
৪. ভাবাদর্শ এবং
৫. জাতীয় সম্মান বজায় রাখা।[৩৭]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান দশটি দিক-

১. প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ বিদেশের সাথে ভারসাম্যমূলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক;
২. বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ;
৩. বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী পণ্য ও কৃত্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ ও সংরক্ষণ;
৪. বিদেশে বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং নতুন শ্রমবাজার সন্ধান;
৫. প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;

৬. জাতিসংঘ ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণ, আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রসার এবং ক্রমবিকাশমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ;
৭. বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারকরণ;
৮. বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
৯. বিদেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতির যথাযথ প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়ন;
১০. পর্যটন শিল্পের বিকাশে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।[৩৮]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ

একটি দেশের বৈদেশিক নীতি সে দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, ঐতিহাসিক পটভূমি ও ঐতিহ্য, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক মতবাদ ও মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দ্বারাও একটি দেশের বৈদেশিক নীতি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এসব অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রভাবকে বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি বা মূল নির্ণায়ক (Basic determinants) বলা হয়।[৩৯]

১। ভূ-কৌশলগত অবস্থান

বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত অবস্থান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ভারত এবং মিয়ানমারের মতো প্রতিবেশী দ্বারা তিন দিকে বেষ্টিত এবং দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত যেখানে বলা যায় মূলত ভারত বাংলাদেশকে তিনদিক থেকে বেষ্টন করে রয়েছে।[৪০] বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল যেমন বাংলাদেশকে মিয়ানমার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে তেমনি ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও বিচ্ছিন্ন করেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উত্তর-পূর্ব অংশে অভিন্ন সীমানা রয়েছে। তাই উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে যে কাঠামোগত মিল পেয়েছে তাই দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে বড় নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে।[৪১] অন্যদিকে, বাংলাদেশ চীন ও ভারতের মতো এশিয়ার দুই শক্তিমান দেশের বলয়ে অবস্থিত হওয়ার কারণে দুই দেশের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষায় বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখিন হতে হয়।[৪২] কাজেই দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সদা ব্যস্ত বৃহৎ শক্তিসমূহের কাছে বঙ্গোপসাগরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাও জরুরী ছিল আর বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত হওয়ায় তার গুরুত্বও অবহেলার নয়। তাই ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।[৪৩]

২। ইতিহাস

একটি দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সে দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশ প্রথমে ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ ছিল। বাংলাদেশ বর্তমানে যে অংশে রয়েছে তা পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত যা সমগ্র বঙ্গ বা বাংলার একটি অংশ। এই বঙ্গ বা বাংলার রয়েছে বিশাল ঐতিহ্য।[৪৪] ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা এ উপমহাদেশে স্বাধীনতা প্রদান করে। ব্রিটিশ ভারত বিভাগে দুটি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়; 'ভারত' নামে

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং 'পাকিস্তান' নামক একটি ইসলামী রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল দুটি ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পৃথক হওয়ায় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৪৫] ফলে বাংলা পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পুনঃনামকরণ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ হিসেবে দ্বিধাবিভক্ত হয়। পর্যাপ্ত সম্পদ ও পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যাগত গুরুত্ব সত্ত্বেও, সমগ্র পাকিস্তানের সরকার ও সেনাবাহিনী পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে।[৪৬] তখন চিরাচরিত ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই বাঙালিরা নিপীড়ন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরই সূত্র ধরে ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থ্যান, ৭১-এর নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়, বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয় স্বাধীন একটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ, এরপর দেখা যায় ৯০-এ গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ বরাবর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের পক্ষে মত দিয়ে এসেছে। তাই এসব ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রতিফলিত হবে এটিই স্বাভাবিক।

৩। নেতৃত্বের ধরন

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নেতৃত্ব একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নীতি নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ নির্ভর করে রাজনৈতিক ক্ষমতায় থাকা নেতৃবৃন্দের ওপর। নেতৃত্বদানকারী প্রধান নেতার আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ওপর রাষ্ট্রনীতির অনেক কিছু নির্ভর করে। যদিও মৌলিক কিছু নীতি কখনও পরিবর্তিত হয়নি তথাপি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধরনের ওপর নির্ভর করে। তবে বাংলাদেশের নেতৃত্বের ধরন সর্বদা একই ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে নয় মাসের মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব ছিল ৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে। পরবর্তী সময়ে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জোট নিরপেক্ষ আদর্শ প্রতিফলিত হয়। আবার ১৯৭৫ সালে তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়। জিয়া সরকারের সময় বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের শিবিরে চলে আসে।[৪৭] এইচ এম এরশাদের সময়ে পররাষ্ট্রনীতির দিক বিশেষকরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান এবং ইসলামী দেশগুলোর সঙ্গে জোরদার ছিল। ১৯৯১ সালে বিএনপি (বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি) সরকার গঠন করে চীন, জাপান, এবং ইসলামী দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক শক্তিশালী করার নীতি অনুসরণ করে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।[৪৮] তাই নেতৃত্বের ধরনের ওপর একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি অনেকাংশে নির্ভর করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য যে অন্যতম তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

৪। জনগণ

একটি জাতির যে কোনো নীতি (পররাষ্ট্রনীতি) নির্ধারণে সে দেশের জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা নীতি নির্ধারণে বেশি গুরুত্ববহ, কারণ বাংলার সাধারণ

জনগণের সংগ্রামী ঐতিহ্য ছিল। বাংলাদেশ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এছাড়া ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও ৯০-এর গণ-আন্দোলনে এর প্রমাণ পাই। তাই পররাষ্ট্রনীতি প্রনয়ণে জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন আর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে দেশের সাধারণ জনগণ অবশ্যই বড় নির্ধারক হতে পারে।[৪৯]

৫। নিরাপত্তা কাঠামো

সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখন্ডতার সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি ও ঐক্য জাতীয় স্বার্থের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিকট শান্তিপূর্ণ, নিশ্চিত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ প্রত্যাশা করে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে এই সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকলেও নিদেন পক্ষে শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায় না। বাংলাদেশের নিরাপত্তা কাঠামো মূলত দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়। ফলে নিরাপত্তা কাঠামো পররাষ্ট্রনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

৬। অর্থনীতি

অর্থনীতি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বাংলাদেশের অন্যতম বিবেচনার ক্ষেত্র, যাতে দেশের জনগোষ্ঠীর কাঙ্খিত নূন্যতম অর্থনৈতিক কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিবেচনার ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, রপ্তানি বৃদ্ধি, বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ বৃদ্ধি, বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধি, বাংলাদেশি পণ্যের জন্য বাইরের বাজার সুবিধা বৃদ্ধি, শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে প্রযুক্তিগত সুবিধা বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং আরো কিছু ক্ষেত্র। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এই ক্ষেত্রগুলি সফল করার লক্ষ্যে বাইরের রাষ্ট্রের সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রয়োজন এবং এ কারণে বাংলাদেশকে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক বজায় রাখার চেষ্টা করতে হয়। ফলে অর্থনীতিও পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম নির্ধারক।

৭। বৃহৎ শক্তিসমূহের ভূমিকা

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তির অক্ষমতার কারণে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মতো শক্তিশালী প্রতিবেশী দ্বারা বেষ্টিত হবার ফলে পররাষ্ট্রনীতিতে সব সময় প্রতিরোধমূলক নীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব থেকেই বাংলাদেশ, ভারত এবং তার মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে জোটবদ্ধ। এ কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অনেক ক্ষেত্রে ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতিশীল নীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। যদিও সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় স্বার্থের কারণে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখনও দেখা যায় যে, অতীত সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রেই ভারতমুখী নীতি গ্রহণ করে থাকে।[৫০] এভাবে বৃহৎ শক্তিসমূহের ভূমিকা যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

৮। ইসলামী ইস্যু

যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশ পুনর্নির্মাণে অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে বৃহৎ শক্তির পাশাপাশি তেল সমৃদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া দেশের সিংহভাগ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মানসিকতা অনুধাবন করেও শেখ মুজিবুর রহমান আরব বিশ্বের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনই ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্যান ধারণাকে উপেক্ষা করেননি। আবার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্বের ভূমিকাও উপেক্ষা করা যায়নি।[৫১] কাজেই শুরুতে বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং এখনও তাই। কিন্তু ৮০'র দশকে মুসলিম বিশ্বের নিকট বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি পরিবর্তন করা হয় এবং শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্বের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সংবিধানে সংশোধনী আনা হয়। অবশ্য অপর একটি সংশোধনী দ্বারা তা রদ করা হয়েছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম। এই জনগোষ্ঠী অনুভূতিগত দিক দিয়ে মুসলিম উম্মাহ্ বা ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ এবং এরা চায় মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশেষ সম্পর্ক অব্যাহত থাকুক। সংস্কৃতিগত দিক থেকে বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বরাবরই শান্তিকামী। তাই ধর্মীয় বিশ্বাস বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।[৫২]

৯। আঞ্চলিক পরিবেশ

বাংলাদেশ ভৌগোলিক দিক দিয়ে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন সরূপ। তাই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক পররাষ্ট্রনীতি প্রনয়ণে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গুরুত্ব অত্যধিক এবং এ গুরুত্ব একাধিক কারণে। এ অঞ্চল বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা এবং সার্বিক নিরাপত্তার জন্য অধিক গুরুত্ব বহন করে। তাছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ উত্তরে চীনের সঙ্গে সম্ভাব্য সংযোগের একমাত্র পথ বলে বিবেচ্য সে কারণে এ অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক এবং ভূ-কৌশলগত গুরুত্বের বিষয়টি বাইরের দুনিয়ার সবারই জানা।[৫৩] কাজেই আঞ্চলিক পরিবেশ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সূচনা। প্রকৃতপক্ষে মুজিবনগর সরকারই প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে বাইরের রাষ্ট্রগুলোর সাথে যোগাযোগ শুরু করে। এই পর্যায়ের পররাষ্ট্রনীতির যে কার্যক্রম তা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে শুরু হয়ে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এই পর্যায়ে গৃহীত পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব স্বাধীনতার পরও পরিলক্ষিত হয়।[৫৪]

পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি পররাষ্ট্রনীতির নতুন দিক নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, 'বাংলাদেশ হবে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড'। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি ঘোষণা করে বলেন, 'আমরা একটি ছোট রাষ্ট্র, আমাদের সকলের সাথে বন্ধুত্ব হবে এবং কারো সাথে শত্রুতা নয়'।[৫৫]

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার কর্তৃক গৃহীত পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশের ভাবমূর্তির জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দশকেই বাংলাদেশ মূলত বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন কমনওয়েলথ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) এবং জোটনিরপেক্ষ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। এছাড়া বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বও দান করে।[৫৬]

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন এবং পররাষ্ট্রনীতির দিক পরিবর্তন হয়। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সৌদি আরব ও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এ পর্যায়ে পররাষ্ট্রনীতি ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী থেকে যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের দিকে স্থানান্তরিত হয়।[৫৭] এই সরকার চীনকে গুরুত্ব দিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্র বলয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্যোগী হয়। কৌশলগত সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এবং চীন ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলে।

মুজিব এবং জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতির তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এক থাকলেও তাদের মতাদর্শিক প্রবণতা এবং অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ভিন্নতা ছিল। মুজিব সরকার পররাষ্ট্রনীতিতে যে 'সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ বিরোধীতার' নীতি সংবিধানে সন্নিবেশিত করে, জিয়া সরকার তা ত্যাগ না করলেও নতুন ধারা ২৫(২) যোগ করে ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকে নীতি হিসেবে গণ্য করে মতাদর্শিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটায়। জিয়া সরকার সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' যোগ করেন।[৫৮]

পরবর্তীকালে, ১৯৮২ সালের মার্চে এইচ এম এরশাদ একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন।[৫৯] জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন। জনগণের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্য ছাড়াও এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বিশ্ব বিশেষকরে আরব রাষ্ট্রসমূহের আস্থা অর্জন। বিএনপি (বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি) শাসনের শেষদিকে গৃহীত দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা উদ্যোগের আওতায় অনুসৃত আঞ্চলিক সহযোগিতার নীতি দ্বারা প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে পূর্বের উত্তেজনা হ্রাস পায়। এরশাদ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম একটি ক্ষেত্র হচ্ছে ৮০'র দশকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সদস্য প্রেরণ।[৬০]

এ পর্যায়ে এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি সরকার গঠন করে। এই সরকার তার পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে জিয়া সরকারের গৃহীত নীতিই অনুসরণ করে। এই সরকারের পক্ষে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলোর মীমাংসা করে সম্পর্ক বজায় রাখা কঠিন ছিল কিন্তু চীন, জাপান এবং ইসলামী দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক শক্তিশালী করার নীতি অনুসরণ করে। উপরন্তু ইরাক ও ইরান উভয়ের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করে।[৬১] এই সরকারের পররাষ্ট্রনীতিতে চীন এবং পশ্চিমের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক তৈরি এবং স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী ভূ-অর্থনৈতিক গুরুত্বকে উপলব্ধি করার প্রবণতা দেখা যায়। উদারীকরণ,

বিশ্বায়ন এবং বেসরকারিকরণের যুগে বাংলাদেশও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উদারীকরণের পথে এগিয়ে চলে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করেন। এই সরকার অর্থনৈতিক কূটনীতির সূচনা করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে আঞ্চলিক চুক্তির ওপর জোর দেয়া হয় এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন ফোরামে (বিমসটেক, ডি-এইট) কার্যকরভাবে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে।[৬২] আওয়ামী শাসনামলে অর্থাৎ ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বিশেষকরে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে। উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ১৯৯৬ সালে ভারতের সঙ্গে ৩০ বছরের গঙ্গা পানি চুক্তির সন্ধি পত্র লেখা হয় এবং ১৯৯৭ সালে উপজাতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম সফলতা হচ্ছে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বার দুই বছরের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়।[৬৩]

এরপর বিএনপি ২০০১ সালে ইসলামী দলবদ্ধ হয়ে জোট সরকার গঠন করে ক্ষমতায় আসেন এবং ভারতের সঙ্গে আবারও সম্পর্ক অবনতি হয়। অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রেখে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে 'পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি' গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়াও চীন, মিয়ানমার, থাইল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার প্রবণতা দেখা যায়। এই সরকার মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়।[৬৪] এ সময় চরমপন্থীদের দ্বারা সারাদেশে বোমা বিস্ফোরণ সিরিজের মতো সহিংস ঘটনা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে এ সময় বাংলাদেশ (তুরস্ক নির্বাচিত হয়) ওআইসির মহাসচিব পদ লাভে ব্যর্থ হয়।[৬৫]

২০০৯ সালে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়নের কথা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের নিরাপত্তা ধারণা বিবেচনায় রেখে প্রায় তিন দশক পর ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা ঘোষণা করা হয়। এ সরকার রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাশিয়ার সাহায্যে দেশে পারমাণবিক প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।[৬৬]

কাজেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রতিবেশীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে, অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় নীতির দিক দিয়ে কিছু তারতম্য এবং পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর নির্ভর করে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।[৬৭]

মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতি

মিয়ানমারের স্বাধীনতার সময়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'স্নায়ুযুদ্ধ' চলছিল যার মধ্যে একটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ব্লক তৈরি হয়। এ সময় ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হতে শুরু করে। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলো বাইরের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে 'স্বাধীন' বৈদেশিক নীতি গ্রহণের পক্ষে ছিল। মিয়ানমার ভৌগোলিকভাবে দুটি অত্যন্ত জনবহুল জাতি ভারত ও চীনের মধ্যে অবস্থিত। তাছাড়া স্বাধীনতার সময়ে মিয়ানমার একটি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়। সেজন্য

মিয়ানমার তার মাটিতে বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি এড়াতে দুটি বড় ব্লক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে। স্বাধীনতার সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের দিকেও অগ্রাধিকার দেয়া অপরিহার্য ছিল। কাজেই মিয়ানমার স্বাধীনতা অর্জনের সময় থেকে এবং পরেও ধারাবাহিকভাবে একটি 'স্বাধীন এবং জোট নিরপেক্ষ' পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে।[৬৮]

১৯৫৪ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌএনলাই-এর ভারত ও মিয়ানমার সফরকালে মিয়ানমার, চীন এবং ভারত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি মূলনীতি তুলে ধরেন। সেই অনুযায়ী, ১৯৫৪ সালের ২৮শে জুন চীন ও ভারত নয়া দিল্লিতে এবং ২৯শে জুন মিয়ানমার এবং চীন ইয়াঙ্গুনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এর পাঁচটি নীতিতে সম্মত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এর পাঁচটি নীতি হলো-

১. প্রতিটি রাষ্ট্রের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক সম্মান;
২. পারস্পরিক আক্রমণাত্মক নীতি পরিহার;
৩. প্রতিটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ পরিহার;
৪. পারস্পরিক সমতার জন্য সম্মান এবং সুবিধার জন্য কাজ করা; এবং
৫. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

উপরে বর্ণিত 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' এর পাঁচটি মূলনীতি অবিচলিতভাবে মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান ভিত্তি।[৬৯]

১৯৭১ সাল থেকে মিয়ানমারের 'স্বাধীন এবং জোট নিরপেক্ষ' পররাষ্ট্রনীতি 'স্বাধীন এবং সক্রিয়' পররাষ্ট্রনীতিতে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলা পুনর্নির্মাণ কাউন্সিলের ১৮.৯.৮৮ এর ৩/৮৮ ঘোষণা দ্বারা মিয়ানমার কোনো ব্লকে আবদ্ধ না হয়ে নিজস্ব 'স্বাধীন এবং সক্রিয়' পররাষ্ট্রনীতি অনুশীলন করে। আন্তর্জাতিক বিষয়ে অর্থাৎ বিশ্বশান্তির জন্য কোনো অধিকার আদায়ের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ছাড়া মিয়ানমার ধারাবাহিকভাবে 'স্বাধীন এবং সক্রিয়' পররাষ্ট্রনীতি অব্যাহত রাখে। মিয়ানমার সক্রিয়ভাবে বিশ্বশান্তির জন্য যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিবাদ বিরোধীতা এবং সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করে।[৭০] মিয়ানমারের সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতি সন্নিবেশিত আছে, নিচে তা দেওয়া হলো-

ক. রাষ্ট্র স্বাধীন, সক্রিয় এবং নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে বিশ্বশান্তির জন্য বিভিন্ন জাতির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে কাজ করবে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' এর মূলনীতিগুলোকে ধারণ করবে।
খ. অন্য জাতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কখনও আগ্রাসন শুরু করবে না;
গ. মিয়ানমারের সীমানার মধ্যে কোনো বিদেশী সৈন্য স্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।[৭১]

মিয়ানমার নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুযায়ী স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুশীলন করে-

- সমস্ত জাতি এবং প্রতিবেশী বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্মান এবং আনুগত্য, সমতা নীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি নীতির অনুশীলন;

• একটি নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং শুধু আন্তর্জাতিক বিষয়ে অবস্থানের নীতি গ্রহণ;

• সমস্ত জাতির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভাল প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখা;

• জাতিসংঘ ও তার অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সমর্থন অব্যাহত রাখা;

• দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক পারস্পরিক সহযোগিতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

• আঞ্চলিক আলোচনা এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরস্পরিক সহযোগিতা;

• আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং একটি ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, হস্তক্ষেপ, আগ্রাসন বিরোধী কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ;

• জাতীয় উন্নয়নে বিদেশী সহায়তা গ্রহণ।[৭২]

মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি

মিয়ানমারের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশক মূলনীতিসমূহ (Directive Principles of State Policy) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের অধ্যায় ১- এ রাষ্ট্রের **মূলনীতিসমূহ** সন্নিবেশিত রয়েছে। নিচে তা দেওয়া হলো-

ক. মিয়ানমার একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র;
খ. রাষ্ট্রটি মিয়ানমার প্রজাতন্ত্র বা Pyidaungsu Thamada Myanmar Naing-Ngan Daw হিসেবে পরিচিত হবে;
গ. জাতিই রাষ্ট্র যেখানে বিভিন্ন জাতীয় জাতিগোষ্ঠী একসাথে বসবাস করবে;
ঘ. রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস জনগণ এবং এই শক্তি সারাদেশে বলবৎ থাকবে;
ঙ. আঞ্চলিক সীমানা রাষ্ট্রের শক্তি হিসেবে রাষ্ট্রের সংবিধানে বলবৎ থাকবে।

২। সংবিধানে রাষ্ট্রের **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** সন্নিবেশিত আছে। ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো-

ক. অ-খণ্ডিত ইউনিয়ন
খ. অ-খণ্ডিত জাতীয় সংহতি
গ. চিরস্থায়ী সার্বভৌমত্ব
ঘ. একটি উদীয়মান সমৃদ্ধশালী সঠিক বহুদলীয় গণতন্ত্র
ঙ. রাষ্ট্রের পার্থিব মান যথা বিচার, স্বাধীনতা ও সমতা বজায় রাখা
চ. রাষ্ট্রের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকায় সেনাবাহিনী বা Tatmadaw (Armed forces) অংশগ্রহণে সক্ষম;[৭৩]

মিয়ানমার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ভিত্তিতে জাতিসংঘের নীতি এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিশ্বের বিষয়াবলি নিয়ে নিম্নরূপ কার্যক্রম অনুসরণ করে-

- নিজস্ব মৌলিক নীতি অনুযায়ী জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ;
- ধারাবাহিকভাবে নিরস্ত্রীকরণ সমর্থনকারী;
- অস্ত্র সংরক্ষণ, উৎপাদন ও বিক্রয় বিরোধী;
- জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমর্থনকারী;
- অনুপনিবেশিকরণ সমর্থনকারী;
- সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী;
- উপনিবেশবাদ, পৃথকীকরণ এবং জাতিগত বৈষম্য বিরোধী;
- বিশ্বশান্তি নিশ্চিতকরণ; এবং
- আক্রমনাত্মক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধী।[৭৪]

মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ

১। ভূ-কৌশলগত অবস্থান

মিয়ানমার ৬৭৮,৫০০ বর্গকিলোমিটার (২৬১,৯৭০ বর্গমাইল) এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। মিয়ানমারের পশ্চিমে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ভারতের মিজোরাম, উত্তর-পশ্চিমে ভারতের আসাম, নাগাল্যান্ড ও মণিপুর অবস্থিত। মিয়ানমারের সীমানার উত্তর-পূর্বাংশের ২,১৮৫ কিলোমিটার জুড়ে আছে তিব্বত এবং চীনের ইউনান প্রদেশ। দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে লাওস ও থাইল্যান্ড। দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরের সাথে মিয়ানমারের ১,৯৩০ কিলোমিটার উপকূল রেখা রয়েছে। উপকূলীয় এলাকাটি নিম্ন মিয়ানমার এবং অভ্যন্তরীণ অংশটি ঊর্ধ্ব মিয়ানমার নামে পরিচিত। অশ্বখুরাকৃতি পর্বতব্যবস্থা ও ইরাবতী নদীর উপত্যকা দেশটির ভূ-সংস্থানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৭৫] মিয়ানমার টেক্সাসের চেয়ে সামান্য ছোট, ইন্দোচীন উপদ্বীপের থাইল্যান্ড/কম্বোডিয়া অংশ দখল করে আছে। দক্ষিণে ইরাবতী নদীর উর্বর ব-দ্বীপের সঙ্গে খাল ও নয়টি প্রধান নদী মুখের সংযুক্ত নেটওয়ার্ক রয়েছে।[৭৬] কাজেই ভূ-কৌশলগত অবস্থান দেশটির পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত হয়।

২। প্রাকৃতিক সম্পদ

কয়েক দশক ধরে মিয়ানমার সামরিক একনায়কত্বের অধীনে শাসিত। তথাপি দেশটি পানি, তেল, কাঠ, গ্যাস থেকে শুরু করে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে আর্শীবাদপূর্ণ। এটা প্রমাণিত যে প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট মজুদ ৭.৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যা বিশ্বের ৪৬তম বৃহত্তম মজুদ। এছাড়াও দেশটিতে তেল মজুদ আছে, যদিও আহরণের সীমাবদ্ধতার কারণে স্কেল অনুমান করা খুবই কঠিন। বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৯০ শতাংশ জেড মিয়ানমারের এবং এখানে বিশ্বের অমূল্য নীলকান্তমণি সহ বিভিন্ন

রত্নের অন্যতম শীর্ষ বিক্রেতারা রয়েছে। সেইসাথে দেশটি বিশ্বের ২৫তম বৃহত্তম কৃষি জমিতে সমৃদ্ধ। যা দেশটির পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩। জনসংখ্যা

মিয়ানমারের আরেকটি কার্যকর সম্পদ হলো জনসংখ্যা। দেশে আনুমানিক ৪৬ মিলিয়ন কাজের-বয়সের জনসংখ্যা রয়েছে। যা উৎপাদনে নিম্ন মজুরির জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হতে পারে। মিয়ানমারে অনেক প্রবাসী রয়েছে। যাদের বাইরের কাজের অনেক দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে। যারা অর্থনীতির মধ্যে দক্ষতা ও গতিশীলতা আনতে মিয়ানমারের অর্থনীতিতে প্রধান বিনিয়োগকারী হতে পারে। উদাহরণসরূপ- চীনে ১৯৮৫-২০০০ সালের মধ্যে বিদেশি বিনিয়োগের প্রায় ৭০ শতাংশ প্রত্যক্ষ অবদান বিদেশী চীনাদের।[৭৭] কাজেই জনসংখ্যাও যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে নিয়ামক হতে পারে।

৪। বৃহৎ শক্তিসমূহের ভূমিকা

মিয়ানমারের সঙ্গে চীন ও ভারত উভয়ের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। মিয়ানমার থেকে চীন তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগসহ বাণিজ্যিক সুবিধা পায় আর চীন থেকে মিয়ানমার সামরিকভাবে সহায়তা পায়। ভারতের ওপর ভূরাজনৈতিক কৌশলগত সুবিধা বাড়াতে মিয়ানমারের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়।[৭৮] ৯০'র দশকের দিকে ভারতও তার নীতির পরিবর্তন করে মিয়ানমারের সঙ্গে গ্যাস খাতে চুক্তি ও বিনিয়োগ শুরু করে। ফলে কৌশলগত ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই দেশটির প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আগ্রহী হয়ে ওঠে।[৭৯] কাজেই বৃহৎ শক্তিসমূহের ভূমিকা মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

৫। অভ্যন্তরীণ জাতিগত বিদ্রোহ

মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বিশ্বের দীর্ঘতম চলমান এক গৃহযুদ্ধ এবং ১৯৪৮ সালে ব্রিটেনের (UK) কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই এই দ্বন্দ্বের শুরু। মিয়ানমারের জাতিগত ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ধারাবাহিক অগণ্য লড়াই।[৮০] ১৯৪৮ সালে বর্মি সংবিধান স্বাক্ষরের সময় থেকে জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভূখন্ডে সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভাবশালী বর্মী দ্বারা ক্রমাগত নিপীড়িত হয়েছে।[৮১] কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন (KNU- The Karen National Union) একটি স্বাধীন কারেন রাজ্য তৈরির জন্য এই দ্বন্দ্বের শুরু করে। ১৯৬০ সালের শুরুর দিকে কেন্দ্রীয় সরকার একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন অস্বীকার করায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের জাতিগত বিদ্রোহ শুরু হয়। ৮০'র দশকের দিকে রাজনৈতিকভাবে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হলেও মূলত জাতিগত বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে।[৮২] এছাড়া ধর্মও জাতিগত দ্বন্দ্বে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। মিয়ানমারে মুসলিম, হিন্দু, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ সকলের বসবাস। এই ধর্মীয় পার্থক্য কয়েকটি ঘটনায় সন্নিবেশিত হয়ে মিয়ানমারের শত সহস্র নাগরিকদের প্রভাবিত করেছে। একটি অসহিষ্ণু এবং অসহানুভূতিশীল সরকার দ্বারা নির্যাতিত হয়ে কারেন

(Karen), কারেননি (Karenni) ও মোন (Mon) জাতিগোষ্ঠী প্রতিবেশী থাইল্যান্ডের কাছে আশ্রয় চাইতে বাধ্য হয়।[৮৩] ফলে অভ্যন্তরীণ জাতিগত বিদ্রোহ মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম নির্ধারক।

৬। ধর্ম

ধর্ম মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। মিয়ানমারে ৫৪ মিলিয়ন জনসংখ্যা রয়েছে (২০০৯ পর্যন্ত), যার ৯০% থেরাভাদা বুদ্ধিজম (প্রায় ৪৮ মিলিয়ন), ৪% খ্রিস্টান (১.৬৫ মিলিয়ন ব্যাপ্টিস্ট - Baptist এবং ৫৫০,০০০ রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত), ৪% ইসলাম (২.২ মিলিয়ন), ১% হিন্দু (৫৫০,০০০), এবং অবশিষ্ট ১% মহাযান বৌদ্ধধর্ম, বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম ও সর্বপ্রাণবাদ নিয়ে গঠিত। ১৯৬২ সাল থেকে মিয়ানমার দমনমূলক স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের অধীনে শাসিত হয়েছে। ৮৮৮৮ (১৯৮৮ সালের ৮ই আগস্ট মিয়ানমারে সামরিক সরকার বিরোধী মূল গণবিক্ষোভ সংগঠিত হওয়ায় এটি ৮৮৮৮ বিদ্রোহ নামে পরিচিত) এর রক্তাক্ত বিদ্রোহ দমনের পর ১৯৭৪ এর সমাজতান্ত্রিক সংবিধান ১৯৮৮ সালে স্থগিত হওয়ার পর ধর্মীয় স্বাধীনতার সাংবিধানিক সুরক্ষার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সাধারণত কর্তৃপক্ষ উপাসনার জন্য বেছে বেছে সবচেয়ে অনুগামী নিবন্ধিত ধর্মীয় দলগুলোকে অনুমতি দেয়; তবে সরকার নির্দিষ্ট ধর্মীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে অপব্যবহার বলে বিবেচনা করা হয়। খ্রিস্টান ও ইসলামী দলগুলোর বিদ্যমান উপাসনালয় মেরামত বা নতুন কিছু গড়ে তোলার অনুমতি নিতে অব্যাহতভাবে দুর্দশা ভোগ করতে হয়। মুসলিম কার্যক্রমের ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে মুসলিম বিরোধী সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। সরকার বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে ছাত্র এবং দরিদ্র যুবকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। সাধারণত সরকারি এবং সামরিক পদমর্যাদায় পদোন্নতির পূর্বশত হলো বৌদ্ধ ধর্মে আনুগত্য, প্রচার বা বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া।[৮৪] কাজেই ধর্ম মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

৭। ইতিহাস

ঐতিহাসিকভাবে, ১৯ শতকের পূর্বে মিয়ানমারে বিভিন্ন রাজবংশ দ্বারা শাসিত একটি রাজতন্ত্র চালু ছিল।[৮৫] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন এই দেশটি অর্থাৎ মিয়ানমার অখণ্ড ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৮৮৫ সালেই পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।[৮৬] ১৯৪৮ সালে বার্মা ইউনিয়নের স্বাধীনতার পশ্চাতেই জাতিগত সংখ্যালঘুদের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে রাষ্ট্র গৃহযুদ্ধে প্রবেশ করে এবং এই জাতিগত বিদ্রোহ অব্যাহত রয়েছে। ১৯৬২ সালে সামরিক নেতা নে উইন ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর শাসনামলে জাতি এবং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীভূত করে 'বর্মীরা সমাজতন্ত্রের পথে' বিচ্ছিন্ন জাতীয়তাবাদী নীতি চালু করে। ১৯৮৮ সালে গণ-আন্দোলনের পরেও সামরিক শাসন দেশটিতে বিরাজমান এবং দেশের জনগণ গণতন্ত্রের জন্য অব্যাহতভাবে লড়েই যাচ্ছে।[৮৭] ফলে ইতিহাস মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম নির্ধারক।

৮। নেতৃত্বের ধরন

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে মিয়ানমার সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বার্মার ইতিহাসকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত আর ১৯৬২ সালের মার্চ থেকে দ্বিতীয় ভাগের শুরু হয়েছে, যা চলমান।[৮৮] ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ এই দশ বছর ছিল উনুর শাসনামল। নতুন সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই দেশ শাসন করেন। এরপর ১৯৫০ সালে নির্বাচনে উনু ও তাঁর দল জয়ী হয়। এ সময় স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন তীব্রতর হওয়ায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান নে উইন ১৯৬২ সালে এক রক্তপাত বিহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্টীয় ক্ষমতা দখল করেন।[৮৯] এরপর থেকে একের পর এক জেনারেলরা দেশটি শাসন করে চলেন। ১৯৮৮ সালে স্লর্ক (স্লর্ক- দ্যা স্টেট ল অ্যান্ড অর্ডার রিস্টোরেশন কাউন্সিল) নাম নিয়ে নতুন এক সামরিক পরিষদ ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে কুক্ষিগত করে রাখার পথ পাকা করে। ১৯৯২ সালে জেনারেল থান শোয়ে ক্ষমতায় এসে এসপিডিসি'র (এসপিডিসি- দ্যা স্টেট পিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল) হাল ধরেন। এটি স্লর্কের নব সংস্করণ। কাজেই নেতৃত্বের ধরণ মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।[৯০]

৯। আঞ্চলিক পরিস্থিতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে মিয়ানমার ঔপনিবেশিক শাসন থেকে বেরিয়ে স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে স্বাধীন এবং জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে। বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মোকাবিলা করে মিয়ানমার ৬২'র পর সামরিক শাসনের কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা-উত্তর সংগ্রাম থেকে নিজেকে বিছিন্ন করে দেয়। ৮৮'র ঘটনার পর সামরিক শাসকগণ তাদের স্ব-আরোপিত বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করে। কিন্তু মিয়ানমার ২০ বছর ধরে কার্যকরীভাবে যে বিচ্ছিন্নতা আরোপ করে রেখেছে তার বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ শুরু করে। পশ্চিমা আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি বাফার হিসেবে মিয়ানমারের সামরিক সরকার তার প্রতিবেশীদের বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংস্থা (আসিয়ান)- এর অন্যান্য সদস্যদের এবং চীনকে ব্যবহার করে আত্মরক্ষামূলক বিদেশী নীতি গ্রহণ করে। কাজেই আঞ্চলিক পরিস্থিতি মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।[৯১]

মিয়ানমার অধিকাংশ সময় সামরিক শাসনে আবদ্ধ হওয়ায় এর পররাষ্ট্রনীতিও বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। ১৯৪৮ সালে বার্মা ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে 'বার্মা ইউনিয়ন' নামে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নির্ভর সংসদ পদ্ধতি গড়ে তোলে। ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে 'সমাজতন্ত্রের পথে বার্মা' নামে সমাজতান্ত্রিক সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত ব্যবসা বাজেয়াপ্ত করে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার নীতি অনুসরণ করেন।[৯২]

১৯৮৮ সালের গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভ মিয়ানমারের উত্তর-ঔপনিবেশিক রাজনীতিতে একটি কেন্দ্রগত মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।[৯৩] কারণ ১৯৮৯ সালে সামরিক সরকার দেশের নাম পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে বার্মা থেকে মিয়ানমার করে। এছাড়াও গণপরিষদের ১৯৭৪ এর সংবিধান সংশোধন এবং পুরনো শাসনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করে। মিয়ানমারের সামরিক শাসকরা ১৯৯০

সালের নির্বাচনের ফলাফল অস্বীকার করেন[৯৪] এবং এরপর নেতৃস্থানীয় জেনারেলরা চারটি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি আরোপ করেন-

প্রথমত, জান্তা শাসন বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ১৯৮৮ সালে সৈন্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার ছিল যা ১৯৯০ সালের শেষদিকে প্রায় ৩ লক্ষ হয়।

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলন যাতে পুনরায় না হয় সেজন্য জান্তা শাসন বিশেষকরে এনএলডির সাংগঠনিক কাঠামো ভেঙ্গে দেয়। তারা দলের নেতৃত্ব ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে অংসান সুচিকে গৃহবন্দি এবং দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে জেলখানায় প্রেরণ করে।

তৃতীয়ত, জান্তা শাসন তার সীমানার মধ্যে ওয়া (WA) এবং কাচিন (Kachin) সশস্ত্র দলের মতো অনেকের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে জাতিগত সশস্ত্র আন্দোলন প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তবে কারেনদের সঙ্গে চূড়ান্ত শান্তি নিস্পত্তি সম্ভব হয়নি।

চতুর্থত, স্লর্ক দেশে বাণিজ্য ও বিদেশী বিনিয়োগ উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করে। তবে জান্তা শাসনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কোনো দক্ষ লোক ছিল না এবং এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব অর্পণ করতে জেনারেলের আপত্তি ছিল। কাজেই ১৯৯০ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং প্রসারণশীল মুদ্রাস্ফীতির ফলে মিয়ানমারে বিনিয়োগ হ্রাস পায়।[৯৫]

বিশেষকরে ১৯৯১ সালে অংসান সুচি নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর থেকে মিয়ানমার ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়ে এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়।[৯৬] এ সময় মিয়ানমার নতুন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ শুরু করে।

মিয়ানমারের অভ্যন্তরে বিদ্রোহী কমিউনিস্ট পার্টি অব বার্মা (সিপিবি)-এর মূল পৃষ্ঠপোষক ছিল চীন। ফলে ১৯৪৯ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত দুদেশের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ১৯৮৬ সালে চীন সিপিবির ওপর থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন তুলে নেয়। এরফলে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিগত বিদ্রোহ, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনে চীন মিয়ানমারকে বহুমুখী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। চীনের সমর্থন মিয়ানমারের সামরিক জান্তাকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলে। জান্তা শাসন এই সুযোগকে ব্যবহার করে দেশের মধ্যে যেমন তাদের ক্ষমতা বাড়ায়, তেমনি একটি শক্তিশালী সমরশক্তির দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে চীনের সর্বোচ্চ সহায়তা পায়।[৯৭]

সামগ্রিকভাবে এটা স্পষ্ট যে, চীনের প্রতি মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপ্তি শুধুমাত্র সীমিত ভূ-রাজনৈতিক উদ্বেগ দ্বারা নির্ধারিত হয়। মিয়ানমারের ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিবেচনায় বৃহৎ প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের কারণে মিয়ানমারের কূটনৈতিক সম্পর্ক চীনের দিকে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৯০ সালের পূর্বে মিয়ানমারের ভূ-রাজনৈতিক কৌশল ছিল ধারাবাহিকভাবে সরকারের মতাদর্শগত অগ্রাধিকার অর্থাৎ প্রায়ই দমনমূলক, জাতীয় ঐক্য উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এবং একটি শক্তিশালী একক রাষ্ট্র তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। তবে ঊনিশ'শ নব্বই এবং বিংশ শতাব্দীর সর্বত্র মিয়ানমার সরকারের লক্ষ্য চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উন্নয়নে দেখা যায়।[৯৮]

সিনিয়র জেনারেল থান শোয়ে ছিল 'স্টেট পিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের' চেয়ারম্যান। ২০০৪ সালের ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত তার নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী ছিল খিন নিয়ন্ত্ত। এ সময় প্রায় সব মন্ত্রীসভার অফিস সামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।[৯৯] ১৯৯২ সালে জান্তা শাসনে যখন সিনিয়র জেনারেল থান শোয়ের পরিবর্তে জেনারেল স মং এর উত্থান হয় সেখানেও লোকচক্ষুর অন্তরালে জেনারেল নে উইন এর প্রভাব বিদ্যমান থাকে। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারীতে থান শোয়ে একটি নতুন সংবিধানের খসড়া তৈরির জন্য জাতীয় সভা আহ্বান করলেও, সভা স্থগিত এবং ভবিষ্যতে যে কোনো সরকারের সময়ে সামরিক বাহিনীর জন্য প্রতিনিধি সভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়।

১৯৯৭ সালের নভেম্বরে 'স্লর্ক' দুর্বল অর্থনীতি এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দল, বিদেশী সংস্থা এবং সরকারের চাপের সম্মুখীন হয়ে নিজেই নাম পরিবর্তন করে 'দ্যা স্টেট পিস এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল' (SPDC- The State Peace and Development Council) রাখে। এটি নিছক একটি অঙ্গরাগ পরিবর্তন মাত্র। এছাড়াও থান শোয়ে 'দ্যা ইউনিয়ন সলিডারিটি এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন' (USDA- The Union Solidarity and Development Association) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনসাধারণের সমর্থন আদায় করে তাঁর নিজস্ব অবস্থান নিরাপদ করার চেষ্টা করেন। যদিও 'ইউএসডিএ' একটি সামাজিক সংগঠন, তথাপি জান্তা শাসনের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়।[১০০]

১৯৯৭ সালে মিয়ানমারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অব্যাহত রিপোর্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা তীব্রতর করে আর ২০০০ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নও তা অনুসরণ করে।[১০১] এসপিডিসি'র সময়কালে অবরুদ্ধ মিয়নামারের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অস্ট্রেলিয়ার নিষেধাজ্ঞা অরোপিত ছিল। যার প্রভাবে বিশ্ব ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (IFIs) থেকে রেয়াতি ঋণ প্রাপ্ত হয় এবং সরকারিভাবে বেশির ভাগ পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে এ সময় মিয়ানমার তার প্রতিবেশীদের বিশেষকরে চীন ও ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করে এবং ১৯৯৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংস্থা আসিয়ান এর একজন সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়।[১০২]

২০০০ সালের মাঝামাঝিতে মিয়ানমার সরকার নিজস্ব সার্বভৌমত্বের ক্রমবর্ধমান বিপর্যয় থেকে উত্তরণের জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ট গড়ে তোলে। বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের মাধ্যমে পশ্চিমের সঙ্গে পুনরায় ভারসাম্যপূর্ণ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলো আরো সহজেই সমাধান করা সম্ভব হবে।[১০৩]

কিন্তু ২০০৩ সালের মে মাসে ডিপায়েন (Depayin) শহরের অদুরে ফাঁদ পেতে অংসান সুচি'র মোটরগাড়ির র‍্যালীর ওপর বেসামরিক দাঙ্গা চালিয়ে আবার সুচিকে গৃহবন্দি করা হয়। যা 'ডিপায়েন গণহত্যা' নামে পরিচিত। ২০০৩ সালের আগস্ট-এ খিন নিয়ন্ত্ত সরকার 'ডিপায়েন গণহত্যা' থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য সাত ধাপে 'গণতন্ত্রের রোডম্যাপ' ঘোষণা করেন।[১০৪] সরকারের অগ্রগতিশীল পরিকল্পনা যাচাইয়ের জন্য কোনো সময় নিরুপণ তালিকা, শর্ত বা কোনো স্বাধীন প্রক্রিয়া ছিল না। যে কারণে 'রোডম্যাপ' বাস্তবায়নে সন্দিহান হয়ে অধিকাংশ পশ্চিমা দেশ ও মিয়ানমারের প্রতিবেশীরা এর সমালোচনা করে।[১০৫]

২০০৩ সালে মার্কিন সরকার 'মিয়ানমারের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র আইন'-এর অংশ হিসেবে মিয়ানমার থেকে সব আমদানি নিষিদ্ধ করে দেয়। এই নিষেধাজ্ঞার অনুমোদন সাধারণ নাগরিকদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।[১০৬]

১৯৯৩ সালের পর প্রথমবারের মতো ২০০৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী সরকার পুনরায় জাতীয় প্রতিনিধিসভা আহ্বান করে নতুন করে সংবিধান লেখার প্রয়াস নেন। তবে এতে 'ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি'সহ প্রধান গণতন্ত্রপন্থী সংস্থা এবং দলগুলোর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়, শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর নির্বাচিত ছোট দলগুলোকে অনুমতি দেওয়া হয়। ২০০৬ সালের জানুয়ারীতে সংবিধান লিখিত ছাড়াই কনভেনশন আবার মুলতবি করা হয়।[১০৭]

২০০৭ সালের আগস্ট-এ জান্তা শাসন অপ্রত্যাশিতভাবে তেলের দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করে। পরিবহন এবং খাদ্য খরচ আকাশচুম্বী হওয়ায় দারিদ্রের ওপর বিধ্বংসী প্রভাব ফেলে। জাফরান রঙের গাউন পরিহিত হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ সংঘঠিত হয় এবং বিক্ষোভে সন্ন্যাসীরা সামরিক বাহিনী দ্বারা মারাত্মকভাবে নির্যাতিত হয়। যা 'জাফরান বিপ্লব' (Saffron Revolution) নামে পরিচিতি পায়। জাফরান বিপ্লবের পর জান্তা শাসন দ্রুত 'গণতন্ত্রের রোডম্যাপ' এর দিকে এগিয়ে যায়।[১০৮] এ বিপ্লবের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন উভয়ই মিয়ানমারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা আরো জোরদার করে।[১০৯]

২০০৮ সালের মে মাসে মিয়ানমার সরকার নতুন সংবিধানের ওপর তথাকথিত 'গণতন্ত্রের রোডম্যাপ' এর অংশ হিসাবে গণভোট পরিচালিত করে। এই সংবিধানে ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) সংসদে সামরিক বাহিনীর আসন এক চতুর্থাংশ বরাদ্দ করে এবং নির্বাচনে সুচির অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। যাতে ২০১০ সালের নির্বাচনে সামরিক শাসনের আড়ালে বেসামরিক শাসনের পথ প্রশস্ত হয়। এনএলডি ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগে এই নির্বাচন বর্জন করে এবং নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু না হওয়ায় জাতিসংঘ এবং অস্ট্রেলিয়াসহ বেশির ভাগ পাশ্চাত্য দেশ প্রচন্ডভাবে এর সমালোচনা করে।[১১০]

মিয়ানমারে কোনো স্বাধীন বিচার বিভাগ নেই এবং সামরিক সরকার রাজনৈতিক কার্যক্রম অপ্রকাশিত করে রাখে। সামরিক সরকার গুগল, জিমেইল, ইয়াহু, হটমেইল এবং ব্লকসহ, ইন্টারনেট এক্সেস নিয়ন্ত্রণ করে।[১১১] মিয়ানমার সরকার মার্কিন কোম্পানি ফরটিনেট (Fortinet) থেকে সফটওয়্যার ভিত্তিক ফিল্টারিং, বিনামূল্যে ওয়েব, বিনামূল্যে ইমেইল, হোস্টিং পরিসেবাসহ নাগরিকদের অনলাইন অ্যাক্সেস করতে পারেন এমন উপকরণ এবং বেশিরভাগ রাজনৈতিক বিরোধী এবং গণতন্ত্রকামী পেজ ব্যবহার সীমাবদ্ধ করে দেয়।[১১২]

দেশটি ১৯৬২ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বিভিন্ন আকৃতিতে সামরিক শাসনের অধীনে থাকায় বিশ্বের অন্যতম অনুন্নত জাতিতে পরিণত হয়ে উঠেছে।[১১৩] বাস্তবতার নিরিখে কৌশলগত-নিরাপত্তা পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে এবং ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ঔপনিবেশিকত্তোর মিয়ানমারে স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে আঞ্চলিকতার স্থাপন হয়। ঐতিহাসিকভাবে এবং ঐতিহ্যগতভাবে মিয়ানমারে দ্বিপাক্ষিকতা এবং নিরপেক্ষতার নীতির ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্ক অনুসৃত হয় এবং এভাবে এ দুটি উপাদান মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান মতবাদ গঠন করে।[১১৪]

তথ্যনির্দেশ-

১. Hakan Wiberg, The Security of Small Nations: Challenges and Defences, *Journal of Peace Research*, Vol.24, No. 4, 1987, p. 339.

২. Michael Handel, *Weak states in the international system* (London: Frank cass, 1981), pp: 52-53.

৩. David Vital, *The Inequality of States: A Study of the Small Power in International Relations* (Oxford: Clarendon Press, 1969), p.8.

৪. P. J. Boyce, *Foreign Affairs for New States* (New York: St. Martin's Press, 1977), p. 233.

৫. A. K. Kemal, *Economic Indicators as a Requirement for Security, in Sayed Farooq Hasnat and Anton Pelinka, Security for the Weak Nations: A Multiple Perspective* (Lahore: Izharsons, 1987), p. 44.

৬. Robert Rothstein, *Alliance and Small Powers* (New York: Columbia University Press, 1968), p. 29.

৭. Karl W. Deutsch, *The Analysis of International Relation* (Englewood cliffs, N.J: Prentice-Hall Inc, 1968), p.31.

৮. Shaheen Akhtar, *Determinants of Foreign Policy Behaviour of Small States 'in south asia' Regional Studies (Islamabad),* Vol. x111, No-2, Spring 1995, p. 48.

৯. James. J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle For Power And Peace* (New York: Alfred A Knopf, 1963), p.2.

১০. Talukder Moniruzzaman, *The Security of Small State in the third world---Canberra: Canberra Papers on Strategy and Deviance*, NO: 5, The Australian National University, 1986, p.4.

১১. Robert Rothstein, *Op. cit*., p. 1.

১২. *Ibid.,* p. 14.

১৩. Erling Bjol, 'The Small States in International Politics', in August Schou and Arne Olax Brundtland, Small States in International Relations (Stoclholm: Almqvist and Wiksell.1971), p. 29.

১৪. Shaheen Akhter, *Op. cit*., p. 90.

১৫. Michael Handel, *Op. cit*., p. 52.

১৬. Paul commack, *David Pool and William Tordaff, Third World Politics* (London: The Macmillan Press Ltd, 1988), pp. 5-15.

১৭. A.K.M. Abdus Sabur, Foreign Policy of Bangladesh: Challenges in the 1990s, *BIISS Journal*, Vol-14, No-2, 1991, p.448.

১৮. Michael Handel, *Op.cit.,* pp: 52-53.

১৯. আকমল হোসেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিঃ সার্বভৌমত্ব ও ধারাবাহিকতার সংকট, *এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ*, চতুর্দশ খন্ড, ১ম সংখ্যা জুন ১৯৯৬, পৃ. ১০৩।

২০. Michael Handel, *Op.cit.,* p. 139.

২১. James. J. Morgenthaw, *Op. cit.,* P. 194.

২২. Golam Mostofa, *National Interest And Foreign Policy* (Delhi: South Asian publishers, 1995), p. 461.

২৩. Dr. Sushil Agarwal, *Super Powers And The Third World*, (Jaipur: Aalekh Publications, 1985), p.2.

২৪. Mohammad Ayub, *Conflict And Intervention In The Third World* (New York: St. Martins Press, 1980), p. 38.

২৫. Frederick Gaige, *The Role of Terai in Nepal's Economic Development*, Vasudha, Vol-XI, 1971, p.71.

২৬. মুহাঃ রুহুল আমীন, বাংলাদেশের স্নায়ুযুদ্ধোওর পররাষ্ট্রনীতি এবং বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্ক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা- ৫০,৫১,৫২ অক্টোবর, ৯৪ - জুন, ৯৫, পৃ. ৮২-৮৭।

২৭. Norman J. Padelford, *George A Lincoln and Lee D. Alvey- The Dynamics of International Politics* (New york: Macmillan Publishing co, 1976), p.201.

২৮. Emajuddin Ahmed (ed.), *Bangladesh Foreign Policy* (Dhaka: University Press limited, 1984), p.1.

২৯. Norman J. Padelford, *Op. cit.,*p. 234.

৩০. এম. এ. হালিম, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৬), পৃ. ২১।

৩১. *Emergence of foreign policy* - www.mesingapore.org.sg/policy.html.

৩২. আকমল হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১০৯-১১০।

৩৪. বাংলাদেশ গণপরিষদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত, ঢাকা : তারিখ উল্লেখ নেই), পৃ. ৭।

৩৫. *স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র*, http://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশ।

৩৬. *বাংলাদেশের সংবিধান*, http://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশের_ পররাষ্ট্র _ মন্ত্রণালয়।

৩৭. Md. Abdul Halim, *Foreign Policy of Bangladesh : Framework of Analysis*, in Emajuddin Ahmed (ed.) *Foreign Policy of Bangladesh, A Small States Imperative* (Dhaka: University press Ltd., 1984), P.4.

৩৮. http://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশের_ পররাষ্ট্র _ মন্ত্রণালয়।

৩৯. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও সাম্প্রতিক বিশ্ব* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ.১১।

৪০. Urmee Hossain, *Foreign Policy*, http://www.banglapedia.org/HT/F_0164.htm.

৪১. S. R. Chakravarty, *Foreign Policy of Bangladesh* (Delhi: Har Anand Publications, 1994), pp. 32-43.

৪২. Urmee Hossain, *Foreign Policy,* http://www.banglapedia.org/HT/F_0164.htm.

৪৩. A. M. A Muhit, *Bangladesh: Emergence of a Nation* (Dhaka University Press Ltd. 1978), p.1.

৪৪. S. R. Chakravarty, *Op. cit*., p. 37.

৪৫. *History of Bangladesh (from 1947 to 1971); Chronological History: Bangladesh Chapter,* http://studiesbangladesh.blogspot.com/2011/05/brief-history-of-bangladesh.html.

৪৬. *History of Bangladesh - Visit Bangladesh*, http://visitbangladesh.gov.bd/about-bangladesh/history-of-bangladesh/.

৪৭. S. R. Chakravarty, *Op. cit.,* p. 39.

৪৮. Barrister Harun Ur Rashid, Forty years of Bangladesh Foreign policy, *Dhaka courier*, Vol: 31, 8 April, 2011.

৪৯. S. R. Chakravarty, *Op. cit.,* p. 42.

৫০. Urmee Hossain, *Foreign Policy*, http://www.banglapedia.org/HT/F_0164.htm.

৫১. S. R. Chakravarty, *Op. cit.,* pp. 37, 41-42.

৫২. Urmee Hossain, *Foreign Policy*, http://www.banglapedia.org/HT/F_0164.htm.

৫৩. বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব.), *দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা*, (পালক পাবলিশার্স, ঢাকা- ২০০৬), পৃ. ১৬০।

৫৪. Urmee Hossain, *Foreign Policy*, http://www.banglapedia.org/HT/F_0164.htm.

৫৫. Barrister Harun Ur Rashid, Forty years of Bangladesh Foreign policy, *Dhaka courier*, Vol: 31, 8 April, 2011.

৫৬. Urmee Hossain, *Foreign Policy,* http://www.banglapedia.org/HT/F_0164.htm.

৫৭. Barrister Harun Ur Rashid, Forty years of Bangladesh Foreign policy, *Dhaka courier*, Vol: 31, 8 April, 2011.

৫৮. Urmee Hossain, *Foreign Policy*, http://www.banglapedia.org/HT/F_0164.htm.

৫৯. Barrister Harun Ur Rashid, Forty years of Bangladesh Foreign policy, *Dhaka courier*, Vol: 31, 8 April, 2011.

৬০. Urmee Hossain, *Foreign Policy*, http://www.banglapedia.org/HT/F_0164.htm.

৬১. Barrister Harun Ur Rashid, Forty years of Bangladesh Foreign policy, *Dhaka courier*, Vol: 31, 8 April, 2011.

৬২. Urmee Hossain, *Foreign Policy*, http://www.banglapedia.org/HT/F_0164.htm.

৬৩. Barrister Harun Ur Rashid, Forty years of Bangladesh Foreign policy, *Dhaka courier*, Vol: 31, 8 April, 2011.

৬৪. Urmee Hossain, *Foreign Policy*, http://www.banglapedia.org/HT/F_0164.htm.

৬৫. Barrister Harun Ur Rashid, Forty years of Bangladesh Foreign policy, *Dhaka courier*, Vol: 31, 8 April, 2011.

৬৬. Urmee Hossain, *Foreign Policy*, http://www.banglapedia.org/HT/F_0164.htm.

৬৭. Barrister Harun Ur Rashid, Forty years of Bangladesh Foreign policy, *Dhaka courier*, Vol: 31, 8 April, 2011.

৬৮. *FOREIGN POLICY OF MYANMAR,* www.myanmarbsb.org/foreign_policy.html.

৬৯. *EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR,* Washington D.C. (USA), www.mewashingtondc.com/MM_US_Relation_5.php.

৭০. *Foreign Policy of the Union of Myanmar,* www.embassyofmyanmar.be/ABOUT/foreignpolicy.htm.

৭১. *Myanmar Constitution -- Chapter 1,* (ENGLISH TRANSLATION OF THE MYANMAR CONSTITUTION), http://www.amnestyusa.org/Myanmar-Constitution-Chapter-1.

৭২. *EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR,* Washington D.C. (USA), www.mewashingtondc.com/MM_US_Relation_5.php.

৭৩. *Myanmar Constitution -- Chapter 1,* (ENGLISH TRANSLATION OF THE MYANMAR CONSTITUTION), http://www.amnestyusa.org/Myanmar-Constitution-Chapter-1.

৭৪. *MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR,* NAY PYI TAW, www.mofa. gov.mm/foreignpolicy/fiveprinciples.html.

৭৫. bn.wikipedia.org/wiki/মিয়ানমার।

৭৬. http://www.infoplease.com/country/myanmar.html.

৭৭. Heang Chhor, Richard Dobbs, *Myanmar's Moment? Eight reasons to be optimistic about South-East Asia's rising tiger,* MAY 31, 2013, http://foreignpolicy.com/2013/05/31/myanmars-moment/.

৭৮. মিয়ানমার, উইকিপিডিয়া, https://bn.wikipedia.org/wiki/মিয়ানমার।

৭৯. মোখলেসুর রহমান, *পরিবর্তনের পথে মিয়ানমার*, ২৫ নভেম্বর, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৩১, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2011-11-25/31.

৮০. *The internal conflict in Burma*, https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_conflict_in_Burma; Patrick Winn (13 MAY 2012), *"Myanmar: ending the world's longest-running civil war"*, Pittsburgh Post-Gazette, 27 March 2013.

৮১. Politics of Burma, *Wikipedia,* https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Burma.

৮২. *The internal conflict in Burma,* https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_conflict_in_Burma; Licklider, R. (1995), *The Consequences of Negotiated Settlements in Civil Wars, 1945-1993,* The American Political Science Review, 89 (3), p. 681.

৮৩. Politics of Burma, *Wikipedi,* https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Burma.

৮৪. *Freedom of religion in Burma,* https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_Burma.

৮৫. Politics of Burma, *Wikipedia,* https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Burma.

৮৬. Surendra Prasad Singh, *Growth of Nationalism in Burma – 1900-1942,* Calcutta Firma KLM Private Limited, 1980, pp. 1-2.

৮৭. *Culture of Burma-Countries and Their Culture,* http://www.everyculture.com/Bo-Co/Burma.html.

৮৮. *সংবাদ*- ৮ অক্টোবর, ১৯৭৭, *ন্যাশনাল আর্কাইভস*, বাংলাদেশ।

৮৯. FARZANA HUSSAIN, Authoritarianism and prospect for Democracy in Myanmar, *BISS JOURNAL*, VOL.13, 1992, pp.1-4.

৯০. *দৈনিক প্রথম আলো*- ২৬ এপ্রিল, ২০১১।

৯১. Priscilla Clapp, The Influence of Domestic Issues on Myanmar's Foreign Policy: A Historical Perspective*, The National Bureau of Asian Research (NBR) Reports,* March 2014, pp.5-22.

৯২. Politics of Burma, Independence era, Military socialist era, *Wikipedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Burma.

৯৩. Amanda Fang, *Myanmar's foreign policy towards China 1988- 2012: To what extent has Myanmar's foreign policy towards China been determined by global geopolitical concerns in the period 1988 - 2012?* http://thurj.org/ss/2015/05/5286/.

৯৪. 1990–2006 (edit) Main article: State Peace and Development Council, *History of Burma,* https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Burma.

৯৫. *1990-2010: Military Rule*, Oxford Burma Alliance, http://www.oxfordburmaalliance.org/1990-2010-military-rule-continues.html.

৯৬. 1990–2006 (edit) Main article: State Peace and Development Council, *History of Burma,* https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Burma.

৯৭. মিয়ানমার, *উইকিপিডিয়া*, https://bn.wikipedia.org/wiki/মিয়ানমার।

৯৮. Amanda Fang, *Myanmar's foreign policy towards China 1988- 2012: To what extent has Myanmar's foreign policy towards China been determined by global geopolitical concerns in the period 1988 - 2012?,* http://thurj.org/ss/2015/05/5286/.

৯৯. *Politics of Myanmar, SPDC era,* https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Myanmar.

১০০. *1990-2010: Military Rule,* Oxford Burma Alliance, http://www.oxfordburmaalliance.org/1990-2010-military-rule-continues.html.

১০১. 1990–2006 (edit) Main article: State Peace and Development Council, *History of Burma*, https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Burma.

১০২. Dr Cameron Hill, Burma: domestic reforms and international responses, *Foreign Affairs, Defence and Security Section,* 22 MAY 2012, http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2011-2012/Burma.

၁၀၅. Amanda Fang, *Myanmar's foreign policy towards China 1988-2012: To what extent has Myanmar's foreign policy towards China been determined by global geopolitical concerns in the period 1988-2012?,* http://thurj.org/ss/2015/05/5286/.

၁၀၈. *1990 - 2010: Military Rule,* Oxford Burma Alliance, http://www.oxfordburmaalliance.org/1990-2010-military-rule-continues.html.

၁၀၎. 1990-2006 (edit) Main article: State Peace and Development Council, *History of Burma,* https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Burma.

၁၀၆. Politics of Burma, *Wikipedia,* https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Burma.

၁၀၇. 1990-2006 (edit) Main article: State Peace and Development Council, *History of Burma*, https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Burma.

၁၀၈. *1990-2010: Military Rule,* Oxford Burma Alliance, http://www.oxfordburmaalliance.org/1990-2010-military-rule-continues.html.

၁၀၉. L A Niksch and M A Weiss, Economic Sanctions: Burma, *Congressional Research Service*, 3 August 2009, 'Overview of Burma Sanctions' BBC News, http://assets.opencrs.com/rpts/RS22737_20090803.pdf.

၁၁၀. Dr Cameron Hill, Burma: domestic reforms and international responses, *Foreign Affairs, Defence and Security Section,* 22 MAY 2012, http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2011-2012/Burma.

၁၁၁. Open Net Initiative, *Internet Filtering in Burma in 2005: A Country Study,* July 31, 2005.

၁၁၂. Politics of Burma, *Wikipedia,* https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Burma.

၁၁၆. History of Burma, *Wikipedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Burma.

၁၁၈. Maung Aung Myoe, *Regionalism in Myanmar's Foreign Policy: Past, Present and Future,* http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1317171.

দ্বিতীয় অধ্যায়

চট্টগ্রামের আরাকানী রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা

আরাকান অঞ্চলটি বর্তমানে মিয়ানমারের একটি প্রদেশ। খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর ধরে এর স্বাধীন সত্তা, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা, রাজনৈতিক ঐতিহ্য প্রভৃতি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সময়ের ধারাবাহিকতায় মুসলমানগণ এখানকার অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একটি অভিনব এবং স্বতন্ত্র অধ্যায় বিনির্মাণে সক্ষম হয়।[১]

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল আরাকান। এটি উত্তর অক্ষাংশের ২১০২০" ও ১৬০২২" এর মধ্যে এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ৯২০২১" ও ৯৫০২০" এর মধ্যে অবস্থিত।[২] এর উত্তরে চীন ও ভারত, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তর ও পশ্চিমে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তবর্তী নাফ নদীর মধ্যসীমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম। পূর্বে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী ইয়োমা (Yoma) পর্বতমালা। এ সুদীর্ঘ, দুর্গম, সুইচ্চ বিশাল পর্বতমালা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত আরাকানকে মিয়ানমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।[৩] যোগাযোগের সুবিধা ও ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে মিয়ানমারের চেয়ে চট্টগ্রামই আরাকানের কাছাকাছি ও বন্ধুপ্রতীম অঞ্চল। প্রকৃতপক্ষে ছোটখাট পর্বতমালা ও নাফ নদীর ব্যবধান ব্যতীত উভয় অঞ্চলের (চট্টগ্রাম-আরাকান) অভিন্ন গোত্রীয় জনবসতির তেমন আর কোনো অন্তরায় ছিল না।[৪] আরাকানের আয়তন নির্ণয় খুবই কষ্টসাধ্য। বাংলার সাথে আরাকানের সীমা প্রায়ই পরিবর্তন হতো। বাংলাদেশের কক্সবাজার, রামু ও চট্টগ্রামসহ একটি বিশাল অংশ দীর্ঘদিন যাবৎ আরাকানের শাসনাধীনে ছিল। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান (১৬৬৩-৭৭; ১৬৭৯-৮৮ খ্রি.) কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের পর থেকেই কেবল এর আয়তন সঠিক অর্থে নির্ধারিত হয়। এ হিসেবে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত আরাকানের আয়তন ছিল ২০,০০০ (বিশ হাজার) বর্গমাইল। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা উত্তর পার্বত্য আরাকান বার্মার চিন (Chin) প্রদেশে এবং দক্ষিণ আরাকানের কিছু অংশ নিম্ন বার্মার ইরাবতী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করায় বর্তমানে এখানকার আয়তন ১৪,২০০ বর্গমাইল।[৫]

আরাকানের জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান প্রদান করা খুবই কষ্টসাধ্য। সামরিক জান্তা শাসিত দেশ হিসেবে সেখানকার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিস্থিতি এবং জনসংখ্যার বিন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই অস্পষ্টতা রয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনতা উত্তর মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলে কোনো আদমশুমারীও হয়নি। ফলে এ বিষয়ে মত পার্থক্যের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

এক. বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার ভাষ্য ও আরাকানের মুসলিম লেখকদের মতানুসারে আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ। তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ মুসলমান; যা প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠীর ৬০%।[৬]

দুই. ড. আব্দুল করিম এর মতে, আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ, তন্মধ্যে ২০ লক্ষ মগ-বৌদ্ধ, ১৪ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান, ৪ লক্ষ সর্বপ্রাণবাদী (Animist) এবং ২ লক্ষ হিন্দু ও খ্রিস্টান।[৭]

তিন. U.S. Committee for Refugees এর ভাষ্য "Arakans Population is estimated to be 3 to 3.5 million persons of whom approximately 1.4 million are Rohingya."[৮]

আরাকানী মুসলিম লেখকদের মতানুসারে প্রায় ১২ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলমান বিভিন্ন সময় নির্যাতনের মুখে আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এছাড়া ১৯৪২ সালে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা করে এবং ৫ লক্ষাধিক মুসলমান দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। এভাবে বিভিন্ন সময় হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও বিতাড়নের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তদুপরি আরাকানী মুসলিম লেখকদের পরিসংখ্যানটি উত্তর আরাকান বিশেষত বুথিডং ও মংডু এলাকার পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেইসাথে দুই ও তিন নম্বরের পরিসংখ্যানর সাথে বিতাড়িত ও নিহত মুসলমানদের সংখ্যা যোগ করলে আরাকানী মুসলিম লেখকদের পরিসংখ্যানের সাথে মিলে যায়। কেননা ১৯১১ সালের আদমশুমারী মোতাবেক আকিয়াবের মুসলমান ছিল ৩৩%। অনুরূপভাবে ১৯৩১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী আরাকানের লোকসংখ্যা হচ্ছে ১২,৯৯,৪১২ জন। এর মধ্যে বৌদ্ধ ৮,৭৮,২৪৪ জন, মুসলমান ৩,৮৮,২৫৪ জন, হিন্দু ৩,২৮১ জন, খ্রিস্টান ২,৭৫৩ জন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছিল ২৫,৮৮০ জন। সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যায়, বর্তমানে আরাকানের জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। এর মধ্যকার ৪০% লোক মুসলমান।[৯]

আরাকান নামটি অনেক পুরাতন হলেও বর্তমানে সরকারি নথিপত্রে এ নামটি বিলুপ্ত প্রায়। মিয়ানমারের সামরিক শাসক নে উইন ১৯৭৪ সালে আরাকানের নাম পরিবর্তন করে 'রাখাইন স্টেট' নামকরণপূর্বক এটিকে একটি অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দিয়েছে।[১০] সে অবধি সরকারিভাবে আরাকানকে 'রাখাইন স্টেট' নামে অভিহিত করা হয়। ঠিক কখন থেকে এ রাজ্যটি আরাকান নামে পরিচিত তাও সঠিকভাবে উদ্ধার করা সম্ভ হয়নি। তবে প্রাচীনকালে আরাকানীরা তাদের জন্মভূমিকে রখইঙ্গ (Rakhaing) নামে অভিহিত করত।[১১] এ রখইঙ্গ শব্দটি সংস্কৃত 'রক্ষ' (Raksha) এবং পালি 'যক্খো' (Yokkho) অর্থাৎ রক্ষ ও যক্ষ শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়। কেননা বৌদ্ধরা লঙ্কা বা সিংহল অর্থাৎ আধুনিক শ্রীলংকা জয় করার পূর্বে আরাকানের আদিম অধিবাসীদেরর ক্ষ বা যক্ষ নামেই অভিহিত করত। অনুরূপভাবে ভারতীয় আর্যরা আরাকানের দ্রাবিড় ও মঙ্গলীয়দের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পূর্বে এ নামে অভিহিত করতেন।

রাখাইং শব্দের অর্থ হলো 'দৈত্য বা রাক্ষস'।[১২] রাখাইংরা তাদের জন্মভূমিকে রাখাইংপে (Rakhaingpyi) বা রাখাইং ভূমি (Land of Rakhaing) বলত।[১৩] রাখাইন বলতে আরাকানের অধিবাসী আর পে (pyi) বলতে দেশ বোঝানো হতো। ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদদের বর্ণনায় আরাকানের বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। তবে রোহিঙ্গা মুসলমানদের মতে আরাকান নামটি অনেক পুরনো। এ নামের বিকৃতিতেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উচ্চারণ হয়েছে। আরাকান শব্দটি মূলত আরকান; যা আরবী আররেকন বা আররুকন শব্দের অপভ্রংশ।[১৪] রুকন শব্দের অর্থ হলো 'স্তম্ভ বা খুঁটি'। ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদকে রুকন বলা হয়। তাই তাদের ধারণা, ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে তৎকালীন মুসলমানরা আরাকানকে ইসলামের বুনিয়াদের দিকে খেয়াল রেখে 'আরকান' নামকরণ করেছেন।[১৫]

মিয়ানমারের আরাকান (বর্তমান রাখাইন) প্রদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। রোহিঙ্গারা আরাকানেরই ভূমিপুত্র এবং আরাকানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেই তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। ৮ম শতকের শেষ অথবা ৯ম শতকের প্রথমদিকে আরাকানের রামরী (Ramree) দ্বীপে জাহাজডুবি থেকে রক্ষা প্রাপ্ত আরব ও পারসীয় মুসলমান ব্যবসায়ী ও বণিকদের

আরাকানে আশ্রয় লাভ ও বসতি স্থাপনের[১৬] মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে। এ সম্পর্কে ব্রিটিশ বার্মা গেজেটিয়ারে R.B. Smart লিখেছেন-

> "The local histories relate in the ninth century several ships were wrecked on Ramree Island and the Mussalman crews sent to Arakan and placed in villages there. They differ but little from the Arakaness except in their religion and in the social customs which their religion directs; in the writing they use Burmese, but amongst themselves employs colloquially the language of their ancestors."[১৭]

এ সমস্ত আরবীয় মুসলমানগণ স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কেননা আরাকানী মেয়েদেরকে বাইরের যারাই বিয়ে করুক না কেন স্থানীয় লোকজন তাদের সন্তানদের নিয়ে যেতে দিতো না। শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রে নয় ডাচ ও পর্তুগীজ যারাই আরাকানে বিয়ে করেছে, কেউই তাদের স্ত্রী বা সন্তানদেরকে নিয়ে যেতে পারেনি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মো. আলী চৌধুরী বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলের ওপর ভিত্তি করে দৃঢ়তার সাথে বলেন যে,

> "It was a long established custom that foreign residents and even visitors to Burma and Arakan, either by shipwrec or for commercial reasons, were encouraged to form matrimonial alliances with the women of the country, but on strict understanding that when they left the country their wives and children might not be taken away with them"[১৮]

পরবর্তীকালে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মুসলমান সৈনিক, ব্যবসায়ী, ভাগ্যান্বেষী, ক্রীতদাস প্রভৃতি মুসলিম জনগোষ্ঠী ও বংশধররা আরাকানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন ও স্থানীয়দের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।[১৯] আরাকান রাজ্যে বসবাসকারী মুসলমানরা রোয়াইঙ্গা, যাম্বইকা, কামানচি, জেরবাদী ও দিন্নেত এই পাঁচটি জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত। রোয়াইঙ্গা জাতিগোষ্ঠিই রোহিঙ্গা নামে পরিচিত।[২০]

নিঃসন্দেহে রোঁয়াই, রোহিঙ্গা এবং রোসাঙ্গ শব্দগুলো পরিমার্জিত হয়ে বাঙালি কবিদের কাছে রোসাঙ্গ হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং স্থানীয় জনগণের কাছে রোয়াং হিসাবে পরিচিত হয়েছে। রোয়াং কিংবা রোসাঙ্গ শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞ নানামত পোষণ করে থাকেন। কারো মতে, রোহিঙ্গা শব্দটি আরবী 'রহম' শব্দ থেকে এসেছে; যার অর্থ দয়া করা। ড. সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ড. আহমদ শরীফ প্রমুখ মনে করে থাকেন- আরাকানের পূর্বতন রাজধানী ম্রোহং শব্দটি বিকৃত হয়ে রোয়াং > রোহাংগ > রোসাংগ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।[২১] ভাষা সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি এবং রোহিঙ্গারা আরব, সংস্কৃত, বাংলা ও উর্দু থেকে নিজেদের নিজস্ব একটি ভাষা গড়ে তুলেছে যা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগের সাধারণ উৎস হিসেবে কাজ করে, তাদের নিজস্ব গান এবং সঙ্গীত রয়েছে।[২২]

মধ্যযুগ থেকেই বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে সম্পর্ক শুরু হয় যখন বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) ভারতের অংশ ছিল। সেসময় বাংলা এবং আরাকান দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ছিল।[২৩] খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম আরাকানের অংশ হয়ে পড়ে। ১৫১৩-১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ত্রিপুরার

রাজা ধন্য মানিক্য (Dhanya Manikya) চট্টগ্রাম দখল করে।[২৪] কিন্তু হঠাৎ ধন্য মানিক্যের মৃত্যুর পর তার দখলকৃত অঞ্চল অরক্ষিত হয়ে পড়ে।[২৫] সে সময়ে আরাকান দাবি করে যে চট্টগ্রাম তার দখলে। পরে সুলতান আলাউদ্দিন শাহ চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করে বাংলার অংশ হিসেবে শাসন করেন। এরপর আবার ১৫৩১-১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানের রাজা হন মিন বিন এবং তিনি উত্তর দিকে অগ্রসর হন এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের পুর্বাঞ্চল দখল করেন। কিন্তু ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা গেলে বাংলার শূর সাম্রাজ্য চট্টগ্রাম পুনর্দখল করেন।[২৬] এরপর সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫), সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭) এবং সম্রাট শাজাহান (১৬২৭-১৬৫৮) এর শাসনামলে চট্টগ্রাম আরাকানের অধীন ছিল। এ সময়ে বাংলা-আরাকানের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান আরাকানীদের কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। চট্টগ্রামের পতনের সঙ্গে আরাকানীদের শক্তির পতন ঘটে। পরে তারা আর কখনও চট্টগ্রামের অধিকার পায়নি।[২৭]

এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর চার দশক হতে আরাকানে দেখা যায় বিদ্রোহ, হত্যা ও ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব।[২৮] ফলে আরাকানীদের জনজীবন হয়ে পড়ে বিপন্ন ও অনিশ্চিত। দীর্ঘকাল অশান্তি ও অনিশ্চয়তা আরাকানীদের মনে শান্তি ও স্থায়ীত্বের চেতনা জাগিয়ে তোলে। আরাকানের রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে স্থানীয় সভাসদবর্গই বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হারি নামে জনৈক সভাসদ্ আরাকানের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান ও তৎকালীন আরাকানের রাজনৈতিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজা থামাদাকে (Thamada) অপসারণকল্পে বার্মা (মিয়ানমার) ও আলাঙ্পায়া বংশের সাম্রাজ্যবাদী রাজা বোধপায়াকে (Bodawpaya) আমন্ত্রণ জানান।[২৯] কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আরাকানে ক্রমাগত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ইংরেজ বা ফরাসী শক্তিকে হস্তক্ষেপ করতে উৎসাহী করে তুলতে পারে এবং এই অবস্থা বার্মার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।[৩০]

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮৪ সালের শেষের দিকে বোধপায়া আরাকান অভিযানে অগ্রসর হন। যুদ্ধে বর্মীরাজ জয়ী হন এবং আরাকানকে বার্মার সাথে সংযুক্ত করেন। এই পর্যায়ে বোধপায়া আরাকানকে রামরী, স্যান্ডোওয়ে, মেয়োং ও আরাকান এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে স্ব-মনোনিত চারজন প্রতিনিধির হাতে আরাকানের শাসনভার অর্পণ করেন।[৩১] কিন্তু বার্মার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আরাকানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হয়নি। কেননা বর্মী সৈন্য আরাকান দখলের পর পরই আরাকানীদের ওপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করে। বর্মীবাহিনীর দমননীতির পরিপ্রেক্ষিতে হাজার হাজার আরাকানী উদ্বাস্তু সীমান্ত পার হয়ে চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়।[৩২]

বোধপায়ার বিভিন্ন দাবি, বলপূর্বক শ্রম ও বর্মী সেনার অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ আরাকানীগণ ১৭৯৬ সালে পুনরায় দেশব্যাপী বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহে চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণকারী আরাকানী সর্দারগণও অংশগ্রহণ করে। কিন্তু শেষ পর্যায়ে অপারগ হয়ে বিদ্রোহী আরাকানীরা নিজেদের ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং সীমান্ত অতিক্রম করে স্বপরিবারে চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়। এভাবে ১৭৮৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আরাকানের বর্মীসেনার নৃশংস অত্যাচার, আরাকানীদের প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে আরাকানীদের আশ্রয় নেবার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়।[৩৩] বর্মী সেনাদের অত্যাচারে বিপর্যস্ত ও নিগৃহীত অসংখ্য আরাকানী উদ্বাস্তু নিজেদের বাস্তু-ভিটা ত্যাগ

করে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে আশ্রয় নেয়। উদ্বাস্তুদের চট্টগ্রামে আশ্রয় নেবার পেছনে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান।[৩৪]

প্রথমত, ভৌগোলিক দিক হতে চট্টগ্রাম আরাকানের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী।
দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রামের সাথে ছিল আরাকানের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক।
তৃতীয়ত, চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে আরাকানীদের বিদ্রোহপূর্ণ বসতি উদ্বাস্তুদের চট্টগ্রাম আগমনে উৎসাহিত করে।
চতুর্থত, তুলনামূলকভাবে তৎকালীন পরিস্থিতিতে আরাকান অপেক্ষা চট্টগ্রামে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চয়তা উদ্বাস্তুদের প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা জোগায়।
পঞ্চমত, আরাকানে ব্যাপক অরাজকতার ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। অন্যদিকে কোম্পানির রাজ্যে জীবন ধারণের নিশ্চয়তা আরাকানীদের প্রলুব্ধ করে।[৩৫]

আরাকান দখলের পর বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) ও বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) সরকারের মধ্যে সম্পর্ক প্রথম ভালোই ছিল। ১৭৮৬ সালে চট্টগ্রামের কালেক্টর ক্রফটস এর আমলে বাংলা কোম্পানি সরকারের সাথে বর্মী সরকারের সরকারি পর্যায়ে সর্বপ্রথম যোগাযোগ হয়। ১৭৮৭ সাল হতে ১৭৯৪ সাল পর্যন্ত সীমান্তে দু-একটা ঘটনা ঘটলেও তা বার্মা ও বাংলা সম্পর্কে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। চট্টগ্রাম সীমান্তে উপর্যুপরি বর্মী বাহিনীর সমাবেশ এবং তাদের সীমান্ত অতিক্রম কোম্পানিকে একটা প্রতিহতযোগ্য সীমান্তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে। চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্যবর্তী নাফ নদী ছিল প্রচলিত সীমান্ত সীমারেখা। কিন্তু বর্মী সৈন্য সীমান্তের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞতার আশ্রয় নিয়ে প্রায়ই সীমানা লংঘন করত। এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রামুতে একটি সামরিক ঘাঁটি এবং রামু হতে উখিয়া ঘাট পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা কোম্পানির সামরিক বিভাগ উপলব্ধি করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সীমান্ত সম্পর্কে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।[৩৬]

বর্মিরাজের আরাকান অধিকারের প্রত্যক্ষ ফল ছিল চট্টগ্রামে ব্যাপকহারে আরাকানী সর্দারদের প্রত্যর্পণের জন্য সীমান্তে বর্মি সৈন্যের সমাবেশ। এ কারণে বার্মা ও বাংলার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিক্ততা ও অবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। কাজেই চট্টগ্রামে আরাকানীদের বসবাস নতুন নয়। মোঘল আমলে তাদের মাথাপিছু 'মগজমা' নামে একটি বার্ষিক কর আরোপ করা হয়েছিল। এই বার্ষিক করের পরিমাণ ছিল ১,৩৫৮ টাকা। ১৭৬০ সালে মীর কাসিমের নিকট হতে কোম্পানি চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করলে চট্টগ্রামে বিশেষভাবে চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে আরাকানীদের বন্দোবস্ত দেবার একটা সুনির্দিষ্ট নীতি লক্ষ্য করা যায়। এই নীতির দুটি উদ্দেশ্য ছিল–

প্রথমত, দক্ষিণ চট্টগ্রামের অনাবাদি জমি আবাদ করা।
দ্বিতীয়ত, আরাকানীদের বসতি স্থাপনের মাধ্যমে মগ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক গড়ে তোলা।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামে কোম্পানির প্রধান হ্যারি ভেরেলস্ট 'মগজমা' তুলে নিয়ে আরাকানীদের বসতি স্থাপনকে স্বাগত জানান। কাজেই দেখা যায় যে কোম্পানি আমল থেকেই আজ পর্যন্ত চট্টগ্রামে আরাকানী উদ্বাস্তুদের বসবাস।[৩৭]

আরাকানের রোহিঙ্গা রাজনৈতিক দল

মিয়ানমারের শাসকগোষ্ঠীর নেতিবাচকদৃষ্টির কারণে আরাকানের সাধারণ মুসলিমরা বরাবরই রাজনীতিতে পশ্চাৎপদ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীনতার উষালগ্নে সচেতন মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানগত দাবির যুক্তিতে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে গোপন সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলে। প্রথমে মোহাম্মদ জাফর হুসাইন কাওয়াল বা জাফর কাওয়াল নামে আকিয়াবের জনৈক যুবক মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি কাওয়ালী গাইতেন বলে তাঁকে কাওয়াল বলা হয়। তিনি নিজেই রোহিঙ্গা মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে গান রচনা করে সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে মুসলমানদের বাঁচার একমাত্র পথ হিসেবে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদানের জন্য মুসলিম যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতেন।[৩৮] ১৯৫০ সালে আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হলে মোহাম্মদ আব্বাস এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। মুসলমানদের মুজাহিদ আন্দোলন সফলতার সাথে এগিয়ে যেতে থাকলে আব্বাসের নেতৃত্বাধীন বাহিনী হতে দলত্যাগী কিছু স্বাধীনতাকামী মোহাম্মদ কাসিম (প্রকাশ কাসিম রাজা) এর নেতৃত্বে Rohingya Liberation Front (RLF) নামে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬৬ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।[৩৯] এক পর্যায়ে রোহিঙ্গা মুজাহিদরা পুনরায় Rohingya Patriotic Front (RPF) নামে নতুন করে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে; যা ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করে।[৪০] সামরিক বাহিনী ও মগদের বর্বরোচিত নির্যাতন নিষ্পেষণে মুসলমানদের জীবনের শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি শুরু হলে তাদের মধ্যকার কিছু বুদ্ধিজীবী বর্মী স্বৈরশাসনের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার নিমিত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ও সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে ১৯৭০ সালে Rohingya Independence Front (RIF) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অচিরেই উত্তর আরাকানের শহর-গ্রামাঞ্চলসহ মুসলিম অধ্যুষিত বার্মায় এর কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের মাধ্যমেই বাইরের দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ করে তাদের নতুন সংগ্রামের প্রতি সমর্থন আদায়সহ পূর্বের মুজাহিদ আন্দোলনের কিছু বিচ্ছিন্ন সদস্যকে একত্রিত করার প্রয়াস চালায়। অব্যাহত হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, লুটপাট ও নিজস্ব বাড়িঘর থেকে বহিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে RIF নেতা মোহাম্মদ সুলতান রোহিঙ্গাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানালে তাকেও বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়ে অবশেষে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে আসতে হয়।[৪১] ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে মুসলমানরা সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য Rohingya Patriotic Front (RPF) নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। আরাকানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে তাদের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৭৮ সালে নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে উক্ত সংগঠনটি Rohingya Liberation Front (RLF) নামে আরও একটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

তবে নির্যাতনের পরাকাষ্টায় চল্লিশের দশক থেকে মুজাহিদ আন্দোলন (Mujahid Movement), Rohingya Liberation Front (RLF), Rohingya Patriotic Front (RPF) সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গঠনমূলক ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ৮০'র দশকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে এলেও নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দুর্বলতা, বাস্তবতা বিবর্জিত চিন্তা, গণ যোগাযোগের অভাব প্রভৃতির কারণে লক্ষ্য হাসিলে তেমন ফলদায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ১৯৭৮ সালের ড্রাগন অপারেশনের কারণে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে উদ্ধাস্তু হবার পর আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে গভীর যোগাযোগ ও

সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগে অতীত দুর্বলতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, দুনিয়ার আধুনিক বাস্তবতাকে সামনে রেখে, বার্মার উগ্র স্বাদেশিকতাবাদী শোষণ, জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে মজলুম জনগোষ্ঠীর মুক্তির লক্ষ্যে জেহাদ করে স্বাধীন সার্বভৌম শান্তিময় ইনসাপভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৮২ সালে Rohingya Solidarity Organization (RSO) প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্র যুবকদের মধ্যেও শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি দাওয়াসহ ইসলামি চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলাদাভাবে ১৯৮৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর 'ইত্তেহাদুত তুলাবীল মুসলিমীন' নামক একটি ছাত্র সংঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪২] নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF) গঠিত হয়। রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গোষ্ঠী প্রতিনিয়ত সামরিক শাসকের ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে তাদের ন্যায্য দাবির উল্লেখ করে। অন্য বার্মিজ বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির তুলনায় রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন এবং আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামী ফ্রন্ট-এর কার্যক্রম এবং ক্ষমতা সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী দুর্গম এলাকায় এদের ক্যাম্প রয়েছে। ১৯৮৭ সালে নুরুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন এআরআইএফ-এর কয়েকজন সদস্য আরএসও-তে যোগ দিয়ে প্রধান দল থেকে সরে যায়।

কাজেই দেখা যায় যে, রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যদিও তারা স্থানীয় রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে সমর্থন না পাওয়ার পরও তাদের প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখার দাবি করে। ১৯৯৪ সালে মিয়ানমারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর গবেষণাকারী অন্যতম গবেষক বার্টিল লিন্টনার (Bertil Lintner)-এর ধারণা, বিদ্রোহীদের মধ্যে কেবল মাত্র ১৫০ জন সশস্ত্র পুরুষ রয়েছে। তবে ১৯৯১ সালে তিনি নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ করে বলেন যে, ৮০০ জন পুরুষের যৌথ শক্তি রয়েছে,[৪৩] উদাহরণসরূপ, যা পূর্বাঞ্চলের শান রাজ্যের ইউনাইটেড ওয়া স্টেট বাহিনী (United Wa State Army) বা ২০ হাজার সশস্ত্র ব্যক্তির শক্তির সমান। তারা সংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, তারা সৌদিআরব ভিত্তিক রাবীতাত আল-আলম আল-ইসলামি (Rabitat al-Alam al-Islami) এবং আফগান গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার (Gulbuddin Hekmatyar)-এর হিজব-ইসলামি (Hizbe-Islami) মতো আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনের সমর্থন লাভ করে।

বাংলাদেশে শরণার্থীদের আগমন স্পষ্টতই বিদ্রোহী দলগুলির জন্য দলে নতুন সদস্য প্রবেশ করানোর সম্ভাব্য সুযোগ এনে দেয়। ১৯৯২ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ/এশিয়া-এর বর্ণনা অনুযায়ী, শরণার্থী শিবিরগুলোতে আরএসও এবং এআরআইএফের অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হয়। এআরআইএফ সদস্যগণকে নিয়মিতভাবে কক্সবাজার অঞ্চলে দেখা যায়, যারা শরণার্থী নেতাদের এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ কমিটির সাথে যোগাযোগ বজায় রেখে[৪৪] তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

মুক্ত স্বাধীন আরাকান রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলেও আর্থিক সংকট, সৈন্য ও অস্ত্রের অভাব, আন্তর্জাতিক বিশ্বের সমর্থন ও সহযোগিতার অভাব, অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দলসহ বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে বর্মী জান্তার শক্তিশালী সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে অচিরেই ব্যর্ততার পরিচয় দেয়। তবে, ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে ARIF ও RSO সহ বিভিন্ন দল ঐক্যবদ্ধভাবে সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনার নিমিত্তে Arakan Rohingya National

Organization (ARNO) নামে এক মঞ্চে যোগ দিয়ে নুরুল ইসলাম ও ডাঃ মুহাম্মদ ইউনুছ এর নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালনার চেষ্টা করছে; এতে কতটুকু ঐক্যবদ্ধ থাকবে এটাই বিবেচ্য বিষয়।[৪৫]

চট্টগ্রামের আরাকানী রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিরাজমান জাতিগত সমস্যা যেমন-ফিলিস্তিন সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা, শ্রীলংকার তামিল সমস্যা, ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলের মোরো সমস্যা প্রভৃতির ন্যায় রোহিঙ্গা সমস্যাও একটি জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। আপাতদৃষ্টিতে রোহিঙ্গা সমস্যা একটি সাম্প্রতিক সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান হলেও বহু পূর্ব থেকেই এর সূত্রপাত। রোহিঙ্গা সমস্যার পশ্চাতে যেমন রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান, তেমনি ধর্মীয় কারণও রোহিঙ্গা সমস্যাকে উত্তরোত্তর জটিলতর করে তোলে।

১৭৮৪ সালে বর্মিরাজ বোদপায়া (Bodawpaya) কর্তৃক আরাকানের শেষ রাজা থামাদাকে (Thamada) পরাজিত করে আরাকান দখল ও জাতিধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আরাকানীদের উপর নৃশংস অত্যাচারের মধ্য দিয়ে যেমন রোহিঙ্গা সমস্যার সূত্রপাত, তেমনি রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের প্রথম পর্যায় সূচিত হয়।[৪৬] ১৭৮৫ থেকে ১৭৯৪ সালের মধ্যে বর্মিরাজের অত্যাচারে রোহিঙ্গা মুসলমান ও বৌদ্ধমগসহ প্রায় দুই -তৃতীয়াংশ আরাকানী জীবন বাঁচানোর তাগিদে স্বদেশ ভূমি পরিত্যাগ করে চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় বর্তমান কক্সবাজার ও বান্দরবন জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করে।[৪৭]

আরাকান দক্ষিণ মিয়ানমারের একটি উপকূলীয় অঞ্চল যা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সীমান্তে নাফ নদী হতে ইরাবতী ব-দ্বীপের ব্যাসেইন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরাকানীকে স্থানীয় ভাষায় রাখাইন বলা হতো এবং এর অধিবাসীদের বা আরাকানীদের 'রোহিঙ্গা' নামে ডাকা হতো। তবে দেশজ আরাকানীদের বলা হয় 'মগ'। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলা ও আরাকানের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বহুকাল পূর্ব হতেই বিরাজমান ছিল। চট্টগ্রাম ও তার আশেপাশের কিছু এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বাংলা, আরাকান ও ত্রিপুরার মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ চলত। ফলে ভূমি দখলের লড়াই এবং তৎসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে দুই দেশের সমাজে 'জনমৈতিক গতিশীলতার' প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পড়েছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আরাকান ও বাংলার মধ্যে পারস্পরিক জন-অভিবাসন সংঘঠিত হয়। এই পারস্পরিক জন অভিবাসন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রা লাভ করে এবং দুই দেশের সম্পর্ক প্রভাবিত করে।[৪৮] ১৭৮৫ সালে বর্মি রাজের আরাকান দখলের পর বার্মা থেকে বাংলায় যে জন-অভিবাসন শুরু হয় তা ব্রিটিশদের বার্মা দখল প্রক্রিয়া শুরু পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ কর্তৃক বার্মা দখল প্রক্রিয়া শুরুর সাথে সাথে জন-অভিবাসন প্রক্রিয়া বিপরীতগামী হয় অর্থ্যাৎ বাংলাদেশ থেকে বার্মায় জন-অভিবাসন শুরু হয়। এই পারস্পরিক জন-অভিবাসন দুই দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে এবং এ দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে।[৪৯]

ব্রিটিশ কর্তৃক আরাকান জয়ের পর বাংলার আরাকানী উদ্বাস্তুদের ভাগ্যের কিছুটা পটপরিবর্তন হয়। আরাকানের পতিত জমি আবাদ করার জন্যে 'আরাকান পতিত জমি অধ্যাদেশ আইন ১৮৩৯ এবং

১৮৪১ এবং পেগু পতিত জমি অধ্যাদেশ আইন, ১৮৬৫' ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জারি করা হয়। "Waste land grants were issued were by Government under the Arakan waste land grants rules of 1839 gcnd 1841 and the Pegu waste land grants rules of 1865 with the object of causng an influx of population and extension of cultivation in Arakan by new setters"।[৫০] এই অধ্যাদেশের আওতায় ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রাম থেকে বহু লোককে আরাকানে এনে পতিত জমি বিতরণ করে পুনর্বাসনের ব্যস্থা করেন। ব্রিটিশদের কঠোর খাজনানীতি কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও ১৭৮৫ সালের পর হতে আরাকান থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা ও মগরা পুনরায় সেখানে ফিরে গিয়ে দেশপ্রেমের টানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তারপরেও সকল রোহিঙ্গা মুসলমান ও আরাকানী মগরা সেখানে ফিরে যায়নি। কারণ এ সময় ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা একই শাসক শ্রেণীর হাতে ন্যাস্ত থাকায় বাংলা ও আরাকানের মধ্যে যাতায়াত-ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্যাগুলি দূরীভূত হয় এবং আরাকানীরা ব্রিটিশ ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কক্সবাজার জেলার হারবাং, মানিকপুর, রামু, কক্সবাজার সদর, খুরুস্কুল, চৌফলদণ্ডী, মহিষখালী, খারাংখালী, নীলা, চৌধুরীপাড়া ও টেকনাফ প্রভৃতি এলাকায় আরাকানী মগদের বসতি আজও বিদ্যমান। তাদের অনেকে বিভিন্ন মৌসুমে শ্রমিক হিসেবে কিংবা ব্যবসা করার জন্য আরাকান যেত অতঃপর নিজ বাড়িতে ফিরে আসত।[৫১] যে সব আরাকানী উদ্বাস্তু পুনরায় আরাকানে ফিরে যায়- তাদের গমন ছিল স্বেচ্ছায়, তবে ব্রিটিশ কিছু সুযোগ সুবিধা দেখিয়ে তাদেরকে আরাকানে যেতে উৎসাহিত করেছে মাত্র। এ ছাড়াও আরো কিছু কারণও বিদ্যমান ছিল-

প্রথমত, ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি করার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হবার কারণে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী আরাকানী জনসমষ্টির একটি বিরাট অংশ আরাকানে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে।

দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রাম অঞ্চলে তীব্র বেকার সমস্যা ও অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে আরাকানের ব্যবসায়িক সুবিধা ও মজুরীর উচ্চহারে তাদের নিজ ভূমে যেতে উৎসাহিত করে। ১৮৮৭ সালে বাংলার চট্টগ্রাম জেলার একজন মজুরের দৈনিক গড় মজুরী ছিল ৯ টাকা ১২ আনা। অথচ একই সময়ে আরাকানের আকিয়াবে একজন শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরী ছিল ১৫ টাকা।[৫২]

তৃতীয়ত, বাপদাদার বাস্তুভিটার প্রতি প্রত্যেক মানুষেরই আকর্ষণ থাকে। সে আকর্ষণেও অনেকে আরাকানে নিজ বাসভূমে ফিরে যায়। ব্রিটিশ সরকারের অবাধ শ্রমনীতির ফলে আরাকানী অভিবাসী ছাড়াও বাংলা ও ভারতের অনেক শ্রমিক ব্যবসায়ী ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আরাকানে পাড়ি জমায়। তবে এ সংখ্যা খুব বেশী হবে না।[৫৩]

তবে আরাকানী উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশের চট্টগ্রামে আশ্রয়দানকে কেন্দ্র করে বার্মা ও ব্রিটিশ শক্তির মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা সৃষ্টি হয় যার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে বার্মাকে ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তকরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জাপান বার্মা দখল করে নিলে আরাকান থেকে ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সেখানে প্রশাসনিক শূণ্যতার সৃষ্টি হলে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মগরা আরাকানে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের হত্যা ও বাংলাদেশের দিকে বিতাড়িত করে। এতে উত্তর আরাকানে বসবাসরত মুসলমানদের সঙ্গে বৌদ্ধদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘঠিত হয়। আরাকান ধর্মের ভিত্তিতে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঐ পরিস্থিতিতে আরাকানের মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ

কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করে এবং গোপনে বিভিন্ন তৎপরতা অব্যাহত রাখে। অন্যদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও মুসলমানদের সমর্থন লাভের নিমিত্তে তাদেরকে পৃথক বাসস্থানের ইঙ্গিত দেয়।[৫৪] অনেক রোহিঙ্গা সুরক্ষার জন্য ব্রিটেনের পক্ষে এবং মিত্রশক্তির জন্য জাপানীর বিরুদ্ধে গুপ্তচর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। জাপানীদের কাছে এই সংযোগ আবিষ্কৃত হলে তারা আরাকানে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার এক ভয়ঙ্কর কর্মসূচি চালু করে। এরফলে শত সহস্র আরাকানী রোহিঙ্গা আবার বাংলায় পালিয়ে আসে।[৫৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে দখলদার জাপানী সৈন্য বার্মা ত্যাগ করলে তথায় ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৬] ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পরবর্তীকালে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। বর্মি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বার্মার স্বাধীনতা সংক্রান্ত আলোচনার সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরাকানী রোহিঙ্গাদের কোনো সুযোগ দেয়নি। ১৯৪৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী অংসান ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করে যার মাধ্যমে স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে বার্মাকে স্বীকার করে নেয়া হয়। কিন্তু আরাকান থেকে কোনো রোহিঙ্গা প্রতিনিধিকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এ প্রসঙ্গে উত্তর আরাকানের নেতা মৌলভী জহির উদ্দিন এক বিবৃতি প্রসঙ্গে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বিবৃতিটি ছিল নিম্নরূপ-

> ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বার্মার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনার জন্য বার্মায় যেসব প্রতিনিধিকে লন্ডনে আমন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহারা বার্মার ষোল আনা প্রতিনিধি নহেন। কারণ উত্তর আরাকানের কোনো প্রতিনিধিকে এই আলোচনায় আহ্বান করা হয় নাই। অথচ উত্তর আরাকান ও সীমান্ত এলাকাগুলি সুনিশ্চিতরূপে অবর্মিদের দ্বারা অধ্যুষিত এবং ইহারা বার্মা হইতে পৃথক হইয়া বাংলার সহিত যুক্ত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত। এই হিসাবে লন্ডন আলোচনায় বড় জোর ইঙ্গ বার্মা সম্পর্ক সহজতর হইত। কিন্তু উহা বার্মা ও অ-বর্মি অধিবাসীদের পক্ষে শান্তিদায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। উত্তর আরাকান চুটা আনাউক বা অনিউক নদী নামে পরিচিত এবং এখানকার অধিবাসী আনাউকিয়াগণই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। উত্তর আরাকান চট্টগ্রামের সহিত মিলিত হইতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে এবং চট্টগ্রামও তাহার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। কারণ উভয় অঞ্চলই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং একই জাতের লোক যারা অধ্যুষিত। বর্মিরা ব্রিটেনের নিকট হইতে যতখানি উদারতা আশা করেন, আমি বিরাট বর্মি জাতিকে আনাউকিয়াদের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির প্রতি তদ্রুপ উদারতা দেখাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই উদারতা দেখাইলে শান্তি আসিবে। আমি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকেও অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যদি প্রকৃত শান্তি কামনাই করেন তাহা হইলে তাহারা যেন আমাদের ক্ষতি করিয়া অপরকে সম্পদশালী না করেন।

এভাবে আরাকানীয়া প্রজাতন্ত্রের চুক্তি স্বাক্ষর থেকে ছিটকে পড়ায় তাদের অধিকার ও স্বাধীনতার কোনো সাংবিধানিক নিরাপত্তা ছিল না। ফলে স্বাধীনতা উত্তরকালে বেশ কিছু আরাকানী রোহিঙ্গা অস্ত্র হাতে তুলে নিলেও বার্মা কর্তৃপক্ষের মিথ্যা রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং অন্যান্য নাগরিকদের মতো সমান সুযোগ সুবিধা প্রদানের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে অস্ত্র পরিত্যাগ করে। বর্মি কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি, বরং তাদের পার্শ্ববর্তী দেশে বিতাড়িত করে।[৫৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপানি সামরিক বাহিনী ও বর্মি জাতীয়তাবাদীদের মিলিত শক্তি সাময়িককালের জন্য ব্রিটিশ অধিকৃত বার্মা দখল কালে ১৯৪২ সালে আরাকানে প্রবেশ করে

আকিয়াবের বুথিডং, রাথিডং, মংডু, মিমবাসহ সমগ্র আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায় যা '১৯৪২-এর ম্যাসাকার বা গণহত্যা' নামে পরিচিত। এ সময় প্রায় ১ লক্ষ রোহিঙ্গা নিহত হয় এবং ৫ লক্ষ রোহিঙ্গা আরাকান ত্যাগ করে ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীন চট্টগ্রাম ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলসহ মালয়, সৌদি আরব, ইরান প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৫৮] ১৯৪২ সালের পর থেকে প্রায় ১.২ মিলিয়ন রোহিঙ্গা নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে রেহাই পেতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সৌদিআরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ অন্যান্য উপসাগরীয় দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।[৫৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানিরা বার্মা ও আরাকান দখল করলেও তাদের সেই আধিপত্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। অচিরেই ব্রিটিশরা আরাকানে তাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য 'Divide and Rule Policy' গ্রহণ করে আরাকানী রোহিঙ্গা নেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। এ সময় আরাকানী মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য বার্মা হতে ক্ষমতাচ্যুত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে আরাকানের মুসলমানদেরকে পৃথক সম্প্রদায়গত মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যা প্রকৃতপক্ষে রোহিঙ্গাদের জন্য একটি পৃথক বাসস্থানের ইঙ্গিত বহন করে।[৬০]

পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের আরাকান পুনর্দখলকালে তাদের সহায়তায় রোহিঙ্গারাও স্বার্থান্বেষী বৌদ্ধ মগ ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানে।[৬১] এভাবে আঘাত ও পাল্টা আঘাতের মধ্য দিয়ে মূলতঃ আরাকানী বৌদ্ধ-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা পরবর্তী দীর্ঘকালের জন্য বিনষ্ট হয় এবং রোহিঙ্গারা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। কেননা ব্রিটিশরা জাপানিদের বিরুদ্ধে সহায়তা লাভের জন্য রোহিঙ্গাদেরকে পৃথক সম্প্রদায়গত মর্যাদা প্রদান তথা প্রকারান্তরে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। শুধু ব্রিটিশরাই নয়, বার্মার স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক নামে পরিচিত অংসান ও অং সান পরবর্তী Anti-Fascist People's Freeedom League (AFPFL)-এর নেতৃবৃন্দও রোহিঙ্গাদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি কোনো রকম আনুকূল্য প্রদর্শন করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং অং সান ও AFPFL-এর নেতৃত্বাধীন বার্মার অন্তবর্তীকালীন সরকারের কর্মকাণ্ডের দিকে দৃষ্টি দিলে এর সত্যতা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।[৬২]

১৭৮৪ হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় আরাকান ও বার্মার জনগোষ্ঠীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে তাদের আবাসস্থল হয়ে ওঠে কক্সবাজার, বান্দরবন এবং দক্ষিণ বাংলার কয়েকটি অঞ্চল। ১৮৮৭ সালে চট্টগ্রাম 'বৌদ্ধ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় যা ১৯৩৫ সালে 'বঙ্গীয় অরাকান বৌদ্ধ সমিতি' নাম ধারণ করে এবং কক্সবাজারে এর প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালের ৯ই নভেম্বর বঙ্গীয় আরাকান বৌদ্ধ সমিতির সপ্তম সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে পূর্ব বাংলায় অবস্থানরত আরাকানী ও বর্মিদের আদি বাসস্থান বার্মায় সার্বিকভাবে অভিবাসনের জন্য বর্মি সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন উল্লেখযোগ্য ছিল। বার্মার নতুন অভিবাসন আইন পূর্ব বাংলায় বসবাসরত আরাকানী ও বর্মিদের আদি বাসস্থান তথা বার্মায় প্রত্যাবর্তনের পথে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করে।[৬৩]

এছাড়াও সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে উল্লেখ করা হয় যে, রামুতে বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন একটি ধর্মীয় মিছিলের ওপর মুসলমানরা আক্রমণ করে যা পুলিশের হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্ব বাংলার সরকার এ বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কেননা সরকারের গোপন নথিপত্রে বলা হয় যে,

এখানে অবস্থিত আরাকানী ও বর্মিদের ওপর কোনো অত্যাচার হলে বার্মায় অবস্থানরত সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর তার প্রভাব পড়তে পারে।[৬৪] তবে বর্মি হাই কমিশনার চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বর্মিদের বার্মায় প্রত্যাবর্তনের বিশেষ সুযোগের বিষয়টি নাকচ করায় পূর্ব বাংলায় অবস্থানরত বর্মিদের বার্মায় প্রত্যাগমন সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হয়ে পড়ে।[৬৫]

১৯৪৮ সালে স্বধীনতার পর পরই উ নু'র শাসনকালে আরাকান থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিতাড়ন ও তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি সৃষ্টির পদক্ষেপ হিসেবে আকিয়াবের মগ ডেপুটি কমিশনার ক্যাই ইউ (Kyaw U)-এর নেতৃত্বে ৯৯% মগদের নিয়ে ইমিগ্রেশন এ্যাক্টের অধীনে তদন্তের নামে Burma Territorial Force (BTF) গঠিত হয়। BTF উত্তর আরাকানের বুদ্ধিজীবি, গ্রাম্য প্রধান, উলামা এবং হাজার হাজার সাধারণ মানষকে হত্যা করে এবং মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।[৬৬] Mohammed Yunus এর ভাষায়-

> "The BTF under the direction of the Deputy Commissionar of Akyab district, Kyaw U, a Magh, unleashed a reign of terror in the whole north Arakan. Muslim men-women and children were moved down by machingun fire. Hundreds of intellectuals, village elders and Ulema were killed like dogs and rats. Almost all-Muslim villages were razed to the ground. The BTF massacre triggered refugee exodus into the then East Pakistan numbering more than 50,000 people."[৬৭]

মূলত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষই সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূচনা করেছিল। রোহিঙ্গারা ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ করে জাপানীদের তাড়িয়ে দিলেও তারা প্রচার করে- "Burma for the Buddhist Burmans and Burmese Muslims are Foreign Immigrants or Kalas"।[৬৮] আরাকান রোহিঙ্গাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের বিরুদ্ধে মগ সম্প্রদায় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এ প্রচারণাকে তুঙ্গে তুলতে থাকলে বর্মী সরকার পরিকল্পিতভাবে উচ্ছেদ অভিযানে নামে। অপরপক্ষে, স্বাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রোহিঙ্গা মুসলিমরা স্বতন্ত্র কোনো নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে না পারায় অপপ্রচার সত্যায়নের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে রোহিঙ্গারা আরাকানের বৈধ নাগরিক হয়েও বার্মার সংবিধানে নৃতাত্ত্বিক বা বুনিয়াদী জাতি হিসেবে তালিকাভুক্তির দাবিতে ব্যর্থ হয়।[৬৯] রোহিঙ্গা মুসলিম নেতৃবৃন্দ বর্মী সরকারের কাছে '৪২ এর গণহত্যার ওপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের স্বীয় বসতবাড়ীতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেবার আবেদন জানালে AFPFL সরকার এ সকল দাবি প্রত্যাখান করেন এবং সরকারি চাকরি হতে রোহিঙ্গাদের অপসারণ করে তদস্থলে মগদের নিয়োগ শুরু করেন। ফলে রোহিঙ্গারা ক্রমশ আন্দোলনমুখী ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।[৭০]

একদিকে শাসক শ্রেণী রোহিঙ্গা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে অপরদিকে একই সময়ে তাদের ওপর কঠোরভাবে সামরিক চাপ সৃষ্টি করে এবং Combined Emmigration and Army Operation, Union Military Police Operation প্রভৃতির নামে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন চালায়। ১৯৫৮ সালে প্রধানমন্ত্রী উ নু দেশের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল নে উইনের নেতৃত্বাধীন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশের শাসনভার অর্পণ করেন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে পুনরায় উ নু'র কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। জেনারেল

নে উইন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বে এসে আরাকানে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বেপরোয়া উচ্ছেদ অভিযান শুরু করলে প্রায় ২০ হাজার রোহিঙ্গা সীমান্ত অতিক্রম করে কক্সবাজার এলাকায় পালিয়ে আসে। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)-এর গভর্ণর জাকির হোসেনের নেতৃত্বে পাকিস্তান-বার্মা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং বর্মীপক্ষকে আকিয়াবের মগ গোষ্ঠীর একটি সাম্প্রদায়িক কারসাজি বলে অভিহিত করে সকল উদ্বাস্তুকে স্বদেশ ফিরিয়ে নেয়।[৭১]

বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উ নু বিদ্যমান সম্প্রদায়গত বৈষম্য সমাধানের লক্ষ্যে একটি ফেডারেল সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নে উইন বর্মী জাতিগত অভিযানের প্রশ্নে কোনো ছাড় দিতে রাজী ছিলেন না। তাই ১৯৬২ সালের ২রা মার্চ তিনি ফেডারেল সম্মেলন শেষ হবার পূর্ব মুহূর্তে একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধমে উ নুকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলপূর্বক বার্মাকে নিষিদ্ধ গণতন্ত্রের দেশে পরিণত করে রোহিঙ্গাসহ মিয়ানমারের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সকল প্রকার সাংবিধানিক অধিকার বাতিল করেন।[৭২] Mohammed Yunus এর ভাষায় -

> "In March 2, 1962 Gen. Ne Win, the then Burma's Army Chief, seized power in a bloodless military coup, abolished the constitution and dissolved the Parliament. All power of the states- ligeslative, judiciary and executive had fallen automatically under the control of the 'Revolutionary Council' (RC) headed by him."[৭৩]

জেনারেল নে-উইন ক্ষমতায় এসে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ৯৫% সামরিক অফিসার ও সামান্য সংখ্যক বর্মী সিভিলিয়ান নিয়ে Burma Socialist Programme Party (BSPP) গঠন করে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। রোহিঙ্গারা নবগঠিত BSPP-তে যোগ না দিলেও আরাকানের মগরা ব্যাপকভাবে যোগদান করে।[৭৪] জেনারেল নে-উইন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই রোহিঙ্গাদের নির্মূলের জন্য আরাকানী মগদের উস্কিয়ে দেয়। ১৯৬৪ সালে তাদের United Rohingya Organnization, The Rohingya Youth Organnization, Rangoon University Rohingya Students Association, Rohingya Jamiatul Ulama, Arakan National Muslim Organnization, Arakanese Muslim Youth Organnization এবং Rohingya Student Association প্রভৃতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করেন[৭৫] এবং ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে Burma Broadcasting Service (BBS) থেকে নিয়মিত রোহিঙ্গা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে দেন। অতঃপর ১৯৬৬ সালে সমস্ত বেসরকারি সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৭৬]

উ নু'র শাসনামলে বার্মার ক্যাবিনেটে রোহিঙ্গা মুসলমান সদস্য থাকলেও নে উইন ক্ষমতা গ্রহণের পর আর কোনো মুসলমানকে মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়নি; বরং তিনি আরাকানের প্রশাসনকে বৌদ্ধিকরণ করে অনেক রোহিঙ্গা পুলিশকে দুর্গম এলাকায় বদলি করেন এবং অনেককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। উচ্চপদস্থ রোহিঙ্গা কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ অথবা উত্তর আরাকান হতে অন্যত্র বদলি করা হয়। পক্ষান্তরে মগদের চাকরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। রোহিঙ্গা মুসলমানদের চাকরি রক্ষা কিংবা পদন্নোতির জন্য স্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল।[৭৭]

নে উইনের শাসনামলে বেশ কয়েকবার মুদ্রা অচল ঘোষণার ফলে মুসলমানদের জন্য এক শাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৪ সালের ১৭ই মে ৫০ ও ১০০ টাকার মুদ্রামূল্য রহিত করা হলে আরাকানী রোহিঙ্গারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আরাকানী মগরা নিজেদের মধ্যকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও স্থানীয় BSPP এর সদস্য থাকার সুবাদে জমাকৃত অর্থের মূল্যমান নতুন টাকা ফেরত পেলেও রোহিঙ্গারা তাদের ডিপোজিটকৃত টাকা ফেরত পায়নি। পক্ষান্তরে, সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও রেশন বিতরণের সার্বিক তদারকী মগদের হাতে থাকায় রোহিঙ্গাদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে। উপরন্তু, ১৯৬৭ সালে বার্মায় বিশেষত রাজধানী রেঙ্গুনে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে আরাকান থেকে চাল আমদানি করে রেঙ্গুনে পাঠানো হয়। সরকারিভাবে রোহিঙ্গাদের মজুতকৃত খাদ্য-শস্য জোরপূর্বক আদায় করে এবং সামরিক আধাসামরিক বাহিনীর লুটপাটের মাধ্যমে তাদের গোলা শূন্য করে নেয়া হয়। একদিকে অস্থায়ী সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, খাদ্য-শস্য লুট, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ এবং মুদ্রা অচল ঘোষণায় অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে যাত্রা; অন্যদিকে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নিয়ে সরকারিভাবে নির্যাতন চালায়। এমতাস্থায় রোহিঙ্গা মুসলমানদের মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। Mohammed Yunus এর ভাষায় -

> "After the nationalisation of the shops, demonelisation and imposition of restriction on movement, the backbone of economy of the Rohingyas crumbled.... The military quelled the riots with iron hand killing many persons. During 1967 crisis many Muslims died of starvation".[৭৮]

বার্মার সামরিক প্রশাসন আরাকানী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ক্রমশ মারমুখী হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে সামরিক অফিসারগণ শিউ কাই (Shwe Kyi) ও কাইগান (Kyi Gan) অপারেশনের নামে বিনা কারণে বিনা নোটিশে রাতের শেষ প্রহরে ইচ্ছামত রোহিঙ্গা মুসলিম এলাকায় হানা দিয়ে মারাত্মক অস্ত্রের মুখে রোহিঙ্গা মহিলাদের ইজ্জত লুটে নেয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে উৎপীড়নের জন্য মগদেরকে সরাসরি নির্দেশ দেয়। ফলে মগরা রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে যেকোনো সময় আক্রমণ চালিয়ে মারপিট করতে, তাদের অস্থাবর সম্পত্তি লুট ও রোহিঙ্গা মহিলাদের ইজ্জতহানি করতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। রোহিঙ্গারা বিচারের জন্য পুলিশ ষ্টেশনে গেলে পাল্টা তাদেরকেই নির্যাতন সহ্য করতে হয়। অবশেষে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অসংখ্য রোহিঙ্গা বাংলাদেশে চলে আসে।[৭৯]

১৯৭৩ এবং '৭৪ সালে বর্মী বাহিনীর অত্যাচারে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা মুসলমান বাংলাদেশে চলে আসে। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করে আগত শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত নেয়ার জন্য মিয়ানমার সরকারকে চরমপত্র প্রদান করলে তারা বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের পুনরায় তাদের বসতবাড়িতে পুনর্বাসনে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ সরকারের চরমপত্র পাবার মাত্র তিন বছর পরই ১৯৭৮ সালে ইয়াঙ্গুনের সামরিক জান্তা পুনরায় রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ অপারেশন চালায়; যার নামকরণ করে কিং ড্রাগন (King Dragon) বা নাগা মিন (Naga Min) অপারেশন। এ অপারেশনে ১০ হাজারের অধিক রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়; প্রায় আড়াই লক্ষ

রোহিঙ্গা শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আসে এবং পথিমধ্যে-ক্যাম্পে প্রায় ৪০ হাজার নারী, শিশু ও বৃদ্ধ মৃত্যবরণ করে।[৮০]

প্রাথমিকভাবে, বাংলাদেশ সরকার ত্রাণসামগ্রী প্রদান করে কিন্তু মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে ক্রমবর্ধমান হওয়ায় তা হ্রাস পায়, রেডক্রসের অন্তর্নিহিত কমিটি এবং দাতা সম্প্রদায় তাদের সমর্থন করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য খাদ্য ও আশ্রয় প্রদান অব্যাহত রাখতে অসমর্থ হওয়ায় এই শরণার্থীদের বেশিরভাগই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। শরণার্থী সংকট বাংলাদেশে তীব্র অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। এই সংকট নিরসনে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ এবং দাতা সম্প্রদায় থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তার অনুরোধ জানায়।[৮১]

১৯৭৮ সালের মে মাসে United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) বা জাতিসংঘের উদ্বাস্তু হাই কমিশনার শরণার্থীদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণসামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করে। ইউএনএইচসিআর এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সহায়তায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য ১৩টি ত্রাণ ক্যাম্পও স্থাপন করে। ১৯৭৯ সালে বার্মা ও বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী 'অপারেশন গোল্ডেন ঈগল' নামের এক কর্মসূচীতে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া আড়াই লাখ রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেয় বার্মা।[৮২]

১৯৮৮ সালে সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পরও রোহিঙ্গাদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি। তবে আশ্চর্যজনক যে, ১৯৯০ সালের মে মাসের নির্বাচনে রোহিঙ্গাদের ভোটের অধিকার না থাকলেও, দুই পক্ষের নির্বাচকমন্ডলীর ৮০ শতাংশ ভোটের প্রতিনিধিত্ব করে। জুলাই, ১৯৯০ সালে নির্বাচনের পর দ্যা স্টেট ল এণ্ড অর্ডার রেস্টোরেশন কাউন্সিল বা স্লর্ক ঘোষণা দেয় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ গঠন করতে পারবে না কিন্তু সংবিধান পরিষদ একটি নতুন সংবিধান রচনা করবে যার অধীনে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[৮৩] ১৯৯০ সালের শেষের দিকে সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যর্থতায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করে এবং এর প্রতিবাদে রেঙ্গুনের কেন্দ্রীয় ইনসেন কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীরাও অনশন শুরু করে।[৮৪] এ সময় সরকার আন্দোলন দমনে রোহিঙ্গাদের ঢাল হিসেবে বেছে নেয়।

ফলে ১৯৯১ সালের শুরুতে, উত্তর আরাকান প্রদেশে সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। মে, ১৯৯১ সালে বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই প্রায় ১০ হাজার শরণার্থী বাংলাদেশে চলে আসে। বাংলাদেশে বর্ষাকালের শেষের দিকে অর্থাৎ ১৯৯১ সালের নভেম্বরে বন্যা হয় এবং '৯২ সালের মার্চে বাংলাদেশের কক্সবাজারের টেকনাফ সড়কের পাশে এবং ক্যাম্পে ২ লাখ ৭০ হাজার-এর বেশি শরণার্থী ছিল। শরণার্থীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণে সামরিক বাহিনীর দ্বারা হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ এবং অন্যান্য নির্যাতনের চিত্র ফুটে ওঠে, যা তারা ব্যক্তিগতভাবে সহ্য করেছিল।[৮৫] বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জোরপূর্বক শ্রমদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়- রোহিঙ্গাদের কুলি, সেনাবাহিনীর জন্য নতুন ব্যারাক নির্মাণ, নতুন সড়ক ও সেতু নির্মাণ, মাছ ধরা ও পুকুর খনন এবং সামরিক বাহিনীর জন্য বাঁশ কাটা প্রভৃতি কাজ করতে বাধ্য করা হয়।[৮৬]

১৬ই জানুয়ারী '৯২ এক হাজার রোহিঙ্গা পরিবার মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ৩রা ফেব্রুয়ারী '৯২ টেকনাফ সীমান্তে ১০ হাজার রোহিঙ্গা দল নতুন করে প্রবেশ করে। ৪ঠা মার্চ '৯২ রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাই কমিশনার এক বিবৃতিতে উল্লেখ করে, রোহিঙ্গা সমস্যা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বড় উদ্বাস্তু সমস্যা এবং নির্যাতনের শিকার হয়ে ৯০ হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। ১লা এপ্রিল '৯২ মানবিক বিষয় সংক্রান্ত জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল এলিয়াসন রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যার একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন।[৮৭]

স্লর্ক প্রথমে আরাকান রাজ্যে কোন সমস্যা রয়েছে তা অস্বীকার করে এবং দাবি করে যে, অবৈধ বাংলাদেশি মিয়ানমারে মৌসুমী কাজের খোঁজে এসেছিল তারা এখন কাজ শেষে হয়ে যাওয়ায় বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারী '৯২ তারা এই সমস্যার ক্ষেত্রটিকে ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করে বলেন যে, মাত্র ৪ হাজার মানুষ মিয়ানমার ছেড়ে চলে গেছেন, একই সময়ে যখন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ এবং এই অঞ্চলে সহায়তাকারীরা প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা আগমনের হিসাব করছিলেন।[৮৮] অবশেষে ২রা এপ্রিল '৯২ মিয়ানমার সরকার প্রথম তাদের নাগরিকদের বাংলাদেশের আশ্রয় নেওয়ার ঘটনা স্বীকার করে। ২৬শে এপ্রিল '৯২ বাংলাদেশের কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে মিয়ানমার শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনে সম্মত হয়।[৮৯]

১৯৯২ সালের ২৮শে এপ্রিল শরণার্থী প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৯০] বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লেফটেন্যান্ট কর্ণেল (অবসরপ্রাপ্ত) মোস্তাফিজুর রহমান ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অন জ-এর মধ্যে এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী, ১৯৯২ সালের ১৫ই মে থেকে ৬ মাসের মধ্যে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের কথা হয়।[৯১] কিন্তু ফিরে যাবার বিষয়ে রোহিঙ্গাদের ভাষ্য ছিল মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যার প্রশ্নে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় রোহিঙ্গারা স্বদেশে ফিরতে ইচ্ছুক নয়। সে সময় তাদের শর্ত ও দাবিগুলো ছিল-

১. মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
২. রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকাকে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ ঘোষণা করতে হবে।
৩. প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে করতে হবে।
৪. রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।
৫. স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর জীবন, সম্পত্তি ও মর্যাদার নিশ্চয়তা বিধান ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
৬. নির্বাচনে বিজয়ী অংসান সুচীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
৭. রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় অনাবাসী বসতি উচ্ছেদ করতে হবে।
৮. সরকারি চাকুরীতে রোহিঙ্গাদের কোটা নির্ধারণ করতে হবে।[৯২]

রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ-মিয়ানমার আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করে বিশ্বে নতুন ঘটনার জন্ম দেয়।[৯৩] বাংলাদেশ হতে মুসলিম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থার প্রস্তুতি হিসেবে

মিয়ানমারের সামরিক সরকার ৭৭ জন ইমিগ্রেশন অফিসারকে পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় প্রেরণ করে। সেখানে বাংলাদেশ হতে ২ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি শরণার্থীর প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হিসাবে ৫টি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।[৯৪] প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারকে (ইউএনএইচসিআর) সংযুক্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশের সম্মতি থাকলেও মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষ্য ছিল যে তারা এ বিষয়ে সরকারের ম্যান্ডেট পান নাই।[৯৫]

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন সেপ্টেম্বর '৯২ প্রথমবারের মতো শুরু হয়; সেসময় ইউএনএইচসিআর মিয়ানমারে উপস্থিত ছিল না এবং ফিরে আসা রোহিঙ্গাদের সহযোগিতা করার জন্য মিয়ানমার সরকারের সাথে কোনও চুক্তি ছিল না। মিয়ানমারে ফিরে আসা ৫০ হাজার শরণার্থীর অধিকাংশই অনিচ্ছুক ছিল।[৯৬] এটা বিতর্কের বিষয় নয়, তবে বলা হয় যে, প্রত্যাবাসনের প্রথম পর্যায়টি ছিল জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক। ২৮শে এপ্রিল '৯২ মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়; যার অধীনে মে মাসে প্রত্যাবাসন শুর হয়। স্মারকলিপিটিতে ষ্টেট ল এ্যাণ্ড অর্ডার রেষ্টোরেশন কাউন্সিল বা স্লর্ক সম্মত হয় যে, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন হবে নিরাপদ এবং স্বেচ্ছামূলক। যাইহোক জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক দফতর (ডিএইচএ), তৎকালীন প্রধান জন এলিয়াসন (Jan Eliasson) দুই দেশের সরকারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এমওইউ গঠনে সহায়তা করতে। স্লর্ক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোনও গ্যারান্টি নেই যে, তারা ইউএনএইচসিআর-কে আরাকান রাজ্যে কাজ করার অনুমতি দেবে। এটির একমাত্র রেফারেন্স ছিল যে, সরকার ইউএনএইচসিআর-এর একটি উপযুক্ত সময়ে কাজ করার অনুমতি দিবে। সে সময়ে মিয়ানমারে এবং আরাকান রাজ্যের কোনও ক্ষেত্রেই জাতিসংঘ সংস্থা বা এনজিও খুব বেশি জড়িত ছিল না।[৯৭]

সুতরাং, ইউএনএইচসিআর কখনোই সহজে মিয়ানমারে কার্যক্রম চালাতে পারেনি। উপরন্তু, মিয়ানমারের সরকারি কর্মকর্তারা, ইউএনএইচসিআর-এর উপস্থিতি স্বীকার করলে অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হতো। একমাত্র ডিসেম্বর '৯২ সালে যখন মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রবেশ সীমিত করা হয় তখন একটি মিশনে জাতিসংঘের বিশেষ রিপোর্টারের প্রবেশাধিকারের অনুমতি ছিল এবং ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার সময়ে তাকে সরকারি অনুবাদকদের ওপর নির্ভর করতে হতো। শেষ পর্যন্ত, আন্তর্জাতিক চাপ বিশেষকরে চীন ও মালয়েশিয়া ইউএনএইচসিআর-কে প্রবেশের অনুমতি দিতে ষ্টেট ল এ্যাণ্ড অর্ডার রেষ্টোরেশন কাউন্সিল (স্লর্ক)-কে প্ররোচিত করেছিল।[৯৮]

তবে মার্চ '৯২ থেকে ইউএনএইচসিআর শরণার্থী শিবিরে সহায়তা প্রদান করে আসলেও প্রত্যাবাসন কর্মসূচির জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে কোনো চুক্তি ছিল না। এই চুক্তি ইউএনএইচসিআর-এর ম্যান্ডেট পূর্ণ করতে এবং উদ্বাস্তুদের নিরাপত্তা এবং মর্যাদার সঙ্গে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে অপরিহার্য ছিল। সেপ্টেম্বর '৯২ পর্যন্ত দ্বিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে প্রত্যাবাসন শুরু হয়নি। কিন্তু প্রত্যাবাসন শুরু হলে শরণার্থীরা নির্যাতনের ভয়, রেশন কার্ড জব্দ এবং অন্যান্য নিপীড়নের হুমকি নিয়ে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন করতে বাধ্য হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় অনেক ক্যাম্পে বিক্ষোভ ও দাঙ্গা দেখা দেয়; এতে মোট ১৫ জন শরণার্থী মারা যায়, ৪০ জন আহত ও ১১৯ জন কারারুদ্ধ হয়। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত ইউএনএইচসিআর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিল। এর মধ্যে

প্রায় ৫ হাজার শরণার্থী জোরপূর্বক ফিরে আসলে এ সময় প্রত্যাবাসন কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। মে '৯৩ বাংলাদেশ এবং ইউএনএইচসিআর মধ্যে প্রত্যাবসন সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৫ই নভেম্বর '৯৩ সালে অবশেষে মিয়ানমার এবং ইউএনএইচসিআর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তারপর ৫০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অধীনে পুনর্বাসিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর চার মাস আগে স্থগিত হওয়া শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন বাস্তবায়ন করবে ইউএনএইচসিআর-এর কর্মীরা যা এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং শরণার্থীদের আশ্বস্ত করে আরাকানের পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় উন্নত। এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, ইউএনএইচসিআর জরিপ রিপোর্টে দেখা যায় যে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে মাত্র ২৭ শতাংশ ফেরত যেতে চায়। প্রত্যাবর্তনের ধীর গতির কারণে বাংলাদেশ সরকারকে যথেষ্ট চাপের মুখে পড়তে হয়।[৯৯] সেপ্টেম্বর' ৯৪ প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুকে ফেরত পাঠানো হয়।[১০০] নভেম্বরে আরাকানে আবার দাঙ্গা দেখা দেয় যা ইউএনএইচসিআর-এর তথ্যে তা উল্লেখ করা হয়নি।[১০১]

আরাকানের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল থাকার পরও প্রায় ২ লক্ষ রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফিরে যায় কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, ইউএনএইচসিআর প্রোগ্রাম রোহিঙ্গাদের আরাকান রাজ্যে বিপদের কথা জানাতে বা তাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। যাহোক বৈপরীত্য স্বত্ত্বেও, রেঙ্গুন ও জেনেভায় ইউএনএইচসিআর প্রত্যাবাসন সম্পূর্ণ করার জন্য জুন '৯৬ সময়সীমার সিদ্ধান্ত নেয়। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে বাংলাদেশের নির্বাচনকালীন সময়ে হরতাল ও অস্থিতিশীলতার কারণে কক্সবাজারে ইউএনএইচসিআর কর্মীরা এ সিদ্ধান্ত নেয়।[১০২] ফলে ২ হাজার শরণার্থী ১৯৯৬ সালের প্রথমার্ধে এবং বাকিরা জুন পর্যন্ত পুনর্বাসিত হয়। প্রত্যাবর্তন খুব ধীর গতিতে চলতে থাকে। উপরন্তু স্লর্ক প্রত্যাবাসনে উৎসাহী না থাকায় সিদ্ধান্ত নেয় যে ২ লক্ষ এর অধিক লোককে তারা গ্রহণ করবে না।[১০৩]

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে বাংলাদেশে নতুন করে রোহিঙ্গাদের আগমন শুরু হলে, মংডু শহরে রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স (আরএনএ) কার্যকলাপের নতুন গুজব ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর মংডুতে মিয়ানমার সরকার নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করে এবং আগের মতো সেনাবাহিনীর জন্য জোরপূর্বক কুলির কাজ করতে বাধ্য করে। তবে ১৯৯১ সালের তুলনায়, এই পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য শুধুমাত্র আরাকান রাজ্য থেকে পাওয়া যায় এবং সরকার বা ইউএনএইচসিআর কর্তৃক প্রকাশ করা হয়নি। যদিও ইউএনএইচসিআর গোপন বক্তব্য, ১৯৯৬ সালের মার্চ এবং মে মাসের মাঝামাঝিতে এই অঞ্চলে যুদ্ধ চলছিল, যদিও এই ঘটনাটি প্রকাশ্য বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।[১০৪] যাইহোক, মংডু ও বুথিডং-এ সামরিক বাহিনীর বৃদ্ধির জন্য এই কারণগুলির মধ্যে কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এর জন্য স্লর্ক আরেকটি কারণ উল্লেখ করে- রোহিঙ্গা বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহী ইসলামী চরমপন্থীরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উস্কে দিয়েছিল দেশ ছেড়ে চলে যেতে এবং তারপর বিদ্রোহীরা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে মিথ্যা বলেছিল যাতে তাদের সমর্থন করার জন্য অন্য ইসলামী দেশকে উৎসাহিত করতে পারে।[১০৫]

মিয়ানমারের সামরিক সরকার শুধু দফায় দফায় আলোচনা করেছে এবং প্রকৃত অবস্থাকে অন্তরালে রেখে চিত্র দেখিয়েছে। এরমধ্যে ১৯৯৭ সাল থেকে নতুন করে রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া শুরু করে। কারণ হিসেবে তাদের ওপর রাখাইন বৌদ্ধ ও মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অত্যাচারের কথা বলা হয়।[১০৬] এ নিয়ে রোহিঙ্গা মুসলিমদের শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশে আসার ঘটনা

তৃতীয়বারের মত শুরু হয় যা বাংলাদেশের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি করে। কারণ শরণার্থীরা খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে জাতিসংঘ এবং দাতা সংস্থাগুলোর ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া রোহিঙ্গারা অবৈধভাবে সুরক্ষা সুবিধা বা মানবিক সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশে বসবাস করছে। ১৯৯৫ সাল থেকে এই ক্যাম্পগুলোতে আগত নতুন আনুমানিক ১-২ লক্ষ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ক্যাম্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্যাম্পের বাইরে বসবাস করে।[১০৭]

১৯৯৭ সালে প্রত্যাবাসনের বিপক্ষের গ্রুপসমূহ এবং বাংলাদেশ পুলিশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের পর দীর্ঘ ১৬ মাস শরণার্থী প্রত্যাবাসন বন্ধ থাকে। অতঃপর ১৯৯৮ সালের ২৫শে নভেম্বর থেকে পুনরায় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। মিয়ানমার সরকার প্রতি মাসে ৫০ জনের তালিকা পাঠায় এবং জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন ও বাংলাদেশ সরকার সে তালিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সে অনুযায়ী শরণার্থী প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। প্রথমদিকে ২৮টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও বাংলাদেশে আশ্রিত বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য, পানীয়, গৃহনির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য কাজ শুরু করে।[১০৮] শরণার্থীদের ভরণ পোষণে বাংলাদেশের ব্যয়ভার ছাড়াও বিদেশী সাহায্যদাতারা সহায়তা করেছে। শুরু থেকে বাংলাদেশ ব্যাপক সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীর সমস্যা সমাধানে আন্তরিক ও ধৈর্য্যের সাথে কাজ করেছে। বিশেষকরে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিআকর্ষণ, শরণার্থীদের ভরণ-পোষণ, জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনকে সংশ্লিষ্ট করা, মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদির মাধ্যমে সফলভাবে গোটা পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বাংলাদেশ।[১০৯]

২০০৯ সালে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সীমান্ত পথ দিয়ে শত শত রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। ২০০৯ সালের দিকে সাগরে ভাসমান রোহিঙ্গার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কেননা বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে উদ্বাস্তু নেওয়া দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় রোহিঙ্গারা মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে স্থলপথে থাইল্যান্ডে যাওয়ার পথ খুঁজছে। থাই সেনাবাহিনী শত শত উদ্বাস্তুদের ইঞ্জিন ছাড়া নৌকায় কোনো খাবার বা জল ছাড়া সমুদ্রে ফেরত পাঠায়,[১১০] যা অত্যন্ত নির্মম ও লোমহর্ষক। সুস্পষ্ট কারণেই বাংলাদেশের সরকার উদ্বিগ্ন যে, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্রমবর্ধমান প্রবাহ এদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা সংগ্রামে পরিণত হয়েছে, যা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় প্রভাব বিস্তার করে।[১১১] তাই বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র ও ক্ষুদ্রায়তন দেশের পক্ষে এই শরণার্থী সমস্যার মোকাবিলা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

আরাকানে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন-নীপিড়ন

স্বাধীনতাত্তোর বার্মার ভবিষ্যৎ জাতীয় বিষয় আলোচনার্থে বার্মার জাতীয়তাবাদী নেতা অং সান কর্তৃক আহুত প্যানলং সম্মেলনে শান, কাচিন, চিন, কারেন, কায়া, মন ও আরাকান রাজ্যের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী এ সকল রাজ্যের প্রতিনিধিদের সাথে অং সান একটি ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন যা 'প্যানলং চুক্তি (Pangling Treaty)' নামে পরিচিত।[১১২] প্যানলং চুক্তিতে বলা হয়, স্বাধীনতার পরে বার্মায় একটি যুক্তরাষ্টীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে

সকল জাতিসত্তা সমান অধিকার ভোগ করবে। এছাড়া চুক্তিতে আরো উল্লেখ ছিল যে, স্বাধীনতা লাভের দশ বছর অতিবাহিত হলেই ইচ্ছা করলে যে কোনো জাতি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে।[১১৩] কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আরাকানের সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী হিসাবে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্বের দাবীকে পাশ কাটিয়ে শুধুমাত্র বৌদ্ধ মগদেরকেই আরাকান জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে অং সান তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সমর্থক উ অং জান ওয়াই[১১৪] (U Aung Zan Wai) নামক জনৈক বৌদ্ধ মগ নেতাকে প্যানলং সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ দেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হয়েও রোহিঙ্গারা আরাকানের ও নিজেদের জাতিগত প্রতিনিধিত্বের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। শান, কাচিন ও চিন রাজ্যের ২৩ জন[১১৫] প্রতিনিধিকে প্যানলং সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে অংসান রোহিঙ্গাদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক নীতির পরিচয় দেন।

১৯৫০-এর দশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহের কথা বিবেচনা করে উ নু'র (U Nu) গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক তাদেরকে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। তবে ১৯৬২ সালে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর পরবর্তী সরকারগুলো তা অস্বীকার করে।[১১৬] বর্তমান সামরিক সরকার রোহিঙ্গাদের একটি জাতিগোষ্ঠী হিসেবে অস্বীকার করে এবং দাবি করে যে এরা উত্তর আরাকানের বাঙ্গালি মুসলমান যারা সম্প্রতি এখানে এসেছে।[১১৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে রোহিঙ্গা মুসলমান ও বৌদ্ধ মগ তথা রাখাইনদের মধ্যকার সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের যে চরম অবনতি ঘটে তা স্বাধীনতাত্তোর বার্মায় রোহিঙ্গা সমস্যাকে আরো প্রকট করে তোলে। বার্মার সংবিধানে স্বদেশী বা বুনিয়াদী জাতি হিসেবে ছোট বড় প্রায় ১৪০টি জাতির নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও আরাকানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বা জাতি হওয়া সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের নাম সংবিধানে উল্লেখ না করা,[১১৮] ১৯৫৮ সালে বার্মায় প্রধানমন্ত্রী উনু কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম[১১৯] হিসেবে ঘোষণা করা, ১৯৬২ সালের বার্মায় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র আন্দোলনকে প্রশমিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিশেষকরে আরাকানে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে পরিচালিত সামরিক অভিযানে রোহিঙ্গাদের হত্যাসহ উচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনা রোহিঙ্গা সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে।[১২০]

তাছাড়া ১৯৭৪ সালে বার্মা সরকার Burma Socialist Programme Party (BSPP)-এর নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য First Peoples Congress (Pyethu Hlutn Taw) আহ্বান করে আরাকানকে শুধুমাত্র 'বৌদ্ধশাসিত রাষ্ট্র' ঘোষণা করলে স্বৈরশাসকের ছত্রছায়ায় মগরা আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে এবং আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে অনবরত মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলিম নিধন শুরু করে।[১২১] আরাকানের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাসমূহ ছাড়াও সমগ্র আরাকানে স্থানীয় মগগোষ্ঠী কর্তৃক মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা পরিচালিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি দাঙ্গা পরিচালিত হয় আকিয়াব, বুথিডং, মংডু এবং স্যান্ডুওয়েতে; কারণ এখানকার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই মুসলমান। মূলত মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা হতে তাদেরকে তাড়িয়ে নতুনভাবে মগ প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু করার জন্যই সরকারি সহযোগিতায় এ সকল দাঙ্গা পরিচালনা করা হয়।

শুধু অপারেশন বা দাঙ্গা বাঁধানোই নয়, এছাড়াও বর্মী কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যাদির ওপর ব্যাপকভাবে উচ্চহারে করারোপ করে এবং আরোপিত কর পরিশোধ করতে না পারলে তাদের

বাড়িঘর ঘেরাও করে মজুদকৃত খাদ্য-শষ্যাদি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে বর্মী সরকার ওয়াক্ফকৃত জমি ও সম্পত্তি বেআইনীভাবে ভিত্তিহীন অজুহাতে ছিনিয়ে নেয়। আরাকানে জনসংখ্যাগত অবস্থান পরিবর্তন এবং রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য তাদের বাজেয়াপ্তকৃত ভূমিতে নতুন নতুন মগ বসতি স্থাপন করে। রোহিঙ্গাদের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। সরকারি অনুমতি ব্যতিত তারা এক থানা থেকে অন্য থানায় যেতে পারে না। অপরদিকে বিনা মজুরীতে জবরদস্তিমূলক শ্রমের মাধ্যমে প্রতিদিন শত শত মুসলমান নারী, পুরুষ ও যুবকদেরকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি ও নিরাপত্তা বাহিনীর কাজে দিনের পর দিন খাটানো হয়। শ্রমের মূল্য দাবি করলে কিংবা শ্রমদানে অস্বীকৃতি জানালে অমানবিক নির্যাতন অথবা মৃত্যুকেই সহজে মেনে নিতে হয়। মুসলমানদের ওপর সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার জন্য নিয়মিত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা অনেকটা বাধ্যতামূলক।

শুধু রোহিঙ্গা মুসলমানদের জীবন ও সম্পত্তিই নয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহও বর্মী সরকারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বুথিডং শহরের বাজার মসজিদ, রাহাম্ব্রী ও গাওয়ার প্রধান মসজিদ, আমবরী, আকিয়াব, কাইউক, নিমাই মসজিদ এবং বুথিডং শহরের টংবাজার দারুল উলুম মাদ্রাসাসহ বিপুল সংখ্যক মসজিদ মাদ্রাসা বিধ্বস্ত ও উচ্ছেদ সাধন করা হয়; সেই সাথে ১৯৭৬ সালে কাইউক, পাইউ শহরের মাদ্রাসাকে ভস্মিভূত করা হয়। আকিয়াবের পাইকতলী ও আকিয়াব জামে মসজিদের ওয়াক্ফ ভূমিসহ অনেক ওয়াক্ফকৃত জমি, মংডু টাউনের কবরস্থান, মংডুর গ্যাকুরা গ্রামের কবরস্থান ও কাইউক পাইক শহরের কবরস্থানসহ অনেক কবরস্থানকে শুকুরের চারণভূমি এবং গণপায়খানা বানানো হয়। পবিত্র কুরআন মজিদ ও ধর্মীয় বই পুস্তকগুলোকে প্রায়ই নষ্ট করে ফেলা হয় এবং প্যাকিং সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[১২২] কোরবানীর ক্ষেত্রে নানা রকম বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে দুই থেকে পাঁচ হাজার অধ্যুষিত গ্রামে দু'টি খাসি অথবা ১টি দু'টি গরু কোরবানীর অনুমতি দেয়া হয়।[১২৩] ১৯৬২ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কোনো রোহিঙ্গা মুসলমানকেই হজ্জ গমনের অনুমতি দেয়া হয়নি। স্কুল-কলেজে ধর্মীয় শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই।[১২৪] Rohingya Petriotic Front প্রদত্ত তথ্যানুসারে ১৯৫৫-৭৮ সাল পর্যন্ত তেইশ বছরের মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মুসলমান বর্মীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।[১২৫]

১৯৪৮-৭৮ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর বর্মী শাসকশ্রেণী এই দেশটির (আরাকান রাজ্যের) উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেনি। শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরাকান এখনো মধ্যযুগীয় অবস্থায় রয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রায় ৪০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত আরাকানের মাত্র ১৭টি হাইস্কুল ও ১টি মাত্র ইন্টারমিডিয়েট কলেজ রয়েছে। আরাকানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও মধ্যযুগীয় অবস্থায় বিদ্যমান। মাত্র ৪৫ মাইল পাকা রাস্তা (সড়কটি রাথিডং থেকে বুথিডং পর্যন্ত প্রসারিত) রয়েছে। আরাকানে আজও কোনো রেলপথ তৈরি হয়নি। ব্রহ্মদেশের (বার্মা) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস হল ধান। আরাকান তা সিংহভাগ সরবরাহ করা সত্ত্বেও সেখানে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয়নি। আরাকানে আজও কোনো ছোট-খাট কলকারখানাও গড়ে ওঠেনি। প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের জন্য আরাকানে ২৬০ শয্যাবিশিষ্ট মাত্র ৩টি

হাসপাতাল রয়েছে। উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্মীশাসন আরাকানীদের নিকট বরাবরই মনে হয়েছে বিদেশী শাসন। হত্যা, গৃহযুদ্ধ, লুন্টন, নারী নির্যাতন ও অরাজকতা আরাকানীদের নিত্য সহচর।[১২৬]

উপরন্তু "আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকদের পর্যবেক্ষণ করে বিদেশীদের চিহ্নিত করে এবং অবৈধ বিদেশে নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের" নামে সরকার ১৯৭৭ সালে নাগামিন নামে একটি অপারেশন শুরু করে।[১২৭] ১৯৭৮ সালে রোহিঙ্গাদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কিংড্রাগন (King Dragon) বা নাগা মিন (Naga Min) অপারেশনে হাজার হাজার রোহিঙ্গা নর-নারী নিহত ও পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়, দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৭৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১৭ই মার্চ-এর মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষাধিক শরণার্থী বৃহত্তর চট্টগ্রামের কক্সবাজার ও বান্দরবনের ১৩টি শরণার্থী ক্যাম্পসহ ও ক্যাম্প বহির্ভূত এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে।[১২৮] উপরন্তু ১৯৮২ সালে বৈষম্যমূলক বার্মা নাগরিকত্ব আইনের আওতায় লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়।[১২৯]

১৯৯১-৯২ সালে সমগ্র আরাকানে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে 'অপারেশন মিননং' ও 'অপারেশন পিথায়া' নামক ভয়াবহ উচ্ছেদ মূলক অভিযানে হাজার হাজার রোহিঙ্গা নর-নারীকে হত্যা, প্রায় ৩ লক্ষ শরণার্থী বাংলাদেশে ২০ শরণার্থী ক্যাম্প ও ক্যাম্প বহির্ভূত এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ[১৩০] এবং সর্বোপরি ১৯৯২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অং গিয়াউ (U ohn Gytaw) কর্তৃক এক প্রেস রিলিজে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের কোনো অস্তিত্ব নেই বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ[১৩১] প্রকৃত অর্থে রোহিঙ্গা সমস্যায় ঘৃতাহুতি ও রোহিঙ্গা সমস্যাকে দীর্ঘস্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে এক নতুন রূপ দান করে।

অপারেশন মিননং চলাকালে বর্মী বাহিনী মুসলিম জনপদে যেসব বিশেষ নিপীড়নমূলক পন্থা অবলম্বন করে তার কিছুটা এখানে তুলে ধরা হলো-

- মুসলিম অধ্যুষিত আরাকানে পল্লী ও শহর অঞ্চলে দেশের অন্যস্থান থেকে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনা নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে একটা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। রোহিঙ্গাদের ধানচাল গবাদি পশু ও অন্যান্য সম্পদ লুট করা, ব্যাংক একাউন্ট ফ্রিজ করে রাখা এবং তাদের যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাদের বাড়িঘরে মগদের বরাদ্দ দেয়া হয়।
- রোহিঙ্গা ছাত্র, যুবক, কিশোরদের গ্রেফতার করে অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে মানসিক এবং শারীরিকভাবে পঙ্গু করে দেয়া হয়। ১৯৯১ সালে মিয়ানমার সীমান্তে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ৩০ হাজার রোহিঙ্গা যুবককে গ্রেফতার করে মাথা ন্যাড়া করে সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন করা হয়। এদের দ্বারা সৈন্যদের রসদ পরিবহন, বাঙ্কার খনন, ভারী অস্ত্র পরিবহনের কাজেও নেয়া হয়।
- বর্মীবাহিনী তাদের উচ্ছেদ তৎপরতা সহজ করার জন্য প্রলোভন দেখিয়ে এক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক রোহিঙ্গাদের দ্বারা 'রাহবেটা' নামক এক মুনাফিক বাহিনী গঠন করে। এরা বর্মী সৈন্যদের পথ দেখায়, যুবক যুবতীদের ধরিয়ে দেয়, রোহিঙ্গাদের সম্পদ লুট করে ও তাদের জোরপূর্বক ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়।
- মাদ্রাসা ও মসজিদগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে সেনাদের ব্যারাক, ক্লাব, অফিস ও মগ বৌদ্ধদের বাসস্থানে পরিণত করা হয়।

- সর্বত্র মুসলমানদের আযান দেয়া জামাতে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করা হয়। সংবাদপত্র পাঠ, রেডিও শোনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।
- সৈন্যরা যখন যেখানে খুশি কারফিউ জারি করে। মুসলিম বিদ্রোহীদের খোঁজার নাম করে ঘর তল্লাশির নামে মেয়েদের ওপর পাশবিক নির্যাতন এবং নাগরিক কার্ড কেড়ে নেয়া রুটিন কাজে পরিণত করে।
- আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা মংডু, বুথিডং, আকিয়াব, কাইউকনাড়া, টংগুপ, গাওয়া, চেছবা প্রভৃতি টাউনশীপে উগ্র মগদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর জন্য সেনাবাহিনী উস্কানি যুগিয়ে যায়। মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য আরাকানে সকল মগ যুবক যুবতীদের সামরিক ট্রেনিং দেয়া হয়। ১৯৯১ সালের মিয়ানমার-বাংলাদেশে যুদ্ধ পরিস্থিতির সময় একমাত্র মংডু টাউনশীপেই চার হাজার মগ নারী-পুরুষকে সামরিক ট্রেনিং দেয়া হয়।
- মিয়ানমার সৈন্য, লুটেরা বাহিনী এবং মুনাফিক চক্রের মিলিত তৎপরতায় প্রায় এক লক্ষাধিক নির্যাতিতা, ধর্ষিতা স্বজনহারা, শোক কাতর রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশে আসে। ১৯৯২ সালের শেষ নাগাদ এ সংখ্যা ৩ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামের চাপে সামরিক সরকার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হলেও মুসলিম নির্যাতন, নিপীড়ন থেকে তারা পিছু হটেনি বরং তাদের স্বপ্নের আরাকান গড়ে তুলতে নিত্য নতুন নির্যাতনের কৌশল উদ্ভাবন ও তা প্রয়োগ করছে।[১৩২]

রোহিঙ্গাদের চিরতরে দমন করার জন্য মিয়ানমার সরকারের গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপের বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো-

- নে উইনের শাসনামল থেকেই রোহিঙ্গারা কোনো রাজনৈতিক দল গঠন বা স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে পারত না।
- প্রতিরক্ষা ও সিভিল সার্ভিসে রোহিঙ্গাদের অনুপযুক্ত ঘোষণা করা হয়।
- রোহিঙ্গাদের বেআইনী প্রবাসী ঘোষণা করা হয় এবং আরাকান ত্যাগ করার জন্য সরকারি নোটিশ জারি করা হয়। অথবা আরাকানে বাস করতে হলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে মগী বৌদ্ধ সংস্কৃতি গ্রহণ করতে চাপ প্রদান করা হয়।
- রোহিঙ্গাদের এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলে পারমিট গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়।
- ১৯৯২ সালে একটি বিশেষ অধ্যাদেশ জারি করা হয় যার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় মুছে ফেলে রাখাইনদের সাথে আত্মীকরণ করার অপচেষ্টা চলে।[১৩৩]

এছাড়া আবাসন মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট জেনারেল মিয়া থিন (Lt. Gen. Mya Thinn) বলেন যে, মিয়ানমারের বিদ্যমান নাগরিকত্বের আইন অনুযায়ী রাখাইনের মুসলমান জনগোষ্ঠী মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত নয়, এমনকি তারা তথাকথিত বিদেশী নাগরিক হিসাবেও নিবন্ধিত ছিল না। ফলস্বরূপ, মন্ত্রী আরও বলেন, তাদের পরিস্থিতিই তাদেরকে দেশে ভ্রমণ করতে অনুমতি দেয়নি .... রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা তাদেরকে সে অনুমতি দেয়নি এবং উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও অংশগ্রহণের জন্য তারা নিষিদ্ধ।[১৩৪]

১৯৮০ সালে শরণার্থীরা বার্মায় ফিরে আসার পর সরকার নতুন নাগরিকত্ব আইনের খসড়া প্রণয়ন করে, যা ১৯৮২ সালে প্রণীত হয়। ১৯৮২ সালের আইন প্রণয়নের সময় এবং বিষয়বস্তু উভয়ই

ইঙ্গিত দেয় যে, এটি রোহিঙ্গাদের ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয় এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে দেশটিতে প্রবেশ করে এমন অন্যান্য এশীয় অভিবাসীদের বিরুদ্ধেও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।[১৩৫] নাগরিকদের 'সিটিজেন', 'এসোসিয়েট সিটিজেন' এবং 'ন্যাচারালাইজড সিটিজেন' তিনটি শ্রেণী উল্লেখ করা হয়। পূর্ণ নাগরিকত্ব জন্য যেমন কাচিন (Kachin), কায়া (Kayah), কারেন (Karen), চিন (Chin), বর্মণ (Burman), মন (Mon), রাখাইন (Rakhine), শান (Shan), কামান ও জেরবাদী জাতিগোষ্ঠীসহ স্বীকৃত জাতিগত গোষ্ঠীগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করা হয় কিন্তু রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর নয়। নতুন আইনের অধীনে কিছু রোহিঙ্গা পূর্ণ নাগরিকত্ব পায়, অনেকে তাদের ব্যক্তিগত ইতিহাসের কারণে নয় বরং উপযুক্ত তথ্য প্রমাণাদির অভাবে 'এসোসিয়েট সিটিজেন' এবং 'ন্যাচারালাইজড সিটিজেন' কোনটাতেই অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এভাবে অধিকাংশ রোহিঙ্গারাই বিদেশী নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত হয়।[১৩৬]

১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনে অধিকাংশ রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়। মিয়ানমারের একজন ব্যক্তির পরিবার কত প্রজন্ম বসবাস করেছে তার ওপর ভিত্তি করে এই আইনটি তিন ধরনের নাগরিকত্ব প্রদান করে। ফলে রোহিঙ্গারা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, যেমন- চলাফেরার স্বাধীনতা।[১৩৭] রোহিঙ্গাদের চলাফেরার স্বাধীনতার বিষয়টি উপরে উল্লিখিত আবাসন মন্ত্রীর বিবৃতিতেই নাগরিক হিসেবে শ্রেণীবদ্ধকরণ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনের বিধানে এসোসিয়েট ও ন্যাচারালাইজড সিটিজেন হিসেবে আরাকান রাষ্ট্রের মুসলমানদের চলাফেরার কোনো স্বাধীনতা নেই। চলাফেরার স্বাধীনতা কেবলমাত্র আরাকানের বাইরে অর্থাৎ বাংলাদেশেই বিদ্যমান: আরাকান রাজ্যে অথবা আরাকান থেকে মিয়ানমারের অন্যান্য অঞ্চলে যাওয়া রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য কার্যত অসম্ভব। কারণ ১৯৯২ সাল থেকে সরকার আরাকান রাজ্য জুড়ে রাস্তা, নদী স্থাপনের নামে ক্রমবর্ধমান সামরিক ঘাঁটির বিস্তার করছে। ১৯৮৮ সাল থেকে মিয়ানমারের অন্যান্য সংখ্যালঘু অঞ্চলের তুলনায় আরাকানে সামরিক বাহিনী ঘাঁটি স্থাপন অধিকতর দ্বিগুণ হয়ে গেছে।[১৩৮] রোহিঙ্গা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এবং বিদ্রোহী শক্তির সমর্থন বন্ধ করার পন্থা হিসেবে উত্তর আরাকান রাজ্যে নাসাকা ইউনিটগুলির অবস্থান একক এবং অন্যতম।

ফলে রোহিঙ্গারা তাদের গ্রামের বাইরে ভ্রমণ করতে চাইলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা চেয়ারম্যান-এর কাছে আবেদন করতে হয়, যা পরবর্তী সময়ে নিকটতম নাসিকা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে তা পাস হয়। এখানে আইএমপিডি, পুলিশ, দাঙ্গা পুলিশ, সামরিক গোয়েন্দা এবং শুল্ক বিভাগ সবার তদারকি রয়েছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ১২ ঘণ্টার জন্য পাস হয় দেওয়া হয়; শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে মুসলমানদের রাত্রি থাকার অনুমতি দেয়। উদাহরণস্বরূপ, মংডু বা বুথিডং রাজ্য অথবা রাজধানী সিটুওয়েতে ভ্রমণ করার পর ফেরত আসতে হয়; ইউএনএইচসিআর-এর হিসাবে যা কার্যত অসম্ভব বলে উল্লেখ করা হয়। রেঙ্গুনে ভ্রমণের জন্য বিমান টিকিট ক্রয় করতে হয় যা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।[১৩৯] এই জটিলতার কারণে কিছু মুসলমানদের তাদের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করা থেকে বিরত থাকতে হয়। মিয়ানমারের প্রত্যেকেরই স্থানীয় কাউন্সিল অফিসে নিবন্ধন করতে হয় এবং রোহিঙ্গাদের নিজস্ব কোন শহরের বাইরে গ্রামে যেতে বা গ্রামে রাতে থাকার জন্য তাদের ফি দিতে হয়। শুষ্ক মৌসুমে আরাকান রাজ্যে ভূমিহীন রোহিঙ্গাদের জন্য কৃষি কাজ কম থাকায় কাজের সন্ধানে অন্যত্র ভ্রমণ করতে হয় যা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।[১৪০]

এছাড়া মিয়ানমারে জোরপূর্বক শ্রমদান বিষয়টি জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়।[১৪১] আইএলও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ধারাবাহিক রেজুল্যুশানে দেশব্যাপী অবকাঠামো ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে অব্যবহৃত বেসামরিক শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য মিয়ানমার সরকারের নিন্দা করেছে। দেশের অন্য অংশ অর্থাৎ আরাকানের রাজ্যে জোরপূর্বক শ্রমদানের পাশাপাশি প্রায়ই সামরিক বা নাসাকা বাহিনী যারা কাজের তত্ত্বাবধান করে তারা শারীরিক নির্যাতন করে থাকে। রাস্তাঘাটের কাজ ছাড়াও, রোহিঙ্গাদের বিনা মজুরীতে নাসাকা বাহিনীর জন্য শত শত নতুন ব্যারাক নির্মাণ করতে হয় এবং নির্মাণ কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত সেখানে কাজ করতে হয়।

জোরপূর্বক শ্রমের কারণে রোহিঙ্গারা ১৯৯১-৯২ সালে বার্মা ত্যাগ করে এবং স্লর্কের অধীনে এটা সারা দেশব্যাপী চলমান একটি প্রক্রিয়া। ইউএনএইচসিআর স্বীকার করে যে, জোরপূর্বক শ্রম ফেরত আসা রোহিঙ্গাদের এবং উত্তর আরাকানের অন্যান্য বাসিন্দাদের জন্য একটি সমস্যা বটে। জুন '৯৫ সালের বুলেটিনে ইউএনএইচসিআর বিবৃতি:

> বাধ্যতামূলক শ্রম মিয়ানমারের দেশব্যাপী প্রচলিত। ইউএনএইচসিআর বাধ্যতামূলক শ্রমের পুনর্বিবেচনার জন্য বারবার হস্তক্ষেপ করেছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ফেরত আসা রোহিঙ্গাদের জন্য এ চাপ কমাতে সফল হয়েছে। কর্তৃপক্ষ রাখাইন রাজ্যে বাধ্যতামূলক শ্রম সীমাবদ্ধ করতে সম্মত হয়েছে, প্রতি মাসে প্রতি পরিবার থেকে সর্বাধিক চার দিন কাজ করবে।[১৪২]

ইউএনএইচসিআর আশাবাদী যে, এ বিবৃতির পর রোহিঙ্গাদের দাবি কমিয়ে এবং যথেষ্ট নিরাপত্তা নিশ্চিত করে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াও অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। শরণার্থীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী অব্যাহতভাবে দেখা যায় যে, গ্রামীণ এলাকায় বাধ্যতামূলক শ্রম সর্বজনীন এবং তারা কখনোই মুজুরী পায় না।[১৪৩]

আরাকান রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট অনুসারে, অবশ্য শুষ্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর-জুলাই) বিশেষকরে, রোহিঙ্গাদের সময় গড়ে প্রতিমাসে এক সপ্তাহ এবং কখনো কখনো দশ দিন বা দুই সপ্তাহের বেশি হতে পারে। এই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষই দিনমজুর, মজুরী ছাড়া ১ দিন কাজ করার ফলে ঐদিন পুরো পরিবারকে না খেয়ে থাকতে হয়। ফলস্বরূপ, প্রায়ই ঐ পরিবার তাদের সন্তানদের সেনাবাহিনীতে কাজ করতে পাঠায়, বিনিময়ে পিতা মজুরীতে অন্য জায়গায় কাজের সন্ধান করতে পারে। দিন মজুরের কাজ ঋতুভিত্তিক হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, শুষ্ক মৌসুম নির্মাণ প্রকল্পগুলির জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত সময়, সেইসঙ্গে তখন কৃষি কাজ করার সময়ও হয়। কাজেই শুষ্ক মৌসুমে অতিরিক্ত জোরপূর্বক কাজ ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ১৯৯৬ সালের মার্চ, অতিরিক্ত শ্রমের জন্য শ্রমিকের যোগান দিতে উত্তর মংডুতে রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স (Rohingya National Alliance) এবং নাসাকা (NaSaKa)-এর মধ্যে বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই সমস্ত সৈন্য তাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য ১৯৯১-৯২ সালে বহিস্কৃত হওয়া স্থানীয় রোহিঙ্গাদের ওপর নির্ভর করে।

সেপ্টেম্বর '৯৫ স্লর্ক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ইউএনএইচসিআরকে দেখানো হয়, যাতে আঞ্চলিক প্রশাসকদের বিনা মজুরীতে জোরপূর্বক শ্রম প্রথা বন্ধ করার জন্য নতুন নির্দেশনা দেয়া হয়। পরে ফেব্রুয়ারি '৯৬ সালের রিপোর্টে এই নির্দেশটি ইউএন-এর স্পেশাল রিপোর্টারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এতে বিভাগীয় এবং প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয়কে শ্রমিকের মজুরী নিশ্চিত করে "তাদের প্রাপ্য অংশ" দিয়ে তাদের দুঃখদুর্দশা লাঘব করে সরকার এবং সৈন্যবাহিনীর প্রতি জনগণের ভুল ধারণা, ভুল বোঝাবুঝি এবং বিভ্রান্তি প্রতিরোধের আহ্বান জানানো হয়। এটা স্পষ্ট যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকার উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য তহবিল বরাদ্দ করলেও অর্থ না প্রদানের প্রধান কারণ হলো সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা এবং তাদের জুনিয়রদের দুর্নীতি।

মিয়ানমারের সব জমি সরকারের মালিকানাধীন। মিয়ানমারের অর্ধেকের বেশি কৃষি জমি রয়েছে যা ধান চাষের জন্য নির্ধারিত এবং তা ভাড়ায় ব্যবহারের অধিকার রয়েছে। তবে ঐ জমি অধিকারের ক্ষেত্রে অন্য কোথাও ভাড়া বা বিক্রি করা যাবে না। এসোসিয়েট বা ন্যাচারালাইজড বা বিদেশী নাগরিক হিসাবে রোহিঙ্গারা ভূমি ব্যবহার অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রথাগত আইন অধিকাংশ গ্রামেই প্রযোজ্য, রোহিঙ্গাদের ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং নতুন অধিকার অর্জনের জন্য কোন আইনি সুযোগ নেই। মার্চ '৯৬ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ/এশিয়া সাক্ষাৎকারে এক ব্যক্তি যিনি দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন তিনি বলেন যে, প্রত্যাবর্তনের পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাউন্সিল প্রধান, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং মুসলমান পরিবার যারা জমিটি গ্রহণ করেছে তাদেরকে টাকা দিয়ে জমি নিতে হয়। তবে মংডু ও বুথিডং-এর বেশ কিছু অংশে সেনাবাহিনী সড়ক নির্মাণ, মডেল ভিলেজ, সামরিক ব্যারাক, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, চিংড়ি খামার এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য জমি দখল করেছে। কিন্তু সেখানে মালিকের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ নেই। উপরন্তু, মিয়ানমারের সব জাতিগত গোষ্ঠী কর্তৃক রোহিঙ্গাদের সম্পত্তি ইচ্ছামত বাজেয়াপ্ত হয়।

জমি ব্যবহারের অধিকারের শর্ত হিসাবে ভাড়াটেদের সরকারকে কর দিতে হয়। কৃষককে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দামে সরকারের কাছে বিক্রি করে ফসলের শতকরা বা কোটা হিসাবে কর দিতে হয়। আরাকান রাজ্যে কি পরিমাণ জমি চাষ হয় তার ভিত্তিতে নয় বরং জমির ফলনের উপর নির্ভর করে শতকরা হিসাবে কর ধরা হয়। এতে রোহিঙ্গাদের ওপর বৈষম্যমূলক প্রভাব পড়ে। কেননা রোহিঙ্গাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুর্বর ভূমি ব্যবহার করতে দেয়, যেখানে ভাল জমির তুলনায় ফলন অনেক কম হয়। উপরন্তু, এই নিয়মে মুসলিম কৃষকরা সরকারের নির্ধারিত পরিমাণের বেশী কর দিয়েও প্রায়ই চাল সংগ্রহকারী সৈন্য দ্বারা নির্যাতিত হয়। এই চালের অর্থ দিয়ে সামরিক বাহিনীর খাদ্য সরবরাহ এবং বেসামরিক কর্মচারীদের বেতন ভর্তুকি দেয়া এবং সরকার বা যাদের সঙ্গে কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ চুক্তি রয়েছে সেই সংস্থাগুলিকে রপ্তানি করে। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় চালের পরিমাণ ৩.৩ শতাংশ বেড়েছে, একই সময়ে সরকার ও বাজারের মধ্যে দামের পার্থক্যও বেড়েছে।[১৪৪]

ফেব্রুয়ারী '৯৬ আরাকান রাজ্যে একর প্রতি প্রায় ১৬ কিলো ভূমি কর ছিল। ফেব্রুয়ারিতে, চালের জন্য ৩৫০ কিয়াট (মিয়ানমারের মুদ্রা) বাজার মূল্যের তুলনায় সরকারের মূল্য প্রতি কিলো ৭৫ কিয়াট ছিল। যেকোনো নির্দিষ্ট ঋতুতে ভূমি বা চালের ফলনের মূল্য পরিশোধ করতে হয়। কৃষকের জন্য গড় ১৬ কিলো যা তাদের স্বাভাবিক ফলনের প্রায় এক চতুর্থাংশ, যদিও স্পষ্টতই ফলন বিভিন্ন এলাকায়

ভিন্ন ভিন্ন হয়। ২৫শে নভেম্বর '৯৫ ফসল কাটার আগেই আরাকানের উত্তরাঞ্চলে একটি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। ফলে অনেক রোহিঙ্গা কৃষকের পুরো ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তবুও ফেব্রুয়ারিতে, ফসল কাটার সময়ে নাসাকা বাহিনী প্রতিটি গ্রামে গিয়ে সরকারের চালের দাবি জানায়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ/এশিয়ার একজন রোহিঙ্গার সাক্ষাৎকার নেয় যিনি কক্সবাজারে আসেন এবং এই কর পরিশোধে সহায়তা করার জন্য বিদেশে তার আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তিনি এসেছিলেন নাফ নদী দিয়ে একদিনের পাস নিয়ে, যার ফলে মিয়ানমারে ৫০ কিয়াট (৮.৪৫ মার্কিন ডলার) এবং বাংলাদেশে দশ টাকা (০.২৪ মার্কিন ডলার) তাঁর খরচ হয়।[১৪৫]

১৯৯২ সাল থেকে রোহিঙ্গাদের ভূমি করের পাশাপাশি নতুন করে ট্যাক্স ধরা হয়। এতে সব ধরনের ব্যবসায় কর দিতে হয়। উত্তরে আরাকানের প্রতিটি পরিবারকে মরিচের জন্য কর দিতে হয়, যা কিনা এমনিতেই উৎপাদিত হয়। ফলস্বরূপ, সরকারি দামে প্রতি কেজি ১০০ কিয়াট বিক্রি করে নাসাকার কাছে কিন্তু অনেক রোহিঙ্গারা বাজার থেকে তা প্রতি কেজি মরিচ ৫০০ কিয়াট দিয়ে কিনতে বাধ্য হয়। ফেব্রুয়ারি '৯৬ শরণার্থী যারা বাংলাদেশে এসেছিল তারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলে, তারা মাছ ধরতে নদীতে যাবার সময় ফি দিতে হয় এবং বনে বাঁশ কাটার জন্যও ফি দিতে হয়। এই ফি শুধুমাত্র রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেমন বৌদ্ধ রাখাইনদের মাছ ধরার জন্য ফি দিতে হয় না। বিভিন্ন প্রকারের দাবির জন্য বিভিন্ন প্রকারের কর ধরা হয়; যেমন- রাস্তা পরিষ্কার করা, স্লর্ক নেতাদের এলাকা পরিদর্শনের সময়, স্কুল ও ক্লিনিক নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান, এমনকি বৌদ্ধ প্যগোডা পুনঃস্থাপনের জন্যও কর ধরা হয়।

এছাড়াও নাসাকা বাহিনী অনেক রোহিঙ্গা ও অন্যান্য মুসলমানকে জোরপূর্বক আরাকান রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মংডু ও বুথিডং-এ স্থানান্তরিত করে এবং স্লর্ক বাহিনী এই দুটি শহরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থান নেয়। ফেব্রুয়াারি '৯৫ বার্মার স্পেশাল রিপোর্টারের মতে, ১৯৯৪ সালের জুলাই ম্রাউক-উ-এর পূর্ব দিকে মিমবা শহরের নাগা গ্রাম থেকে ৫শ' জন মুসলমান পরিবারকে নৌকায় করে মংডু ও বুথিডং-এ (১৯৯৬ সালের মার্চ ও মে মাসে ম্রাউক-উ-এর সব রাখাইন অধিবাসীদেরও দেশ পরিষ্কার এবং পর্যটনকে উৎসাহিত করার জন্য স্লর্কের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পুরাতন প্যাগোডা এলাকার বাইরে চলে যেতে বাধ্য করা হয়) নিয়ে যাওয়া হয়; নভেম্বর '৯৪ এবং ফেব্রুয়ারী '৯৫ এর মাঝামাঝি একই টাউনশিপের চারটি গ্রাম থেকে ১৫শ' মুসলিম গ্রামবাসীকেও বুথিডং-এ যেতে বাধ্য করা হয়; ১৯৯৪ সালের শেষের দিকে, মিমবা থেকে ১৫০টি পরিবার এবং ম্রাউক-উ থেকে ৩৫০টি পরিবারকে মংডুতে নিয়ে যাওয়া হয়;[১৪৬] এবং মার্চ '৯৫ সালে পিকথি গ্রামের ৩ হাজার মুসলমানকে স্থানান্তরের আদেশ দেওয়া হয়।

১৯৮৮ সাল থেকে মংডু এবং বুথিডং টাইনশিপে রাখাইনদের বসতি স্থপন করতে সরকার একটি প্রকল্প চালু করে যা মডেল ভিলেজ নামে পরিচিত। ১৯৯৫ সাল নাগাদ এরকম বারোটি গ্রাম হয়। ফেব্রুয়ারী '৯৬ সালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ/এশিয়ার দাবি, গ্রামগুলি রাখাইন গ্রামগুলির পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, যা ১৯৪০-এর দশকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার আগে বিদ্যমান ছিল। রোহিঙ্গাদের জমি অধিগ্রহণ করে তা রাখাইনদের প্রদান করে সরকার সহিংসতা আরো বাড়িয়ে দেয়। ইউএনএইচসিআর এই ইস্যু নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করে। কেননা রাখাইন পরিবারকে বিপুল পরিমাণ জমি প্রদানের বিষয় উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়ার ফলে সমগ্র প্রত্যাবাসন

প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মতে, ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে ইউএনএইচসিআর-এর হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের অনাবাদী জমি দখল করে তদের দিয়েই বিনা মজুরীতে স্রাউক-উ এলাকার রাখাইনদের জন্য নতুন মডেল ভিলেজ নির্মাণ করা হয়।[১৪৭]

১৯৯৭ সালে সমগ্র মিয়ানমারব্যাপী একটি মুসলিম বৌদ্ধ দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। এই দাঙ্গায় ২৩টি মসজিদ ধ্বংস এবং মিলিয়ন ডলার সম্পদ নষ্ট হয়। দাঙ্গাবাজরা আরাকানের পুরনো শহর মরুহাঙ্গের একটি অন্যতম ঐতিহাসিক মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে। প্রায় ৬শ' বছরের পুরনো সানদিখান নামে পরিচিত এ মসজিদটি মুসলিম শাসনামলের অন্যতম কীর্তি ছিল। নে-উইনের শাসনামল থেকে মিয়ানমারে প্রায় ২ হাজার মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। যার কোনোটিই পরবর্তীতে আর নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়নি। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা অতীতে উদ্বাস্তু সমস্যার কারণে বহির্বিশ্বে যথেষ্ট সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ায়, বর্তমানকালে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে আরাকানের মুসলমানরা যাতে আর উদ্বাস্তু হতে না পারে সেজন্য নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত সীল করে দেওয়া ছাড়াও উদ্বাস্তুদের সম্ভাব্য যাতায়াত পথে মাইন বসানোর ঘটনাও ঘটেছে।[১৪৮] এতে বহু লোক নিহত হয়।

২০০৬ সালে কিছু মুসলিম পুরুষ কর্তৃক বর্মী নারীকে ধর্ষণের গুজব থেকে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গায় কিছু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমর্থন থাকায় আরাকানে মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইয়াঙ্গুনের অন্যান্য শান্তিপ্রিয় বর্মি এর বিরোধিতা করে। ফলে মানবতার বিরুদ্ধে গণহত্যার অপরাধে রোহিঙ্গাদের বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা চালু করা হয়।[১৪৯]

রোহিঙ্গাদের সকল নাগরিক অধিকার বাতিল করে পরিণত করা হয় এক রাষ্ট্রহীন মুসলিম জনগোষ্ঠীতে। উচ্চশিক্ষা, সরকারি চাকুরী প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত করাই শুধু নয়, রোহিঙ্গা জনসংখ্যা যাতে বাড়তে না পারে সে জন্য আইন করে তাদের বিয়ের বয়স নির্ধারিত এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে প্রায় বাধ্যতামূলক করা হয়। এই আইন অনুযায়ী রোহিঙ্গা নারী পুরুষ ২৫ বৎসর বয়সের পূর্বে বিবাহ করতে পারবে না। কিন্তু ২৫ বৎসর হলেই ইচ্ছেমতো বিয়ে করার পথও বন্ধ। বিয়ের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক। এই অনুমতি নেয়ার পদ্ধতিও এতই জটিল যে রোহিঙ্গা নর-নারীর বিবাহ খুবই দুরূহ ও কষ্টকর। তাছাড়া বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ এবং বিনা কারণে গ্রেফতার ও পুলিশী নির্যাতন চলছেই। যদিও রোহিঙ্গা মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে শত শত বছর ধরে বসবাস করে আসছে, তবুও তারা মিয়ানমারের সরকার দ্বারা নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে বিদেশীদের মত বসবাস করছে। রাজনীতির শিকার হয়ে নিজ দেশে তাদের স্বাধীনতা নেই এবং ভূমি বা সম্পত্তি মালিকানাধীনের অধিকারও অস্বীকার করা হয়।[১৫০] কাজেই রোহিঙ্গা মুসলমানরা বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে শরণার্থী হয়ে চলে আসে।

আরাকান মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলে পরিণত

মিয়ানমারের আরাকান এলাকা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কয়েক দশক ধরে স্থানীয় শাসকদের সহায়তায় রোহিঙ্গাদের ওপর শুরু হয় অকথ্য জুলুম ও নির্যাতন। মুসলিম নির্যাতনের অধ্যায় মূলত ১৯৪২ সাল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে চরম আকার ধারণ করে। মিয়ানমার সরকার পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত প্রায় ১৩টি বড় রকমের অপারেশন চালিয়ে রোহিঙ্গাদের জীবনকে বিপন্ন করে তোলার মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘন করে।[১৫১] এ অবস্থায় সহায়-সম্পদ হারিয়ে নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলমানরা নিজ বাস্তুভিটা ত্যাগ করে প্রাণ রক্ষার্থে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

মিয়ানমারে ৭টি বিভাগ এবং ইথনিক রয়েছে। ৭টি স্টেটের কোনোটাই আরাকানের মত সংখ্যালঘু জন অধ্যুষিত অঞ্চল নয়। সমগ্র আরাকান ১৭টি টাউনশীপে (প্রশাসনিক) বিভক্ত। মোট জনসংখ্যা শতকরা ৭৫ ভাগই রোহিঙ্গা মুসলমান। আবার এই জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগই বাস করে মাত্র ১০টি টাউনশীপে। যেমন- আকিয়াবে প্রায় সোয়া লক্ষ, মংডুতে প্রায় ৫ লক্ষ, বুথিডং-এ সোয়া ৫ লক্ষ, রাথিডং-এ প্রায় আড়াই লক্ষ, চকডং-এ প্রায় ২ লক্ষ, পাথরকিল্লায় প্রায় ৩ লক্ষ, স্যান্ডোওয়েতে প্রায় দেড় লক্ষ, কেপ্রাতে প্রায় ১ লক্ষ, আন-এ সোয়া লক্ষ, মিসরে-তে দেড় লক্ষ। ১৯৪৮ সালের পূর্বে এই ১৭টি টাউনশীপের মধ্যে ১৫টিতেই মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮০ ভাগ। মিয়ানমার সীমান্ত শংঙ্কার কারণে দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় আরাকানকে একক মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় রূপ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এই লক্ষ্যে '৪৮ হতে '৮০ সাল পর্যন্ত মিয়ানমার সরকার আরাকানে ১৩টি বিভিন্নমুখী অপারেশন চালায়। এরফলে আরাকানের অধিকাংশ টাউনশীপে মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। এলাকা বা টাউনশীপগুলি হচ্ছে-স্যান্ডোওয়ে, কাইউক, পাইউ, গাওয়া, রাহাস্ত্রী, বেদুবা, আন, সিমবুয়া, পাথরকিল্লা, পুজাচুন, রেমত্রী, মেনাওঙ্গ ও কেপ্রু। অপরদিকে আকিয়াব, মংডু, বুথিডং, রাথিডং, চকতও প্রভৃতি প্রধান বসতিতে মুসলমানরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। সমগ্র আরাকান ভিত্তিতে মুসলিম জনসংখ্যার হার শতকরা ৮০ ভাগ।

১৯৪৮ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত পরিচালিত রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রধান প্রধান অপারেশনগুলি হলো- '৫৫ সালে উত্তর আরাকানের কমবাইন্ড ইমিগ্রেশন এন্ড আর্মি অপারেশন (Combined Immigration & Army Operation), '৫০ হতে '৫৯ সালে উত্তর আরাকানে ইউ এম পি অপারেশন (Union Miilitary Police Operation), '৫৯ সালে বাংলাদেশ সীমান্তে ক্যাপ্টেন টিন ক্যাইউ অপারেশন (Captain Htin Kyaw Operation), '৬৬ সালে সমগ্র আরাকানে শিউকাই অপারেশন (Shwe Kyi Operation), একই বৎসর পুনর্বার কাইগান অপারেশন (Kyi Gan Operation), '৬৭-'৬৮ সালে নাগাজিন কা অপারেশন (Nagazin Ka Operation), '৬৮ সালে উত্তর আরাকানের বি টি এফ অপারেশন (Burma Territorial Force Operation), '৬৯-'৭১ সালে মাইয়াট মন অপারেশন (Myat Mon Operation), '৭৩ সালে মেজর অং থান অপারেশন (Major Aung Than Operation), '৭৪-'৭৮ সালে সেব অপারেশন (Sabe Operation), '৭৮-'৭৯ সালে নাগামিন ড্রাগন অপারেশন (Nagamin Dragon Operation), '৭৯ সালে অপারেশন গেলন (Galon Operation), '৮০ সালে শিউ হিনথা অপারেশন (Shwe Hintha Operation)।[১৫২] উল্লেখিত অপারেশনসমূহ বাহ্যিকভাবে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার নামে পরিচালিত হলেও তা মূলত

মুসলিম উৎখাতেরই নীল নক্শা। উল্লেখিত অপারেশনের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল বি টি এফ, শিউ কাই, কাই গান, মেজর অং থান, সেব (Sabe) এবং ড্রাগন অপারেশন। এ অপারেশনসমূহ পরিচালনা করে সরকারি পরিকল্পনার ভিত্তিতে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে দেশে থেকে উচ্ছেদ করা হয়। নাগামিন অপারেশনের পর ১৯৭৯ ও ১৯৯২ সালে আরো কয়েকটি মারাত্মক অপারেশন পরিচালনা করে লাখ লাখ মুসলমানকে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের অনেকেই স্বদেশে ফেরত গেলেও হাজার হাজার মুসলমান বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবির কিংবা তার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়ে বাংলাদেশেই থেকে যায়।[১৫৩] এই সমস্ত অপারেশনের মূল টার্গেট আরাকান মুসলিম শূন্য করা। বিশেষত উত্তর অরাকানে এ সকল অপারেশনে মুসলিম বসতি বিরান হয়ে পড়ে। যার প্রভাব চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রকট রূপ লাভ করে।

আরাকানকে মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চল বা স্টেট হিসেবে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে মিয়ানমার প্রশাসন চার দশক ধরে নানা ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখে। এই দীর্ঘ সময়ে মিয়ানমার প্রশাসন কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে বেশ কিছুটা সাফল্য লাভও করেছে। প্রায় ৩০ বৎসর পর ২৭শে মে ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আরাকানের মোট ২৬টি সংসদ আসনের মধ্যে কেবল নিরঙ্কুশ মুসলিম অধ্যুষিত রাজধানী আকিয়াবসহ প্রধান ৩টি টাউনশীপের ৫টি আসনে মুসলিম প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়। অন্যান্য এলাকায় (যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৪০ হতে ৭০ ভাগ) মুসলিমদের যেমন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তেমনি প্রার্থী হতেও দেয়া হয়নি। উপরন্তু, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণেও বিশেষ কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়। মোট ১৭টি টাউনশীপের মধ্যে আকিয়াব, মংডু, বুথিডং, রাথিডং, মিমবা, মরুখং, কেপ্রা, চকতও, স্যান্ডোওয়ে এলাকায় ২টি করে আসন রাখা হয়। অন্যান্য টাউনশীপে ১টি করে। অমুসলিম জনবসতি অনুপাতে এই আসন বরাদ্দ ও এলাকা নির্ধারণ করা হয়। যেমন- আকিয়াবের ২টি আসনের মধ্যে ১টি আসন সংখ্যালঘু বার্মান অধ্যুষিত এবং পার্শ্ববর্তী আসন তুলনামূলক স্বল্প জনসংখ্যা ও এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। যাতে বর্তমান প্রার্থী বিজয় লাভ করতে পারে। আকিয়াবের অপর আসনটি বৃহত্তর এলাকা বিমিষ্ট এবং জনসংখ্যা বার্মান অধ্যুষিত এলাকার দ্বিগুণ হলেও আসন রাখা হয়েছে মাত্র ১টি। মজার ব্যাপার যে, বুথিডং ও মংডু টাউনশীপে ভোটার সংখ্যা যথাক্রমে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ও ২ লক্ষ ৬৪ হাজার, উভয় এলাকার জনসংখ্যা ৫ লক্ষের বেশি এবং তাদের শতকরা ৯০ ভাগই মুসলমান। এই এলাকায় মাত্র ২টি করে আসন রাখা হয়। অথচ গুয়া আন কেপ্রু, মিমবা মগ অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ভোটার ও জনসংখ্যা উপরোক্ত মুসলিম এলাকাগুলি হতে প্রায় এক তৃতীয়াংশ হলেও আসন বরাদ্দ ছিল ২টি করে। গুয়া টাউনশীপের মোট ভোটার মাত্র ৪৮ হাজার ৪১ জন, আন টাউনশীপে মাত্র ৬৮ হাজার ১৮৪ জন, কেপ্রুতে ১ লক্ষ ১৫ হাজার, মেয়ং এ ৬০ হাজার ৩৭৭ জন। মিয়ানমার সরকার নির্বাচনের এই ফলাফলকে প্রচারণার কাজে লাগিয়ে সরকারি গেজেটিয়ারে আরাকানে মুসলিমদের সংখ্যা শতকরা ৫ হতে ৭ ভাগ হিসাবে দেখায়। কাজেই ক্রমাগতভাবে আরাকানকে মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলে পরিণত করতে মিয়ানমার প্রশাসন কাজ করে গেছে। ৯০ এর নির্বাচনের পর আরাকানের নামও পরিবর্তন করে এ অঞ্চলকে মগ বা রাখাইন গোষ্ঠীর নামানুসারে 'রাখাইন স্টেট'-এ রূপান্তর করা হয়।[১৫৪] আরাকানের সরকারি নতুন নাম 'রাখাইন স্টেট'।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রভাব

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে যেমন স্বদেশ ভূমি পরিত্যাগ করে রোহিঙ্গারা একাধিকবার বাংলাদেশের বৃহত্তর চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করে তেমনি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশেও তাদের একাধিকবার আশ্রয় গ্রহণের এ সুদীর্ঘ অধ্যায় লক্ষ্য করা যায়।[১৫৫] কাজেই পাকিস্তান আমল থেকেই সমস্যাটি বাংলাদেশ সরকারকে বিব্রত করে আসছে। স্বাধীনতার পরও এ সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আশ্রিত লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে না। অন্যদিকে অবৈধ পথে আসা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। বাংলাদেশে প্রায় ৬ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু হিসেবে বাস করে। এ কারণে আইন শৃঙ্খলাসহ সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশৃঙ্খলা বাড়ছে।

১৯৭৮-৭৯ সালে প্রায় ৩ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা এদেশের উখিয়া, টেকনাফ এলাকায় আশ্রয় নেয়। তখন দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রায় দু'লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফেরত গেলেও প্রায় লক্ষাধিক শরণার্থী গোপনে স্থানীয় কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের সহযোগিতায় এদেশে রয়ে যায়। তারা উখিয়া, রামু, টেকনাফ, পার্বত্য জেলা বান্দরবন, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নেয়। বিশেষকরে বন বিভাগের পাহাড়ী এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করে তারা রাষ্ট্রীয় নাগরিক সুবিধা ভোগ করছে।[১৫৬]

সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশ সরকারের বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নবান হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো কক্সবাজার ও বান্দরবন জেলার ধ্বংসপ্রাপ্ত বনাঞ্চলে নতুন করে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৯১-৯২ সময়কালে প্রায় ৩ লক্ষ শরণার্থীর আগমন ও তাদের দ্বারা বনভূমি যেভাবে উজাড় হয় তার ধারাবাহিকতা বর্তমানে শরণার্থী ক্যাম্প ও ক্যাম্পবহির্ভূত এলাকায় বসবাসরত শরণার্থীদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ, উখিয়া, রামু এবং বান্দরবন জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি থানাসহ আরাকান সীমান্তবর্তী বিস্তৃত এলাকায় রোহিঙ্গাদের দ্বারা বনভূমি উজাড়ের এক সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে কক্সবাজার ও বান্দরবন জেলার দক্ষিণাংশে সরকারের বনায়ন কর্মসূচি ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি এতদ্‌ঞ্চলের পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব লক্ষ্যণীয়। এক তথ্যানুযায়ী, শরণার্থী ক্যাম্পের প্রতি পরবারের জন্য প্রতিদিন গড়ে ১ কেজি হিসাবে মাসিক ৩শ' কেজি এবং বাৎসরিক ৩৬ হাজার কেজি কাঠের প্রয়োজন হয়।[১৫৭] কাজেই এই জ্বালানি চাহিদা মেটানোর জন্য ক্যাম্প ও ক্যাম্পের বাইরে বসবাসরত শরণার্থীরা নির্বিচারে বনভূমি উজাড় করে চলেছে।

মিয়ানমার সীমান্তবর্তী গভীর অরণ্য বেষ্টিত বান্দরবনের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা। বান্দরবন সেনা রিজিয়নের হিসাব অনুযায়ী ২৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তের ১৭৬ কিলোমিটার সম্পূর্ণ বাংলাদেশ রাইফেলসের ২৮টি বর্ডার অবজারবেশন পোস্ট (বিওপি) থাকলেও জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়-পর্বতবেষ্টিত ১১২ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। দুর্গম পাহাড়ী অরণ্য হওয়ায় এখানে সার্বক্ষণিক পাহাড়া দেয়া খুবই দুঃসাধ্য। এই অরক্ষিত সীমান্তে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে ৭টি জঙ্গি সংগঠন ঘাঁটি গড়ে তোলে। মিয়ানমারের একাধিক জঙ্গি গোষ্ঠীর সশস্ত্র সদস্যরা এদেশে অবাধে যাতায়াতের মাধ্যমে গহীন অরণ্যে অস্ত্র বেচাকেনা, অস্ত্র চালনায় প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র

ভান্ডারের মজুদ গড়ে তোলে। আরাকান বিদ্রোহীদের কাছ থেকে অস্ত্র আসায় নাইক্ষ্যংছড়িতে রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের সশস্ত্র ঘাঁটিগুলো খুবই সক্রিয়। স্বাধীন আরাকান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে একাধিক জঙ্গি সংগঠন দীর্ঘকাল ধরে বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র সংগ্রহ করে নাইক্ষ্যংছড়ির গভীর অরণ্যে ২০টির বেশি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে তোলে।

এসব জঙ্গি সংগঠনের শত শত জঙ্গি সদস্য এদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে বান্দরবনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে সুকৌশলে জঙ্গি তৎপরতা চালিয়ে যায় এবং বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিসরূপ। জঙ্গি সংগঠনগুলোর মধ্যে আরাকান রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও), আরাকান ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (আরএনও), আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামী ফ্রন্ট (এআরআইএফ), ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরাকান (নুপা), ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আরাকান (ডিপিএ), আরাকান আর্মি (এএ), আরাকান লিবারেল পার্টি (এএলপি) অন্যতম। বান্দরবন জেলা সদর থেকে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার নাইক্ষ্যংছড়ির দক্ষিণে তুমব্রু থেকে ঈদগড় হয়ে বাইশারী পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকার একদিকে মাতামহুরী রিজার্ভ ফরেস্ট অন্যদিকে মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশ। এখানে সীমান্ত রেখা চিহ্নিত না থাকায় দীর্ঘকাল ধরে অবৈধ অস্ত্রধারী ও জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। থাইল্যান্ডের সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত থাকায় জাতিগত বিদ্রোহীরা দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাফার হিসেবে কাজ করে।

১৯৯২ এর শেষের দিকে আরএসও এবং আরআইআইএফ এর সদস্যদের শরণার্থী ক্যাম্পে প্রবেশ সম্ভব না হলেও তাদের সদস্য নিয়োগ অব্যাহত ছিল। মিয়ানমারের দাবি, বান্দরবান পাহাড়ের কাছে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমেদিত এবং তাদের ঘাঁটিগুলি বন্ধ করে ক্যাম্পে তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা কমাতে হবে। ১৯৯২ সালের নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার এটি মূল বিষয় ছিল। কাজেই বছরের শেষে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে বিদ্রোহী ঘাঁটিগুলোকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তাদের নিরস্ত্র করা হয়নি তবে বাংলাদেশ শেষপর্যন্ত ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে বাকি বিদ্রোহীদের নিরস্ত্রীকরণ করে। ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের ওপর মিয়ানমারের হামলার গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানে স্পষ্টত বিদ্রোহীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

২০০৫ সালে এক বছরে নাইক্ষ্যংছড়িতে যে পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয় তা নাইক্ষ্যংছড়ি পাহাড়ে মজুদ অস্ত্রের মাত্র ২০ ভাগ এবং এরূপ অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেশের সেনাবাহিনীর হাতেও নেই। নাইক্ষ্যংছড়িতে বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলোর পাহাড়ে গড়ে তোলা ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো গুড়িয়ে দেয়ার জন্য বিডিআর এবং সেনাবাহিনী যৌথভাবে অপারেশন চালায়। বিডিআরের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টাইগার বাহিনী মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের ঘাঁটিতে হানা দিয়ে উদ্ধার করে একটি লাইট মেশিন গান, ৫টি এম-১৬ রাইফেল, একে ৪৭ রাইফেল, দুটি ৩০৩ রাইফেল, সাতটি পাকিস্তানে তৈরি সেকেন্দার রাইফেল, ৩২টি ম্যাগাজিনসহ ৭ হাজার রাউন্ড গুলি এবং ৩ জন বিচ্ছিন্নতাবাদী আটক হয়। সেনা-বিডিআরের যৌথ অপারেশনে উদ্ধার করা হয় ৮৬টি একে ৪৭ রাইফেল, অত্যাধুনিক এম ১৬ রাইফেল ১২টি, বেশ কয়েকটি এলএমজি, পিস্তল ১৩৮টি, রকেট লাঞ্চার ৯টি, স্টেনগান ৮টি, নানা ধরনের দুই শতাধিক রাইফেল, মাইন এন্টি পার্সোনাল

৩২টি, মর্টার অর্ধ শতাধিক, কয়েক লাখ রাউন্ড গুলি, হ্যান্ড-গ্রেনেড, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, সামরিক সরঞ্জাম ইত্যাদি এবং আটক হয় ২৩ ব্যক্তি। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদরের ২০-৩০ কিলোমিটার দূরের পাহাড়গুলো এখন আক্ষরিক অর্থেই অস্ত্রের ভান্ডারে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা দীর্ঘকাল ধরে এ বিপুল অস্ত্রের ভান্ডার গড়ে তোলে। বান্দরবন জেলার মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকা রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের অভয়াশ্রমে পরিণত হয়েছে। সকল অপকর্ম ও সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য তারা অবাধে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করছে।[১৫৮]

কাজেই ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে এবং ২০১১ সালে বাংলাদেশের নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে বাংলাদেশী সেনাবাহিনী এবং বিজিবি কর্তৃক বিদ্রোহী গ্রুপের বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ পুনরুদ্ধারের বিষয়ই চোরাচালান সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট দেখা যায়। এছাড়াও অনেক আরাকানি জঙ্গির ভাষ্য মতে, তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এবং সশস্ত্র জঙ্গি বাহিনী গড়ে তুলেছে যাতে তারা বাংলাদেশি ভূখণ্ডে থেকে আরাকান রাজ্যে তাদের বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারে। বিগত দশ বছরে চট্টগ্রামের গভীর অরণ্য এবং জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গা থেকে বাংলাদেশ সেনাবহিনী, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব), বিজিবি এবং পুলিশ বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের সন্ধান পেয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার করেছে। অন্যান্য ইসলামপন্থী, জাতিগত-জাতীয়তাবাদী এবং সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি যেমন আরাকান ডেমোক্রেটিক পার্টি বা ডিপিএ (DPA- Democratic party of Arakan) এবং আরাকান লিবারেশন পার্টি বা এএলপি (ALP- Arakan Liberation Party) প্রায়ই বাংলাদেশের স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে মিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান আফিমের বিস্তার ঘটায়। আরএসও, আরএনও এবং ডিপিএ দুদেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে।[১৫৯]

তাছাড়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও রোহিঙ্গা সমস্যার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। রোহিঙ্গাদের নিয়ে বাংলাদেশে একদল উৎসাহী রাজনীতিবিদ মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অস্ত্র দিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে।[১৬০] অর্থনৈতিক প্রয়োজনে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অনেকেই সাম্প্রদায়িক জঙ্গী সংগঠনের সাথে জড়িয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। আবার স্থানীয় প্রভাবশালী মহল নিজেদের স্বার্থে স্থানীয় ভোটার তালিকায় অনেক রোহিঙ্গার নাম অন্তর্ভুক্ত করায় একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তাদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এটি ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ভবিষ্যতে হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে।

কতিপয় ক্যাম্প কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় দালাল প্রকৃতির কিছু লোক ও কতিপয় ইউপি চেয়ারম্যান মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে নাগরিকত্ব সনদ দিয়ে রোহিঙ্গাদের বসবাসের সুযোগ করে দেয়। এরা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গিয়ে বিশেষকরে সৌদিআরবে বাংলাদেশীদের ওপর নানা অত্যাচার শুরু করে। এরা সৌদিআরবে বাংলাদেশী দূতাবাসে ভিসা পুন:নবায়ন করতে গেলে নকল পাসপোর্টসহ ধরা পড়ে। অধিকাংশ যুবক ও কর্মঠ শরণার্থীরা ক্যাম্পে খুবই কম উপস্থিত থাকে। এরা দেশের বিভিন্ন স্থানে কম দামে মাসের পর মাস শ্রম দেয়। ফিশিং বোটে মাছ ধরে। ফলে স্থানীয় মজুর শ্রেণীর লোকজন কাজ পায় না। এছাড়া প্রতিনিয়ত মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গারা এদেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে বেনামে জায়গাজমি কিনে বিভিন্ন জায়গায় ঘরবাড়ি তৈরি করছে। এদের কারণে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে, বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংকট দেখা দিচ্ছে। স্থানীয়

জনজীবনে সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে স্থানীয় অধিবাসীরাও সচেতন হয়ে রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করে আশ্রয় দানকারী বা সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের তালিকাভুক্ত করে শিগগির মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্যে সরকারের কাছে দাবি জানায়।[১৬১]

তাছাড়া শরণার্থীদের জন্য প্রদত্ত ত্রাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চাহিদার অনুপাতে অপর্যাপ্ত হওয়ায় শরণার্থীদের অনেকেই তাদের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থেকে শ্রমজীবি জনসাধারণের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। নিম্নোক্ত সারণী থেকে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।[১৬২]

তালিকাভুক্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য প্রদত্ত রেশন সামগ্রী
(কুতুপালং ও নয়াপাড়া শারণার্থী ক্যাম্পদ্বয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

নং	দ্রব্য	সাপ্তাহিক (মাথাপিছু)	মাসিক (পরিবার প্রতি)		
			১-৩ সদস্য	৪-৬ সদস্য	৭ সদস্যের উর্ধ্বে
১.	চাল	৩.০৮০ কে.জি			
২.	ডাল	০.২১০ কে.জি			
৩.	সয়াবিন তৈল	০.১০৫ কে.জি			
৪.	লবন	০.০৭০ কে.জি			
৫.	চিনি	০.০৭০ কে.জি			
৬.	পুষ্টিকর খাদ্য (Blended Food)	০.২৮০ কে.জি			
৭.	মসলা	-	১ প্যাকেট	২ প্যাকেট	
৮.	সাবান	-	৩টি	৪টি	৫টি
৯.	ধানের তুষ (Rice Husk)	-	৬০ কেজি	৮০ কেজি	১০০ কেজি

উৎস- খোঃ লুৎফুল এলাহী- *রোহিঙ্গা সমস্যা ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাংলাদেশে এর প্রভাব*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃ. ২০৫।

বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক সীমান্ত এলাকায় রোহিঙ্গা সমস্যার জন্য ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। মিয়ানমারের অর্থনীতির তুলনায় রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের ভূমিতে অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করে। কারণ বাংলাদেশ রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে মিয়ানমারের তুলনায় অনেক বেশি উদার। ফলে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের তুলনায় বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সুবিধাসহ রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করে। বাংলাদেশের কক্সবাজার এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের সাথে তাদের ভাষা এবং চেহারায় মিল থাকার কারণে তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বাধীনভাবে চলাচল ও কাজও করতে পারে। এই কারণে অনেকেই স্থানীয় সমাজের সাথে বসবাস করছে। অধিকন্তু ব্যাপক দুর্নীতি এবং অস্থির রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে পাসপোর্ট এবং ভিসা পেতে সহজ করে দেয়। এরফলে তাদের

অনেকেই পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য চলে যায়। এভাবে বাংলাদেশেই অবৈধ কাজকর্মের মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে।[১৬৩]

রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা দীর্ঘস্থায়ীত্ব লাভ করায় স্থানীয় নারী-পুরুষের সাথে ক্যাম্প ও ক্যাম্প বহির্ভূত এলাকার নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় অনেক রোহিঙ্গারা স্থায়ীভাবে অবস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এরফলে স্থনীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৈপরীত্য আনয়নের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।[১৬৪] তাছাড়া মিয়ানমারে এইডস মহামারী আকারে থাকায় কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া থানা এবং কক্সবাজার শহর সহ আশেপাশের এলাকায় বসবাসকারী রোহিঙ্গা তরুণীরা বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মরণব্যাধি এইডস ছড়াচ্ছে। এরা নারী ও শিশু পাচার ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে অনেকে গুপ্তচর বৃত্তির কাজে লিপ্ত এবং তাদের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র পাচার হয়। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা সরকারি রেশন পাওয়ার পরও নিয়ম বহির্ভূত হয়ে ক্যাম্পের বাইরে এসে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীও রয়েছে। দেশের নিরাপত্তার জন্য এরা চরম হুমকি সরূপ। গত প্রায় একযুগ ধরে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন কার্যক্রম শেষ হচ্ছে না। একে কেন্দ্র করে প্রত্যাবর্তন বিরোধী শরণার্থী ও ক্যাম্পে আইন-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত পুলিশ এবং আনসারের মধ্যে একাধিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও হয়। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা না নিলে দেশের আইন, শৃঙ্খলা ও এইডস রোগের পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। তাই ক্রমবর্ধমান রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

এই সমস্যা শুধু বাংলাদেশে নয়, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলিতেও সংক্রমিত হচ্ছে। এর গভীরতা এতই ব্যাপক যে তা থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের জন্য মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করছে। এমনকি ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুসারে তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়। ফলে ফিলিস্তিনের ন্যায় তারাও এখন 'রাষ্ট্রহীন' জনগোষ্ঠীর কাতারে শামিল। এই বঞ্চনার অবসান না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের ওপর রোহিঙ্গা শরণার্থীর চাপ কমবে না। ২০০৫ সাল হতে শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় বাংলাদেশ বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে। আন্তর্জাতিক মহলের তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা উচিত। অতএব শরণার্থী প্রত্যাবাসনে মিয়ানমার যাতে গড়িমসি করতে না পারে সেজন্য জাতিসংঘসহ মানবিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। রোহিঙ্গা বিদ্রোহ ও সংকট বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হুমকি সরূপ। এতে বাংলাদেশের বাণিজ্য নগরী চট্টগ্রাম ভবিষ্যতে অরক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। সেই সূত্রে আক্রান্ত হতে পারে জাতীয় অর্থনীতি। এমনিতে নৌবাহিনীর জনবল ও সামরিক সরঞ্জামের অভাবে সমুদ্রসীমা নিশ্চিদ্র পাহাড়া দেয়া কঠিন। ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের এতদসংক্রান্ত বিরোধও রয়েছে। এই বিরোধ ও রোহিঙ্গা ইস্যুটি সময়ে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং রোহিঙ্গা ইস্যুটির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ফোরামে আরো সোচ্চার হয়ে দ্রুত সুরাহা হওয়া আবশ্যক।[১৬৫]

রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও পুনর্বাসন প্রসঙ্গ

রিফিউজির বাংলা প্রতিশব্দ 'বাস্তুহারা বা শরণার্থী'। সহজ কথায় ভিটামাটি হারিয়ে দেশ ছেড়ে বাধ্য হয়ে অন্য রাষ্ট্র বা দেশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেই তাকে শরণার্থী বলা হয়। মৌলিক ব্যাপারটি হচ্ছে দেশ ত্যাগ ইচ্ছাধীন নয়। সে স্বেচ্ছায় জন্মভূমি বা নিজ দেশ ছেড়ে যায়নি। সে বাধ্য হয়েছে নিজ রাষ্ট্র বা দেশ ছেড়ে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে। যদি কোনো মানুষ রাষ্ট্র শক্তি বা অন্য কোনো প্রতিপক্ষের ভয়ে দেশত্যাগী হয়, তবেই সে শরণার্থী। রাষ্ট্র যদি নিজেই উৎপীড়ন ও নির্যাতনের কারণ হয় এবং নিরীহ জনগণ যদি রাষ্ট্রীয় পুলিশী হামলা বা রাষ্ট্রশক্তির ছত্রচ্ছায়ায় লালিত অন্য কোনো শক্তির হামলার শিকার হয় এবং দেশ ত্যাগ করে তবে আন্তর্জাতিক আইন ও বিশ্বজনমত শরণার্থীদের পক্ষ অবলম্বন করে থাকে। কোনো দেশে আশ্রিত রিফিউজিদেরকে সাহায্য করার আন্তর্জাতিক বিধান সমূহ স্পষ্ট। তাছাড়া যে দেশ থেকে শরণার্থীরা পালিয়েছে সে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নানাবিধ আইনগত, রাজনৈতিক ও নৈতিক ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রয়েছে।[১৬৬]

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় নেয়া ধারাবাহিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যাটি দীর্ঘদিন আগেই অঙ্কুরিত এবং সময়ের ব্যবধানে তা জটিল হয়ে পড়েছে। শরণার্থী সংকট বিশ্বের সব দেশেই একটি অস্থায়ী সমস্যা, কিন্তু বাংলাদেশে এটা স্থায়ী হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক যে আইন রয়েছে তাতে বলা আছে, কোনো দেশ কোনো জনগোষ্ঠীকে একবার শরণার্থীর মর্যাদা দিয়ে রাখলে ওই নাগরিক যদি পরবর্তীকালে স্বেচ্ছায় স্বদেশে ফিরে যেতে রাজি না হয়, তাহলে তাকে জোর করে ফেরত পাঠানো যাবে না। এই অবস্থায় বাংলাদেশে অবস্থিত অবশিষ্ট শরণার্থীরা রাজি না হওয়ায় এবং মিয়ানমার সরকার ছাড়পত্র না দেয়ায় রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফেরত পাঠানো যায়নি। এই জটিল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পড়েছে বিপাকে। শরণার্থী কাদের বলা যাবে সে ব্যাপারে ১৮৮৯ সালের মন্টেভিডিও চুক্তি, ১৯১১ সালের কারাকাস চুক্তি, ১৯২৮ সালের হাভানা কনভেনশন, ১৯৩৩ সালের রাজনৈতিক আশ্রয় সংক্রান্ত মন্টেভিডিও কনভেনশন, ১৯৫৪ সালের কূটনৈতিক আশ্রয় দান সংক্রান্ত কনভেনশন, জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ ১৯৫৯ ও ১৯৬৭ কনভেনশন ও প্রটোকলে তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে। জাতিসংঘের একটি সম্মেলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে শরণার্থীকে রক্ষা করার জন্য কিছু ব্যবস্থা অনুমোদন করা হয়েছিল। এই সম্মেলন শরণার্থী কনভেনশন ১৯৫১ নামে পরিচিত। শরণার্থী কনভেনশন ১৯৫১ শরণার্থীদের সুরক্ষা জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইনি উপকরণ। এটা শরণার্থী সংজ্ঞা প্রদান করে। এটা শরণার্থীদের জন্য আইনী ও বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের প্রাপ্য মৌলিক অধিকারও নির্ধারণ করে। শরণার্থী কনভেনশন ১৯৫১ এর মূলনীতি হলো মানুষ বৈষম্যহীন মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা ভোগ করবে। ১৯৫১ সালের শরণার্থী সম্মেলনে ৭টি ধারা এবং ৪৬টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন এখনো অনুমোদন করেনি। ফলে, বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীরা ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন এর অধিকার থেকে বঞ্চিত। কাজেই জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনের উচিত রাখাইন এলাকায় প্রত্যাবাসন ও রিইন্টিগ্রেশন কর্মসূচি অত্যন্ত জোরালো করে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া। সে কাজের জন্য তারা ১০-১২ বছর সময় পাওয়ার পরও শরণার্থী আজও বাংলাদেশের গুরুতর সমস্যা হিসেবেই রয়ে গেছে।[১৬৭]

তাই রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসনের ব্যাপারটি দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থার শিকারে পরিণত হতে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। মিয়ানমার সরকারের নির্লিপ্ততা ও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাইকমিশন মিয়ানমারে যথাযথভাবে কাজ করতে পারেনি।[১৬৮] উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক কনভেনশনের স্বাক্ষরদাতা দেশ নয়; শুধু বাংলাদেশ নয়, দক্ষিণ এশিয়াসহ বহু উন্নয়নশীল দেশ এ কনভেনশন সই করেনি। তবে বাংলাদেশ কমিশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য। এক্ষেত্রে কনভেনশন মানা বাংলাদেশের জন্য নৈতিক দায়িত্ব হলেও কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। কমিশনের কনভেনশন অনুসারে শরণার্থীদের সমস্যা নিরসনে তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়-

প্রথমত, যেখান থেকে শরণার্থী এসেছে সেখানে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া।
দ্বিতীয়ত, যেখানে শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে সেখানে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেওয়া এবং
তৃতীয়ত, তৃতীয় কোনো দেশে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

কিন্তু কমিশন তৃতীয় কোনো দেশ খুঁজে বের করার কোনো চেষ্টাই করেনি এমনকি মিয়ানমার সরকারের ওপর শরণার্থী ফিরিয়ে নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেও ব্যর্থ হয়। মিয়ানমারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা ১৫ই আগষ্ট '৯৭ এর পর আর কোনো শরণার্থী গ্রহণ করবে না। মিয়ানমারে ফিরে যাবার ব্যাপারে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনের কক্সবাজারস্থ কমিশনারের কাছে তারা ৮ দফা দাবিনামা পেশ করে। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা যে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে থেকে যেতে চায় না তার একটি বড় প্রমাণ হলো তাদের ৮ দফা দাবি। ১৯৯৭ সালে তারা এই ৮ দফা দাবি জানায় মিয়ানমারে ফিরে যাবার জন্য যা হলো-

১. শরণার্থীদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে তা তুলে নিতে হবে মিয়ানমার সরকারকে এবং শরণার্থীদের বসতি স্থানে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাই কমিশনের প্রতিনিধি থাকতে হবে।
২. মিয়ানমারের জনগোষ্ঠী হিসেবে রোহিঙ্গাদের মেনে নিতে হবে।
৩. মানবাধিকার ও স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে হবে।
৪. রোহিঙ্গাদের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে।
৫. রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।
৬. ফিরিয়ে নিয়ে গেলে রোহিঙ্গাদের যথাযোগ্য মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।
৭. মিয়ানমারের সামরিক আইন তুলে নিতে হবে।
৮. মিয়ানমারে অনেক মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, রোহিঙ্গাদের সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাখাইনদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে এগুলো ফিরিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

এই দাবিগুলো অযৌক্তিক ছিল না। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে রোহিঙ্গারা নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও অধিকার নিয়ে ফিরে যেতে প্রস্তুত ছিল। তাদের ধারণা ছিল এই দাবিগুলো বাস্তবায়ন হলে তাদের বার বার শরণার্থী হতে হবে না।[১৬৯] জাতিসংঘের ইউএনএইচসিআর-এ নিরাপত্তা এবং সম্মানের সঙ্গে সেচ্ছায় প্রত্যাসনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখিত হয়-

১. শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সঙ্গে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার অধিকার।

২. বিরাজমান পরিস্থিতিতে প্রত্যাগমনকারীদের শারীরিক ও আইনি নিরাপত্তার অধিকার।
৩. প্রত্যাগমনকারীদের পর্যাপ্ত স্থিতিশীল অবকাঠামো প্রদান বা খাদ্য, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্য সুবিধা সহ জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তার প্রাপ্যতা।
৪. প্রত্যাগমনকারীদের অন্যান্য মৌলিক মানবাধিকারগুলোও বৈষম্যহীন এবং সম্মানের সঙ্গে প্রদান
৫. একটি আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির অংশ হয়ে প্রত্যাগমন।[১৭০]

কাজেই বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সমস্যা শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ সরকার শরণার্থীকে নথিভুক্ত করার চেষ্টা করে। পরে শরণার্থীদের ন্যূনতম জীবনমান মান বজায় রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এটি উল্লিখিত যে, ইউএনএইচসিআর এবং বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে রোহিঙ্গাদের সহায়তা প্রদান করে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশের চারটি মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত রয়েছে; যেমন-

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়[১৭১]

এছাড়াও বিশ্বায়নের এই যুগে পাস্পরিক নির্ভশীলতা থেকে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে তারা সরাসরি অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে। এর পাশাপাশি তারা বাংলাদেশের ওপর চাপ কমাতে বিশাল সংখ্যক রোহিঙ্গাদের থার্ড কান্ট্রিতে পুনর্বাসন করছে। এসব দেশের মধ্যে মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনে সহায়তার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দশ বছরের বেশি সময় ধরে ১৪ হাজার রোহিঙ্গা মালয়েশিয়াতে বসবাস করছে। যদিও মালয়েশিয়া ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন বা ১৯৬৭'র প্রটোকল কোনটাতেই স্বাক্ষর করেনি। ২০০৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও দক্ষিণ কোরিয়া নিজ দেশে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনে আগ্রহী নয়। থাইল্যান্ড রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিলেও তৃতীয় কোনো দেশে পুনর্বাসনে আগ্রহী। ২০০৬ সালে কানাডা ১০৬৫১ শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করেছে ভিন্ন নাগরিকত্ব প্রদান করে। এখন এটা স্বীকৃত যে কানাডা সর্বোচ্চ শরণার্থী গ্রহণকারী দেশ। সেইসঙ্গে ইউএনএইচসিআর- এর বৃহত্তম দাতা, ২০০৮ সালে ৩৩,৪০৯,৬৩৪ মার্কিন ডলার দান করে। অধিকন্তু, ২০০৬ সালে কানাডা ৯ জন এবং ২০০৭ সালে ১৩ জন বাংলাদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গা মুসলমানকে পুনর্বাসিত করে। বাংলাদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের জন্য অস্ট্রেলিয়া ২০০৭-২০০৮ সালে ৩২.৪ মার্কিন ডলার সহায়তা করেছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষা, ক্ষুদ্রঋণ, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে। অস্ট্রেলিয়া এই সহায়তা যাতে ২০০৮-২০০৯ সালেও অব্যাহত থাকে সেই নিশ্চয়তাও প্রদান করে। ২০০৮ সালের ২২শে মে অস্ট্রেলিয়া সরকার বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের জন্য ১০ হাজার নতুন ঘর নির্মাণের জন্য ১.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান

করে। অল্প সংখ্যক রোহিঙ্গা অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস করছে। ২০০৮ সালের ২৮শে জুন নিউজিল্যান্ড আরাকান-বার্মার রোহিঙ্গা ইয়ুথ ডেভেলাপমেন্ট ফোরাম (RYDF-Rohingya Youth Development Forum)-এর সদস্য সহ ২৩ জন রোহিঙ্গাকে পুনর্বাসিত করেছে।[১৭২] ২০০৬ সাল থেকে ১৭১টি রোহিঙ্গা পরিবার থার্ড কান্ট্রিতে পুনর্বাসিত হয়েছে। এদের বেশির ভাগ গিয়েছে কানাডায় ২৭৮ জন, যুক্তরাজ্যে ১৬৬, অস্ট্রেলিয়া ১২৬, আয়ারল্যান্ড ৮২, নিউজিল্যান্ড ৫০, যুক্তরাষ্ট্রে ২৪, সুইডেন ১৯ এবং নরওয়ে-তে ৪ জন।[১৭৩]

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ/এশিয়া আরাকান রাষ্ট্রে চলমান বৈষম্য এবং মুসলমান নাগরিকত্ব অস্বীকার, বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন এবং জোরপূর্বক শ্রমদান, উদ্বাস্তুদের নতুন প্রবাহের তথ্য চিত্র উপস্থাপন করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ/এশিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যেখানে ইউএনএইচসিআর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার প্রচারের মাধ্যমে শরণার্থীদের বহির্গমন প্রতিরোধে কাজ করেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আরাকানে মানবাধিকার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং এই নীতির আলোকে প্রত্যাবাসন নীতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। বিশেষকরে, ইউএনএইচসিআরকে নিশ্চিত করতে হবে যে, ক্রমাগত নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচারের আয়োজন করা যাতে উদ্বাস্তুদের অধিকারগুলো মূল্যায়ন করা হয়; যাতে নিজ দেশ এবং দ্বিতীয় কোনো আশ্রিত দেশ উভয়ের সঙ্গেই ভাল সম্পর্ক বজায় থাকে, কেননা এমন পরিস্থিতিতে স্বার্থের সংঘাত জড়িত রয়েছে। ১৯৯৬ সালের জুন থেকে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে ইউএনএইচসিআর নীতি নিরুৎসাহিত করে এবং কখনও কখনও সরকারকে সহায়তা প্রদান করে যা মিয়ানমার থেকে সম্ভাব্য আশ্রয়ের আশায় প্রত্যাবর্তনকারীদের বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার সরকার কর্তৃক নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত এবং তাদের অস্বীকৃত অধিকারগুলি মেনে না নেয়া পর্যন্ত শরণার্থী সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। যদি বিকল্প সুবিধা গ্রহণ না করা হয় তাহলে তারা সবসময় পালানোর জন্য প্রস্তুত একটি দুর্বল ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী হয়েই থাকবে। এক্ষেত্রে দ্যা স্টেট ল এণ্ড অর্ডার রেস্টোরেশন কাউন্সিল বা স্লর্কের কাছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ/এশিয়ার প্রস্তাবনা-

- জরুরী ভিত্তিতে, মিয়ানমারের আরাকান রাষ্ট্রের মুসলমানদের পূর্ণ নাগরিকত্ব এবং সহজাত অধিকার বিশেষকরে চলাফেরার স্বাধীনতা প্রদান করে 'নাগরিকদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করা, যা জাতিগত বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর বৈষম্যমূলক প্রভাব ফেলে', ফলে স্লর্কের ১৯৮২ নাগরিকত্ব আইন সংশোধিত বা বাতিল করা উচিত।

- স্লর্ককে অবিলম্বে আরাকান রাজ্যে বাধ্যতামূলক শ্রম রহিতকরণ করা উচিত এবং কেননা ১৯৩০ সালের আইএলও কনভেনশন (The 1930 ILO Convention on Forced Labor) বাধ্যতামূলক শ্রম আইন নিরসনে, যা সরকার ১৯৫৫ সালে স্বাক্ষর করে।

- ১৯৯২ এর শিশু অধিকার কনভেনশন এর অনুমোদন দ্বারা নির্দেশিত শিশু অধিকারগুলোর প্রতি সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী শিশুদের অধিকার বিশেষভাবে সুরক্ষিত করা উচিত। বিশেষত, বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে জন্মগ্রহণকারী ২০ হাজার শিশুসহ সকল শিশুদের জাতীয়তার অধিকার দেওয়া উচিত। কোনও পরিস্থিতিতেই শিশুদের শ্রমদানে বাধ্য করা উচিত নয় এবং মুসলিম শিশুদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সুবিধা নীতির সঙ্গে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়।

- মিয়ানমার সরকারকে নতুন বিশেষ দূতকে বিনামূল্যে ও গোপনে প্রবেশ নিশ্চিত করে তার মিশনের এলাকা পরিদর্শন করার অনুমতি দেওয়া উচিত।

- আরাকান রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘন পরিস্থিতি সমগ্র দেশেরই প্রতিফলন এবং মিয়ানমার সরকারের ১৯৯৫ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রধান মানবাধিকার বিষয়ক উপাদান এবং ১৯৯৬ সালের জাতিসংঘের মানবাধিকার রেজুল্যুশান অনুযায়ী বিশেষকরে চলাফেরার স্বাধীনতা, সংগঠন এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদের দিকে নজর রাখা উচিত।[১৭৪]

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আগ্রহী। কারণ তারা সবাই রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধানে একমত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই সমস্যায় ভূমিকা পালন করতে চায় কারণ তারা মনে করে এতে জড়িত আছে বহুবিধ ইস্যু যেমন- রাজনৈতিক ইস্যু, অভ্যন্তরীণ সংকট, সামাজিক সমস্যা। উপরন্তু রোহিঙ্গা সমস্যা শুধুই বাংলাদেশ বা মিয়ানমারের সমস্যা নয়, এতে জড়িত হয়ে পড়েছে ভারত, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা এসব দেশেও আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই এই সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বাংলাদেশে প্রচুর রোহিঙ্গা শরণার্থীর বাস। বাংলাদেশের নিজেরই অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে যে কারণে সমস্যাটির সমাধান তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে মিয়ানমার সমস্যাটি সমাধানে যতখানি ইচ্ছা ও সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এখানে জড়িত হতে হয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে যেসব দেশ এগিয়ে এসেছে তারা হলো ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, জার্মানী, সৌদিআরব, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা এছাড়াও যুক্ত হয়েছে নানা সরকারি বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থা, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ASEAN, SAARC, EU, UNHCR, USAID ইত্যাদি। এছাড়াও এই সমস্যা উত্তরণে বহু বিদেশী এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ তার ভূমিকা যথাযথ পালন করায় বা সংশ্লিষ্ট দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করায় অনেক ইতিবাচক সিদ্ধান্তও আমরা প্রত্যক্ষ করি।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মূলত দুটি বিষয়কে সামনে রেখে কাজ করতে আগ্রহী ছিল। যেমন- মানবিক দায়বোধ ও রাজনৈতিক বিষয়। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অন্য কোনো তৃতীয় দেশে থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। এখানে তারা অর্থ সাহায্য, খাদ্য সহায়তা, প্রযুক্তিগত সাহায্য দিয়েছে। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া রোহিঙ্গাদের তৃতীয় কোনো দেশ ব্যতীত নিজ দেশেও থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় একটি NGO Austcare বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কক্সবাজারের কুতুপালং এ বাড়িঘর নির্মাণ করে দেয়। শরণার্থীদের শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিনোদন নিশ্চিত করতে নানা ধরনের সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে Austcare অস্ট্রেলিয়া। নিউজিল্যান্ডও তাদের দেশে বেশ কয়েকটি রোহিঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করেছে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তিনটি দেশ যেখানে শরণার্থীরা পুনর্বাসিত হতে পারে। ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এই তিনটি দেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা পুনর্বাসিত হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড বহু রোহিঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসিত করেছে তাদের দেশে এবং অন্য কোনো দেশে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসিত করার জন্য অর্থ সাহায্য দিয়েছে। এছাড়াও আঞ্চলিক সংগঠনগুলো রোহিঙ্গা পুনর্বাসনে বিভিন্ন সাহায্যে এগিয়ে এসেছে নয়ত মিয়ানমার সরকারের ওপর রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে চলেছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক ও আন্তরিক। বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংগঠন মানবিক সহযোগিতা, কূটনৈতিক সমর্থন, পুনর্বাসন প্রকল্পে জড়িত ছিল।[১৭৫] কিন্তু বিজ্ঞজনদের অভিমত শুধু অর্থ সাহায্য, অন্য দেশে পুনর্বাসন বা মানবিক সহমর্মিতা যথেষ্ট নয় এই সমস্যার সমাধানে। The United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) এই সমস্যায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করলেও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে তাদের অর্জন অপ্রতুল্য। মিয়ানমার সরকারকেই সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়ে আর এখানেই নিহিত রয়েছে এই ইস্যুর সমাধান।[১৭৬]

বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য আবশ্যক। বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পর্ক উন্নয়নের অন্যান্য খাতে কোনো সমস্যা না থাকলেও যতদিন পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হবে না ততদিন দুটি দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না। রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত নিরাপত্তার অন্তরায়। তাই দুটি দেশের অভিন্ন এই সমস্যার সমাধানকল্পে দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থার বিকল্প নিয়েও ভাবতে হবে। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আশার কথা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ বিষয়ে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন।[১৭৭]

সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে, আরাকানী মুসলমানরা (বর্তমানে রোহিঙ্গা নামে পরিচিত) অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মতো মিয়ানমারে প্রথম থেকেই উপেক্ষিত। তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া একেবারে শুরু থেকেই উপেক্ষা করা হয়েছে। বর্তমানে রোহিঙ্গা সংকটের বীজ বর্মি রাজনীতির গভীরে প্রোথিত। প্রথম থেকেই স্থানীয় বর্মি জনগোষ্ঠী নিজেদের সর্বক্ষেত্রে যোগ্য ও প্রভাবশালী হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস পায়। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা ও অবদানই সবার চেয়ে বেশি বলেও তারা বিশ্বাস করে। তাদের আরো বিশ্বাস যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের স্বার্থে ক্ষুদ্র এই নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষেপিয়ে তুলছে এবং দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে ব্যবহার করছে। তাই বর্মিদের দাবি ও বিশ্বাস তাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামরিক আধিপত্যের জোরেই তারা বার্মাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারছে। তাদের জাতীয়তাবাদের আদর্শেই সকলকে এক হয়ে ইউনিয়ন অব বার্মা টিকিয়ে রাখতে হবে।[১৭৮]

কিন্তু সময় পাল্টেছে, বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিশেষকরে রোহিঙ্গাদের ওপর অন্যায় নির্যাতন বন্ধ করে তাদের দাবি মেনে, তাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি প্রদান করে মিয়ানমারকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে মুক্তি দিতে হবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে। মিয়ানমারকে নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের Asian studies at the School of Foreign Service-এর অধ্যাপক স্বনামখ্যাত রাজনৈতিক বিশ্লেষক David. I. Steinberg। তিনি তাঁর গ্রন্থ *Burma/Myanmar what everyone needs to know*-তে মিয়ানমারের বর্তমান দশটি সংকট চিহ্নিত করেছেন।[১৭৯] অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক,

সামাজিক সমস্যার মধ্যে তিন নম্বরেই রয়েছে সংখ্যালঘুদের নিয়ে সংকটের বিষয়টি (a crisis of the minorities)। Steinberg শঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন যে, মিয়ানমার যদি দ্রুত এই সংকটের সমাধান করতে না পারে তাহলে তা মিয়ানমারের স্থায়ী শান্তির পথে অন্তরায় হবে।[১৮০] আর বাংলাদেশের জন্যও বিষয়টি হবে নাজুক। কাজেই উভয় দেশই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যার সমাধান করবে এই প্রত্যাশা সবার।

তথ্য নির্দেশ-

১. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ২২।

২. Abdul Mabud Khan, *The Maghs: A Buddist Community in Bangladesh*, Dhaka: University Press Ltd., 1999, p.3.

৩. Abdul Karim, *The Rohingyas: A short Account of their History and Culture*, Chittagong: Arakan Historical Society, 2000, p.1.

৪. আহমেদ শরীফ, "চট্টগ্রামের ইতিকতা (আদিযুগ)," ইতিহাস, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রাহায়ণ, ১৩৭৪, পৃ. ১৬২।

৫. Abdul Karim, *op.cit.,* p.2.

৬. Mohammed Yunus, *A History of Arakan: Past and Present*, Chittagong: Megenta, colour, 1994, p.12; Manifesto of Arakan Rohingya National Organisation, Arakan, 1998, p.2.

৭. Abdul Karim, *op.cit.,* p.2.

৮. *The Return of the Rohingyas to Burma: Voluntary Repatriation or Refaulement? U.S Committee for Refugees*, Washington, March 1995, p.3.

৯. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭।

১০. *The Constitution of the Socialist Republic of Union of Burma*, 1974, Sec. No.3/5.

১১. মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ "আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য", *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৩২; উদ্ধৃতি, *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XIII, Part-1, 1844, p.24.

১২. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ২৭-২৮।

১৩. Anthur P. Pheyre, *History of Burma, Including Burma Proper, Pegu, Taungu, Tenasserim and Arakan: From the Earliest time to the End of the first war with British India* (London: Susil Gupta, 1967), p.41.

১৪. *The Call of Rohingya*, Arakan Rahingya Patriotic Front, 1st year, Vol.1. 1981.

১৫. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮।

১৬. R.B Smart, *Burma Gazetters: Akyab District, Vol.* A, Rangoon, Government of Burma, 1917, p. 90; A. Phayre, "On the History of Arakan", *Journal of the Asiatic Society of Bengal Calcutt*a, Vol. XIII, Part.1. 1844, p.36.

১৭. R.B. Smart, *Ibid.,* p.90.

১৮. Mohammad Ali Chowdhury, *The advent of Islam in Arakan and the Rohingyas*, The Annual Magazine 1995-96, Arakan Historical Society (A.H.S), Chittagong, Bangladesh, 1996, p.5; See for details D.G.E. Hall, Stydies in Dutch relations with Arakan, *Journal of the Burma Research Society*, Vl. XXVI, 1936, p.6.

১৯. G.E. Harvey, *History of Burma,* (Longmans Green, London, 1925), P.139; J.N. Sarkar, *History of Bengal,* Vol. 2, (Dacca, 1948), pp.120-129; অব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস ঃ সুলতানী আমল*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭), পৃ.২৫৩।

২০. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২।

২১. Moshe Yeagar, *The Muslims of Burma: A Study of Minority Groups*, (Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1972), p.25; এন. এম. হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৫, পৃ. ২৯।

২২. A.S. Bahar, *The Arakani Rahingyas in Burmese Society*, M.A. Thesis, University of Windsor, Ontario, Canada, 1981, p.27.

২৩. R.C Majumder, (ed), *The History of Ancient Bengal*, Vol.1, Hindu Period (Dacca: University of Dhaka, 1963), pp. 176-77.

২৪. Mohammad Ali Chowdhury, *Bengal-Arakan Relations (1430-1666),* Kolkata: Firma KLM Private Limited, 2004, p.72.

২৫. Mohammad Ali Chowdhury, *Ibid.,* p.196.

২৬. Mohammed Yunus, *op.cit.,* p.41.

২৭. Mohammed Yunus, *Ibid.,* p.66.

২৮. G. E. Harvey, *op.cit.,* p.148.

২৯. D.G.E. Hall, *Burma* (Hutchinson & Co. Ltd., London, 1960), p.94.

৩০. Maung Htim Aung, *A History of Burma*, (Colombia University press, New York, 1967), p.195.

৩১. *Lieutenant Colonel to the Commander-in-Chief, Political Consultations* (henceforth reffered p.c), 25 as April, 1794 No.14, Mahammad Siddiq Khan Collections (henceforth reffered as M.S.K.C), *Political Proceedings*, (henceforth reffered as .P.P), Vol.1, p.194.

৩২. G.E. Harvey, *op.cit.*, p.194.

৩৩. রতন লাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক (১৭৮৫-১৮২৪)*, (এশিয়াটিক প্রেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১৯৮৪), পৃ. ১১।

৩৪. G.E. Harvey, *op.cit.*, pp. 280-281.

৩৫. Imtiaz Ahmed (Editor), *The Plight of the State Less Rohingyas,* (The university press limited, Dhaka, 2010), p.3.

৩৬. *Political letter to court,* Fort William-India House Correspondence, Vol. XVII, P.404.

৩৭. Serajuddin Alamgir Muhammad, *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong,* (Chittagong University, 1971), p.120.

৩৮. Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, (Jerusalem: Hebrew University, 1981), p.99; "Tribute to a departed revolutionary: Martayr Mujahid-e-Azam Jafar Hussain Kawwal" *Insaf. Rohingyas voice and Vision*, vol.3, Issue 2-3, 30 September, 1986, pp. 17-22.

৩৯. Moshe Yegar, *Ibid.,* p.99; Mohammad Yunus, *Op.cit.,* pp.133-135.

৪০. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭।

৪১. Mohammed Yunus, *Op.cit.,* pp.153-54.

৪২. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২।

৪৩. *Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus?,* Human Rights Watch, Asia, Vol. 8, No. 9 (C), September 1996, p.13.

৪৪. "Hacked bodies of refugees found; 109 Burmese detained", Associated Press, July 19, 1992.

৪৫. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২।

৪৬. Maung Htim Aung, *op.cit.,* p. 195; D.P. Singhal, *The Annexation of Upper Burma*, (Eastern University Press, Singapore, 1960), p.13.

৪৭. G.E. Harvey, *op.cit.*, p. 149; D.G.E Hall, *op.cit.*, pp. 93-94.; Chittagong District Records, Vol. 515, pp. 49-102, *National Archives of Bangladesh (NAB)*- এ সংরক্ষিত।

৪৮. মো. আখতারুজ্জামান, "মধ্যযুগের বাংলা ও আরাকানের আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, পয়ত্রিশ বর্ষ, প্রথম- তৃতীয় সংখ্যা, ১৪০৮ বাংলা, পৃ.পৃ. ১১-১২।

৪৯. স্বপ্না ভট্টাচার্য, *আরাকান ইতিহাসের এক পর্ব*, ১৮২৪-১৮৮৫, পৃ. ৬৭৭।

৫০. R.B Smart, *Op.cit.,* p.17.

৫১. আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস ও প্রসঙ্গ কথা, ইতিহাস, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ*, ঢাকা, ১৫শ-২০বর্ষ সম্মিলিত সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮৮-চৈত্র ১৩৯৩, পৃ.৯২।

৫২. Philip Nolan, *Report on Emigration from Bengal to Burma, Proceding of Governor General 1888,* Bangladesh National Archives, p.4.

৫৩. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫।

৫৪. রতন লাল চক্রবর্তী, "বাংলাদেশ ও বার্মায় জন-অভিবাসন প্রকৃতি ও তাৎপর্য (১৭৮৫-১৯৪৮)", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্দশ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ.৪১।

৫৫. Kallie Szczepanski (Asian History Expert), *Who Are the Rohingya?* http://asianhistory.about.com/od/Asian_History_Terms_N_Q/g/Who-Are-The-Rohingya.htm.

৫৬. রতন লাল চক্রবর্তী, "বাংলাদেশ ও বার্মায় জন-অভিবাসন প্রকৃতি ও তাৎপর্য (১৭৮৫-১৯৪৮)", *পূর্বোক্ত*, পৃ.৪১।

৫৭. সুধাংশু রঞ্জন রায়, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক, ১৮৮৬-১৯৪৭*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য পেশকৃত অভিসন্দর্ভ, পৃ.পৃ. ২৮০-৮১।

৫৮. খোঃ লুৎফুল এলাহী- *রোহিঙ্গা সমস্যা ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাংলাদেশে এর প্রভাব*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃ.পৃ. ৭৭-৭৮; মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী (সম্পাদক), *আরাকানের মুসলমান: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, আরাকান হিসটরিক্যাল সোসাইটি, চট্টগ্রাম, ২০১৪, পৃ.৬।

৫৯. সুধাংশু রঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮১।

৬০. Moshe Yeagar, *The Muslims of Burma: A Study of Minority Groups*, *Op.cit.*, p.25.

৬১. Anthony Irwin, *Burmese Outpost*, London, 1946, p.21.

৬২. Josef Silverstein, *Burma: Military Rule and the Politics of Stagnation, (*Cornell University press, Ithaca, New York, 1977), pp.70-77; Farzana Hossein, "Authoritarianism and Prospect for Democracy in Myanmar", *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) Journal*, Vol.13, 1, November, 1992, p.55.

৬৩. Memorandum of the East Bengal Arakanese Association, 30 December, 1947, Government of the East Bengal, B- Procedings, Home Department, Political Branch, 1948, File No. 8 A-5/48, *National Archives of Bangladesh*.

৬৪. At the time the British Government were in power and some amount of help was received from Governmental authorities. Now that the Government is entirely in the hand of the Burmese, Muslims feel very insecure as they apprehend that they may not get full Governmental help in the event of a clash. The Position of Muslim Population in Burma is likely to get worse if adequate measures are not adopted to treat the Buddhists in East Pakistan well. The Government of Pakistan are therefore anxious that the Buddhist Population should not be given any chance of complaints against the local officials and will be glad if suitable steps are taken to prevent any ugly incidents which might give cause for unnecessary friction between the Muslim and Buddhist in Eastern Bengal.

Express Circular Letter, Ministry of Foreign Affairs and Commonwealth Relations, Government of Pakistan, 10 July, 1948, Government of East Bengal, B-Proceedings, Home depertment, Political Branch, 1948, *National Archives of Bangladesh*, File no. 8 A-5/48.

৬৫. সুধাংশু রঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯১।

৬৬. Mohammad Yusuf, "The Plight of the Rohingyas: A living Human Tragedy in Arakan," *Arakan-Official Mouthpiece of ARIF*, Vol.5, ISSUE 7, 31 July 1992, pp.5-6.

৬৭. Mohammed Yunus, *Op.cit.*, p.133.

৬৮. Kala বা কলা শব্দের অর্থ প্রথমত: ভারতীয় এবং দ্বিতীয়ত: পাশ্চাত্যের অধিবাসী বা যেকোনো বিদেশী, যেমন: ইউরোপীয় বা আরবীয়। মূলত: বর্মীরা এ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বিদেশী বুঝিয়ে থাকে; H.Yule, *A Narative of the mission Sent by the Governor General of India to the Court of Ava in 1855*, p.5; সিরাজুল ইসলাম, ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক, পৃ. ১৬৯।

৬৯. এন এম হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, বাংলাদেশ বুক কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃ. ১১৫।

৭০. এন এম হাবিব উল্লাহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ.-১১৬-১১৭; Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, *Op.cit.*, pp.96-98.

৭১. *The Pakistan Times,* 27 August 1959; Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, *Ibid.,* p.82.

৭২. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫।

৭৩. Mohammed Yunus, *Op.cit.*, pp.148.

৭৪. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫।

৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।

৭৬. Mohammed Yunus, *Op.cit.*, pp.149-50; National Refugee Week, *The Refugee Council of Australia,* 17 June, 1992, p.37.

৭৭. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬।

৭৮. Mohammed Yunus, *Op.cit.*, pp.150-51.

৭৯. Mohammed Yunus, *Ibid.,* pp.152-53.

৮০. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ ৬৮-৬৯।

৮১. For details of the protest note see, *Bangladesh in International Affairs*, Vol. 1, No. 4, April 1978, pp.13-14; Kamal Uddin Ahmed, *Bangladesh and Its Neighbours*, (Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2008), p.99.

৮২. For details of the protest note see, *Ibid.,* pp.13-14*;* Kamal Uddin Ahmed, *Ibid,* pp.99-100; ফারুক ওয়াসিফ, *পূর্ব সীমান্তে এখনো দুঃসংবাদ*, ২৮ জুলাই, ২০১২, পৃষ্ঠা-১২, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2012-07-28/12।

৮৩. SLORC Announcement No. 1/90, July 27, 1990. The constituent assembly was not convened until January 1993 and is still deliberating, though with only a handful of elected representatives. See Janelle M. Diller, "*The National Convention in (Burma) Myanmar,"* (Washington, D.C.: International League for Human Rights), April 1996.

৮৪. In response to these demonstrations two monks and a student were killed by the army in Mandalay, and in November 1990 some 150 monasteries in Mandalay and Rangoon were raided and hundreds of monks were arrested. In Insein jail the hunger strikers were tortured, and later the leaders were moved to prison labor camps far from their homes, making family visits almost impossible. See Win Naing Oo, *Cries from Insein* (Bangkok: ABSDF, 1996).

৮৫. For details of their allegations, see Asia Watch, "Burma: Rape, Forced Labor and Religious Persecution in Northern Arakan," *A Human Rights Watch Short Report*, vol. 4, no. 13, May 1992; *Amnesty International*, "Union of Myanmar (Burma): Human Rights Violations Against Muslims in the Rakhine (Arakan) State" (London: Amnesty International), ASA 16/06/92, May 1992.

৮৬. Ironically, much of the bamboo the Rohingyas had cut in Burma was sold by soldiers on the black market to the UNHCR to build the refugee camps; *Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus?, Op.cit.,* p.12.

৮৭. ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ১৯৯০-১৯৯৯, ঢাকা, পৃ.পৃ. ১০৭-১০৮।

৮৮. *Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus?, Op.cit.,* p.12.

৮৯. ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১০৭-১০৮।

৯০. "Joint Statement by the Foreign Ministers of Bangladesh and Myanmar Issued at the Conclusion of the Official Visit of the Myanmar Foreign Minister to Bangladesh, From 23-28 April, 1992", *Ministry of Foreign Affairs, South-East Asia, Myanmar Section*, Dhaka, File No. 130, Repatriation Agreement.

৯১. KM Mohiuddin, *Rohingya*, http://www.bpedia.org/R_0217.php.

৯২. Imtiaz Ahmed (Editor*), Op.cit.*, p.3.

৯৩. ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১০৭-১০৮।

৯৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*- ৭ মে, ১৯৯২।

৯৫. *প্রাগুক্ত*- ১২ মে, ১৯৯২।

৯৬. *Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus?, Op.cit.,* p.3.

৯৭. This concern was reflected in the April 1992 decision by the United Nations Development Program (UNDP) whose governing body insisted that all programs in Burma must be directed at the grassroots and that projects must be monitored over a one-year period (rather than the usual five-year plans of action); See also, Martin Smith, *Fatal Silence? Freedom of Expression and the Right to Health in Burma* (London: Article 19, August 1996).

৯৮. The role of China was confirmed to Human Rights Watch by western and Asian diplomats in 1992. The High Commissioner's former role as Special Expert to Burma for the U.N. Commission on Human Rights under the confidential 1503 procedure in 1991, and the experience of the then UNHCR director for Asia and the Pacific,

Werner Blatter, as UNHCR representative in Rangoon during the 1976-78 repatriation, were also helpful; *Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus?, Op.cit.,* pp.16-17.

৯৯. *Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus?, Ibid,* p.18.

১০০. The repatriation had been stopped at the time because Burma had closed the border after an outbreak of bubonic plague in India. A subsequent EU report expressed concern about the difficulties of monitoring the returnees, but considered that overall the repatriation should be supported. A similar mission proposed by the US State Department was rejected by the SLORC in March 1995.

১০১. MSF France, *"The Rohingyas: Forcibly Repatriated to Burma",* September 22, 1994.

১০২. For an analysis of the unrest and violence in Bangladesh, see Human Rights Watch/Asia, "Bangladesh: Political Violence on All Sides", *A Human Rights Watch Short Report*, vol. 8, no. 6 (C), June 1996.

১০৩. In 1978 as well, the then government of Burma established a limit of 200,000, leaving some 30,000 Rohingyas to integrate locally in Bangladesh. Having done so, however, the current government has insisted to UNHCR officials and diplomats in Rangoon that more people were returned to Burma than actually left from Arakan state in 1978.

১০৪. *Interview with the UNHCR*, June 13, 1996.

১০৫. *Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus?, Op.cit.,* p.12.

১০৬. *BBC News Report*- www.bbc.com/news/world-asia-18395788-3 July, 2014.

১০৭. Abid Bahar, *"Burma's Missing Dots"* Xlibris, 2010, pp. 209-221.

১০৮. KM Mohiuddin, *Rohingya,* http://www.bpedia.org/R_0217.php.

১০৯. *দৈনিক ইনকিলাব*- ৮ আগষ্ট, ১৯৯৪।

১১০. Abid Bahar, *Op.cit.,* pp. 209-221.

১১১. For details of the protest note see, *Bangladesh in International Affairs*, *Op.cit.,* pp.13-14; Kamal Uddin Ahmed, *Op.cit.,* p. 100.

১১২. Martin Smith, *Burma: Insurgency and the politics of Ethnicity*, (The University press Limited, Dhaka, 1999), pp.77-78; Shew Lu Maung, *Burma: Nationalism and Ideology,* (UPL, Dhaka, 1989), pp. 22-23.

১১৩. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, "মায়ানমার: গণতন্ত্রের অন্বেষা", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ঢাকা, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃ.৬৭।

১১৪. উ অং জান ওয়াই (U Aung Zan Wai) ছিলেন অংসান-এর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তিনি ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত Arakan National Congress (ANC)- এর শীর্ষ নেতা ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে ANC দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং উ সিন্ডা এর (U Seinda) নেতৃত্বে Arakan People's Liberation Party (APLP) গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ANC বিলুপ্ত হয়ে AFPFL- সাথে একত্রীকরণ হয়। দ্রষ্টব্য ঃ Martin Smith, *op.cit.* pp. 80-81.

১১৫. Martin Smith, *op.cit.* p. 78.

১১৬. Martin Smith, *Ibid.*. Recognizing them as citizens gave them the ability to vote, and many voted for his party in gratitude at this recognition.

১১৭. "In actual fact, although there are 135 national races in Myanmar today, the so-called Rohingya people are not one of them. Historically, there has never been a 'Rohingya' race in Myanmar...Since the first Anglo-Myanmar war in 1824, people of Muslim faith from the adjacent country illegally entered Myanmar Naing-Ngan, particularly Rakhine State. Being illegal immigrants they do not hold immigration papers like other nationals of the country", Press release from U Ohn Gyaw, *Minister for Foreign Affairs*, February 21, 1992.

১১৮. খোঃ লুৎফুল এলাহী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১।

১১৯. Shew Lu Maung, *Op.cit.,* P.39.

১২০. খোঃ লুৎফুল এলাহী, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১২৪-১২৯।

১২১. Mohammed Yunus, *Op.cit.,* pp.149-50; National Refugee Week, The Refugee Council of Australia, 17 June, 1992, p.155.

১২২. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭০।

১২৩. মোহাম্মদ আবুল হোসেন মাহমুদ, *বার্মায় মুসলিম গণহত্যা* (ঢাকা: বর্মী মুসলিম কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটি, ১৯৭৮), পৃ.৪।

১২৪. মোহাম্মদ রুহুল আমিন অনুদিত, "বার্মার মুসলমান", তেহরান টাইমস, ২৪ মে ১৯৮৩ এর সৌজন্যে, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, তেইশ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃ. ২১৭।

১২৫. *Genocide in Burma Against the Muslim of Arakan*, published by Rohingya Petriotic Front, Arakan, Burma, pp.2-7.

১২৬. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭১।

১২৭. Statement by the Ministry for Home and Religious Affairs, November 16, 1977.

১২৮. খোঃ লুৎফুল এলাহী, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১২৪-১২৯।

১২৯. Archival Papers, File No.900. 1(4), Vol.1, p.212, *National Archives of Bangladesh*; *Our Voice, a Mouthpiece of the Rohingya Patriotic Front,* Vol.1, No.12, 1 November, 1982, pp.4-7.

১৩০. খোঃ লুৎফুল এলাহী, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১৬৫-১৮০; *Asiaweek*, Hong Kong, 25 october, 1991.

১৩১. Press Release from U ohn Gytaw, *Minister of Foreign Affairs,* The Government of Myanmar, 21 February, 1992.

১৩২. মোহাম্মদ ফারুক হোসাইন খান, *আরাকানে মুসলিম নির্যাতন*, *দৈনিক ইনকিলাব*- ২৩ এপ্রিল, ১৯৯৮।

১৩৩. *UN report on Rohingyas,* US campaign for Burma.org/about/Burma/conflict-and-human-rights/rohinga-ethnic-cleansing html-June, 2012.

১৩৪. Quoted by the Special Rapporteur to Burma, Professor Yokota, in his "Report on the Situation of Human Rights in Myanmar, prepared by Mr. Yozo Yokota, Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, in accordance with Commission resolution 1995/72," (Geneva: UNECOSOC) E/CN.4/1996/65, February 5, 1996.

১৩৫. This includes others of south Asian origin, and ethnic Chinese. The total population of immigrants is thought to be around one million people (see also Martin Smith, *Ethnic Groups of Burma)*.

১৩৬. *Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus?, Op.cit.,* pp. 26-27.

১৩৭. Article 17 of Additional Protocol 2 to the Geneva Conventions prohibits the forced relocation of civilians "unless the security of the civilians involved or imperative military reasons so demand"; Ethnicity and Nationality: Refugees in Asia, *Amnesty International*, London, U.K., October, 1997.

১৩৮. See Human Rights Watch/Asia, "The Mon: Persecuted in Burma, Forced out of Thailand," vol. 6, no. 14, December 1994; See Human Rights Watch/Asia, "Burma: Abuses Linked to the Fall of Manerplaw", vol.7, no.5, March 1995; See Human Rights Watch/Asia, "Burma: Entrenchment or Reform?" Vol. 7, No.10, July 1995; Amnesty International, "Myanmar: Human Rights Still Denied" ASA 16/18/94, November 1994; "Myanmar: No Place to Hide" ASA 16/13/95, March 1995.

১৩৯. A Muslim with full citizenship who was the assistant manager for the Myanmar Economic Holdings Bank (a bank owned by the military) in Buthidaung was called to

Rangoon by his head office in September 1992. Despite his position, the Arakan state LORC did not permit him to purchase a plane ticket in Sittwe. The same month a Muslim (not a Rohingya) veterinary surgeon, who was also working for the government, was taken ill in Buthidaung and required treatment which was only available in Rangoon. Again, despite the fact that his family were still living in Rangoon, he was not permitted to leave, and he died in Sittwe hospital.

১৪০. Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus?, *Op.cit.,* p.35.

১৪১. See Human Rights Watch/Asia, "The Mon: Persecuted in Burma, Forced out of Thailand," vol. 6, no. 14, December 1994; See Human Rights Watch/Asia, "Burma: Abuses Linked to the Fall of Manerplaw", vol.7, no.5, March 1995; See Human Rights Watch/Asia, "Burma: Entrenchment or Reform?" Vol. 7, No.10, July 1995; Amnesty International, "Myanmar: Human Rights Still Denied" ASA 16/18/94, November 1994; "Myanmar: No Place to Hide" ASA 16/13/95, March 1995.

১৪২. *Returm to Myanmar Repatriating Refugees from Bangladesh,* Information Bulletin UNHCR, June, 1995, pp. 5-6; See World Bank, "Myanmar: Policies for Sustaining Economic Reform", *Country Report,* 1995.

১৪৩. *Correspondence from UNHCR Regional office to ACFOA*, 15 September, 1995; Human Rights Documentation Unit, National Coalition Government of Burma, *Burma Human Rights Year Book 1994*, September, 1995, pp. 248-446.

১৪৪. See World Bank, "Myanmar: Policies for Sustaining Economic Reform", *Country Report,* 1995; The ratio in 1989/90 was 0.45 and in 1993/4 it was 0.59.

১৪৫. Many people in Arakan state told Human Rights Watch that since 1992 they had only been permitted to grow rice on their land, as part of the governments agricultural program. As a result, the price of vegetables had dramatically increased; *Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus?*, *Op.cit.,* p.33.

১৪৬. Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus?, *Ibid.,* p.33. Yozo Yokota, *"Situation of Human Rights in Myanmar",* (Geneva: U.N. Commission on Human Rights, February 23, 1995).

১৪৭. See Human Rights Watch/Asia, "*The Mon: Persecuted in Burma, Forced out of Thailand",* and Human Rights Watch/Asia, "*Burma: Abuses Linked to the Fall of Manerplaw".*

১৪৮. *দৈনিক ইনকিলাব*- ৬ আগষ্ট, ১৯৯৮; *UN report on Rohingyas*, US campaign for Burma.org/about/Burma/conflict-and-human-rights/rohinga-ethnic-cleansing html-June, 2012.

১৪৯. Abid Bahar, *Op.cit.,* pp. 209-221.

১৫০. For details of the protest note see, *Op.cit.,* pp.13-14; Kamal Uddin Ahmed, *Op.cit.,* p.99; হাজী এম.এ কালাম, *রাষ্ট্রহীন এক মুসলিম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা*, *দৈনিক ইত্তেফাক*- ২২ ডিসেম্বর, ২০০১।

১৫১. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৯।

১৫২. ড. মো. মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা, আগস্ট ১৯৯৮, পৃ.৭৫; *দৈনিক ইত্তেফাক*- ৪ জানুয়ারী, ১৯৯২।

১৫৩. ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৯।

১৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*- ১২ জানুয়ারী, ১৯৯২; UN report on Rohingyas, US campaign for Burma.org/about/Burma/conflict-and-human-rights/rohinga-ethnic-cleansing html- June, 2012.

১৫৫. "Brief of Myanmar Refugee Problem in Bangladesh", *Ministry of Foreign Affairs, South-East Asia, Myanmar Section*, Dhaka, File No. 102; *বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি*, ২০০১।

১৫৬. UN Nations news centre Report on Rohingyas, http://www.un.org/apps/news/story.asp?News ID=45142#VWA SV6 Nxxjs-June 2013; আজকের কাগজ- ১১ এপ্রিল, ১৯৯৭।

১৫৭. *ARANYA* (A Forestry Periodical), No.3, Bano Bhaban, Dhaka, 1994, p.5.

১৫৮. Md. Shayeed Hossain, *Bangladesh-Myanmar Relations, 1972-2010*, Unpublished Ph.D thesis, Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi, August 2014, p.143; *Interview with the UNHCR*, June 13, 1996; *দৈনিক ইত্তেফাক*- ৪ জানুয়ারী, ২০০৬।

১৫৯. Nasir Uddin (ed.), *To Host or To Hurt: Counter Narratives on Rohingya Refugee Issue in Bangladesh,* Dhaka: Institute of Culture and Development Research (ICDR)*,* 2012, p.43.

১৬০. ড. মোহাম্মদ হাননান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.পৃ. ১০৭-১০৮।

১৬১. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.*, p.149; *ARANYA* (A Forestry Periodical), *Op.cit.*, p.5; *আজকের কাগজ*- ১১ এপ্রিল, ১৯৯৭।

১৬২. খোঃ লুৎফুল এলাহী, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২০৫।

১৬৩. Nasir Uddin (ed.), *Op.cit.*, p.43.

১৬৪. Imtiaz Ahmed, "Limits of Civil Society: Rohingya Refugees, Locals and Passage to Unsettlement", *The Daily Star*, Dhaka, 20 May, 1999.

১৬৫. দৈনিক ইত্তেফাক- ১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩; দৈনিক ইত্তেফাক- ২১ মে, ২০০৯।

১৬৬. ডঃ মো. মাইমুল আহসান খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২।

১৬৭. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.*, pp.158-159; দৈনিক ইত্তেফাক- ২৬ অক্টোবর, ২০০৯।

১৬৮. UN report on Rohingyas, US campaign for Burma.org/about/Burma/conflict-and-human-rights/rohinga-ethnic-cleansing html-June, 2012.

১৬৯. UN Nations news centre Report on Rohingyas, http://www.un.org/apps/news/story.asp?News ID=45142#VWA SV6 Nxxjs-June 2013; *দৈনিক ইনকিলাব*- ২ আগষ্ট, ১৯৯৭।

১৭০. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.*, p.173.

১৭১. Md. Shayeed Hossain, *Ibid.,* pp.160-161.

১৭২. Md. Shayeed Hossain, *Ibid.,* pp.166-165.

১৭৩. Md. Shayeed Hossain, *Ibid.,* p.176.

১৭৪. Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus?, *Op.cit.,* p.4.

১৭৫. Imtiaz Ahmed, *op.cit.,* pp. 131-132.

১৭৬. Imtiaz Ahmed, *Ibid.,* p. 139.

১৭৭. *UNHCR Report on Rohinghas*, http://www.unhcr.org/pages 49c4877d6.html2013-2014.

১৭৮. Shwe Lu Maung, *Op.cit.,* p. 73.

১৭৯. David. I. Steinberg, *Burma/Myanmar what everyone needs to know*, (Oxford university press, New York, 2010), p. 12.

১৮০. David. I. Steinberg, *Ibid.*, pp. 164-165.

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ

আধুনিক যুগে প্রতিটি দেশ বা রাষ্টের সার্বভৌত্বের ধারণা শুধুমাত্র তার আঞ্চলিক সীমানার মধ্যেই সীমবদ্ধ নেই; এছাড়াও আকাশসীমা এমনকি সমুদ্রসীমার মধ্যেও তা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রই তার এলাকার 'আঞ্চলিক সমুদ্র' এবং 'আকাশসীমা'-এর ওপর সম্পূর্ণ বা একক সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকার সম্পর্কে সচেতন।[১] আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র অর্থনৈতিক সূতিকাগার-এ পরিণত হয়ে পড়ছে। অনেক বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যৎ অর্থনীতি সমুদ্রের অর্থনীতি হবে বলে জোর মতামত দিয়ে থাকেন।[২]

বঙ্গোপসাগর ভারত, বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও শ্রীলংকা এই চারটি দেশের উপকূল ছাড়িয়ে বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত। বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। ভারত ও মিয়ানমার সীমানা সংশ্লিষ্ট প্রায় ১৪৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। আর মিয়ানমার বঙ্গোপসাগরের পূর্বদিকে অবস্থিত। এর ভূমির সীমানা বাংলাদেশ, ভারত, চীন, লাওস এবং থাইল্যান্ড সীমান্তে প্রায় ৬৭৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।[৩] আর বঙ্গোপসাগরের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকায় বাংলাদেশের জনগণের বিভিন্নভাবে আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা চিহ্নিত নয়। তাছাড়া বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমার এবং ভারত উভয় দেশেরই সমুদ্রসীমা রয়েছে। তাই বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমার এবং ভারত দুদেশের অনুমতি ছাড়া কোনোভাবেই বাংলাদেশ তার আইনগত অর্থাৎ অপ্রচলিত অধিকার স্থাপন করতে পারবে না। সমুদ্রসীমা চিহ্নিত না হওয়ায় বাংলাদেশের লোকজন বঙ্গোপসাগরের সম্পদ অর্থাৎ জৈব-অজৈব সম্পদ অর্জনের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। অধিকন্তু, সমুদ্রসীমা চিহ্নিত না হওয়ায় একদিকে বাংলাদেশের জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরতে গিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় এবং অপরদিকে অন্য দেশের জেলেরা কোনরূপ বাধা ছাড়াই বাংলাদেশের প্রচুর মৎস সম্পদ সংগ্রহ করছে। এমনকি, সমুদ্রসীমা চিহ্নিত না হওয়ায় কোস্টগার্ডের পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনী তাদের নিয়মিত কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়। তাই বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমা চিহ্নিত করা মিয়ানমারের চেয়ে বাংলাদেশের বেশি প্রয়োজন। কারণ আন্দামান সমুদ্রের পাশাপাশি ভারতীয় মহাসাগর থেকেও মিয়ানমার সমুদ্র অঞ্চল পেয়েছে। যেখানে বঙ্গোপসাগরই বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্র। ফলে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ বাংলাদেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৪]

আর ঐতিহাসিকভাবেই সমুদ্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে- প্রথমত, যোগাযোগের মাধ্যম এবং দ্বিতীয়ত, জৈব ও অজৈব বিশাল সম্পদের উৎস হিসেবে। দুটি প্রক্রিয়াতেই প্রতিটি রাষ্ট্র উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয়।[৫] উপরন্তু, প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে উদ্ভূত হয়-

প্রথমত, দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তেল এবং গ্যাসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য মানুষের দুর্ভোগ, শিল্পখাতে উৎপাদন কমে যাওয়া এবং ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। সাধারণত যেখানে গ্যাস পাওয়া যায় সেখানে তেলও বিদ্যমান থাকে।

২য়ত, বঙ্গোগাপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা অঞ্চলে তেল-গ্যাস পাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। পনের বছরের মধ্যে সমুদ্র তীরবর্তী প্রযুক্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো সমুদ্র তীরবর্তী রিগগুলোর কার্যক্ষমতা তিন গুণ বৃদ্ধি এরফলে বঙ্গোপসাগরে হাজার হাজার বর্গমাইল প্রসারিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, সীমিত ভূমিতে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা কম এবং সম্পদকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনেই বিজ্ঞানীদের মতে সামুদ্রিক সম্পদ (জৈব এবং অজৈব)-এর সঙ্গে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থত, মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হলে সমুদ্র থেকে অনেক প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ করতে সক্ষম দক্ষ কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে।

৫মত, সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হলে বঙ্গেপসাগরের পশ্চিমাংশে ভারতের সঙ্গেও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণে সহায়ক হবে।[৬]

তাই বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিরসনে দুটি দেশই সম্মত হয়। আর বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের কৌশলগত ভূরাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ সুগম রাখার জন্য একটি সুষ্ঠু সমুদ্রনীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সমুদ্র আইন

আন্তর্জাতিক আইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা এই সমুদ্র আইন। সমুদ্র আইন হচ্ছে কতগুলো রীতিনীতি, প্রথা ও নিয়ম-কানুনের সমষ্টি; যেগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্র নৌ-চলাচল, খনিজ ও মৎস সম্পদ আহরণ এবং সমুদ্রের বহুমুখী ব্যবহারকরণে মেনে চলবে। এক কথায় সমুদ্রে আচার আচরণের সুনিয়ন্ত্রক-ই সমুদ্র আইন।[৭]

বিশ্বের দশ ভাগের সাত ভাগ অঞ্চল দখল করে আছে সমুদ্র। মানুষ আদিকাল থেকে নৌ-চলাচল এবং মৎস শিকারের জন্য সমুদ্রকে ব্যবহার করে আসছে। জনবিস্ফোরণের কারণে ভূমি থেকে আহরিত সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হওয়ায় স্বভাবতই মানুষ আজ ঝুঁকে পড়ছে সমুদ্রের দিকে যা খাদ্য, মুক্তি এবং খনিজ সম্পদের প্রধান উৎস বলে বিবেচিত হচ্ছে।

ভৌগোলিক আবিষ্কার শুরু হলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ সমুদ্রেও পরস্পর বিরোধী দখলের দাবি উত্থাপন করতে থাকে।[৮] মুক্ত সমুদ্রে অবাধ স্বাধীনতার (Freedom of sea) প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবেত্তা হুগো গ্রোসিয়াস (Hugo Grotius)। ১৬০৯ সালে প্রকাশিত 'মুক্ত সমুদ্র' (Mare Liborum) নামক বইতে গ্রোসিয়াস ভারত মহাসাগরে পর্তুগাল কর্তৃক ওলন্দাজ জাহাজ আটকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাখ্যা দিয়ে মুক্ত সমুদ্রের স্বাধীনতার দাবি তোলেন।[৯] অর্থাৎ উপকূল হতে যতদূর পর্যন্ত কামানের গোলা যাবে ঠিক ততদূর পর্যন্ত সমুদ্রের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব থাকবে, যার দৈর্ঘ্য ছিল তিন নটিক্যাল মাইল।[১০]

ধীরে ধীরে অন্য আইনবেত্তাগণও মুক্ত সমুদ্রে গ্রোসিয়াসের এই স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করেন। তবে তার সাথে যুক্ত হয় 'আঞ্চলিক সমুদ্র' (Territorial sea) এবং আজকের 'একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল' (Exclusive Economic Zone) এর দাবি।[১১] সমুদ্র আইনের নিয়মনীতি আন্তর্জাতিক সমাজে যেসব মামলার মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে সেগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ১৮১৭ সালে ল্যলুই (যুক্তরাজ্য বনাম ফ্রান্স), ১৮৭২ সালে আলবামা (যুক্তরাজ্য বনাম যুক্তরাষ্ট্র), ১৮৯৩ সালে বেরিংসী ফার মামলা (যুক্তরাষ্ট্র বনাম রাশিয়া) এবং আই এম এ্যালন ১৯৩০/১৯৩৫ সালে (কানাডা বনাম যুক্তরাষ্ট্র)।[১২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশ নিজ নিজ আঞ্চলিক সমুদ্রে এবং মহীসোপানে মৎস ও খনিজ সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন শুরু করে। ১৯৪৫ সালে মেক্সিকো, ১৯৪৬ সালে আর্জেন্টিনা, ১৯৪৭ সালে চিলি এবং পেরু তাদের নিজ নিজ সমুদ্রনীতি ঘোষণা দেয়। ১৯৫২ সালের ১৮ই আগষ্ট চিলি, পেরু এবং ইকুয়েডর 'সান্টিয়াগো ঘোষণা'র (Santiago Declaration) দ্বারা তাদের সমুদ্র এলাকার ২শ' মাইল খাদ্য ও সম্পদ সংরক্ষিত এলাকা বলে দাবি জানায়।[১৩]

এসব বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আইন কমিশনকে সমুদ্র আইন প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে। সে লক্ষ্যেই সমুদ্র আইনের নানাদিক বিবেচনা করে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন সমুদ্র আইনের খসড়া প্রণয়ন করে এবং আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে গ্রহণের নিমিত্তে সম্মেলন আহ্বান করে। ১৯৫৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে এপ্রিল সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী জেনেভায় সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ চারটি কনভেনশন একসাথে একই বৈঠকে গৃহীত হয়, সেগুলো হলো-[১৪]

১. আঞ্চলিক সমুদ্র ও সন্নিহিত এলাকা কনভেনশন (Convention on the Territorial sea and Contiguous zone);
২. মুক্ত সমুদ্র কনভেনশন (Convention on the High Sea);
৩. মহীসোপান কনভেনশন (Convention on the Continental Shelf); ও
৪. মৎস শিকার ও অন্যান্য জৈবিক সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক কনভেনশন (Convention on Fishing and on the Protection of Living Resources)।

এরপর অবশ্য ১৯৬০ সালের ১৬ই মার্চ থেকে ২৬শে এপ্রিল জেনেভাতে দ্বিতীয় সমুদ্র আইন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও সেটি সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[১৫] ফলে ষাট ও সত্তরের দশকে আফ্রিকার অনেক

রাষ্ট্র তাদের সমুদ্র সীমানা নিজে নিজেই বর্ধিত করতে থাকে। অমীমাংসিত বিষয়সমূহ মীমাংসা ও সমুদ্র সংক্রান্ত আইন ব্যাপকতর ও সময়োপযোগী করণকল্পে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'সমুদ্র আইন সংক্রান্ত তৃতীয় জাতিসংঘ সম্মেলন' (Third United Nations Conference on the Law of the Sea) আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেয়।[১৬]

প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন (UNCLOS - United Nations Convention on the Law of the Sea) কেবল একটি গ্রহণযোগ্য চুক্তি নয়, এটি জাতিসংঘ চার্টার-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক চুক্তি হিসাবে বিবেচিত। এটি সব সমুদ্র সম্পর্কিত নিয়মাবলীর সাংবিধানিক শক্তির ভিত্তি সরূপ। উপরন্তু, UNCLOS সমুদ্রে সারা বিশ্বের জাতিসমূহের অধিকার এবং দায়িত্ব সংজ্ঞায়িত করে, ব্যবহারগত, পরিবেশগত এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এটিকে সমুদ্র আইন কনভেনশন বা সমুদ্র চুক্তি আইনও বলা হয়। এই আন্তর্জাতিক চুক্তির ফলে ১৯৭৩-১৯৮২ সাল পর্যন্ত তৃতীয় জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন হয়। এটি গত শতাব্দীর আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা আইনের ক্ষেত্রে অন্যতম অর্জন। এই কনভেনশন সমুদ্রের সমস্ত জায়গা, আঞ্চলিক সমুদ্র, একচেটিয়া অর্তনৈতিক অঞ্চল, মহীসোপান, সমুদ্র তটরখো, সমুদ্র তলদেশের সমস্ত জৈব এবং অজৈব সম্পদ ব্যবহারে জাতীয় বিচারব্যবস্থার নিয়মবলী নির্দেশ করে।[১৭] অবশেষে ৩য় জাতিসংঘ সমুদ্র আইন সম্মেলন ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্ক এবং জেনেভাতে ১২টি অধিবেশনে (তবে ২য় অধিবেশনটি ভেনিজুয়েলার কারাকাসে এবং স্বাক্ষরদান অধিবেশনটি জামাইকার মন্টিগো বে'তে) মিলিত হয়ে তৈরি করে ৩২০ ধারা (১৭টি অংশ এবং ৯টি সংযোজনসহ) সম্বলিত জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন '৮২। সমুদ্র সংক্রান্ত সকল আইন-কানুন সম্বলিত কনভেনশনটি আজ মানব সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।[১৮]

আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশের ধারাবাহিকতায় সমুদ্রে উপকূলীয় ও অপকূলবর্তী রাষ্ট্রের এখতিয়ারগত ও সার্বজনীন অধিকার ভোগের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই সমুদ্রকে আন্তর্জাতিকভাবে কয়েকটি চিহ্নিত সীমানায় ভাগ করা হয়। যেমন-

১. সমুদ্র তটরেখা (Baseline);
২. রাষ্ট্রীয় জলসীমা (Internal/ Inland waters);
৩. আঞ্চলিক বা উপকূলবর্তী সমুদ্র অঞ্চল (Territorial Sea);
৪. সন্নিহিত বা সংলগ্ন অঞ্চল (Contiguous Zone);
৫. একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone);

১৯৫৮ ও ১৯৮২ সালের কনভেনশন অনুযায়ী সামুদ্রিক অঞ্চলগুলোর বিভিন্ন অংশ নিম্নে নকশা বা ডায়াগ্রাম (Diagram) আকারে দেয়া হলো-[১৯]

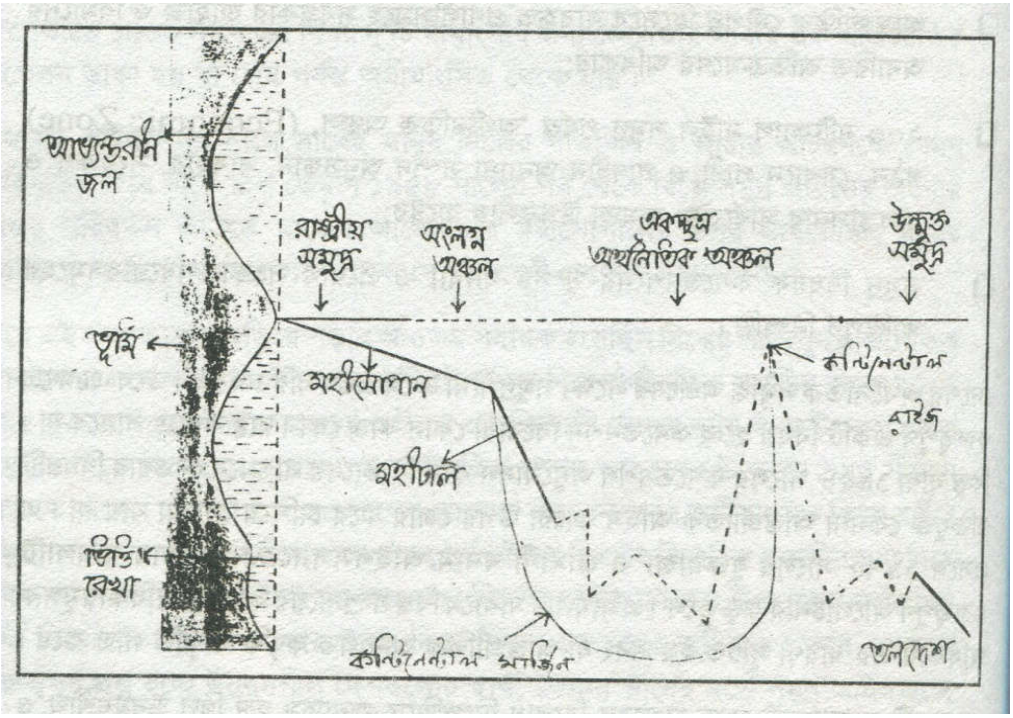

উৎস- ডঃ মিজানুর রহমান, পরিবর্তনশীল বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইন, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৩।

'৮২ সালের কনভেনশন অনুযায়ী প্রতিটি রাষ্ট্র সমুদ্রতীরের ভিত্তিরেখা বা Baseline (ধারা ৫ এ বর্ণিত হয়েছে স্বাভাবিক ও ধারা ৭ এ উপকূলীয় বিন্দুগুলো সংযুক্ত করে সরল রেখা ভিত্তিক) থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল আঞ্চলিক সমুদ্র (ধারা-৩-১৫)-এর অধিকার ভোগ করে।[২০] ২৪ নটিক্যাল মাইল সন্নিহিত বা সংলগ্ন অঞ্চল ব্যবহারের ক্ষমতা (ধারা ৩৩ (২) এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের জাহাজ, যা উপকূলীয় বা স্থলবেষ্টিত, আঞ্চলিক সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নির্দোষ গমন পথের অধিকার ভোগ করে (ধারা-১৭)। আঞ্চলিক সমুদ্রের বাইরে এবং সন্নিহিত সমুদ্রতলে খনিজ অন্বেষণ এবং শোষণ, সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার রয়েছে যা একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ-Exclusive Economic Zone) (ধারা ৫৫)।[২১] একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) ভিত্তিরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল এর বাইরে প্রসারিত হবে না (ধারা ৫৭)।[২২]

উপকূলীয় রাষ্ট্রের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) এর বাইরে ২০০ নটিক্যাল মাইল (বিশেষ ক্ষেত্রে ৩৫০ বা আরও অধিক নৌ-মাইল) এলাকায় অধিকার রয়েছে যা মহীসোপান নামে পরিচিত (ধারা ৭৬-৮৫)।[২৩] এছাড়াও মুক্ত সমুদ্রে (২০০ নৌ-মাইল এর পরের উন্মুক্ত জলরাশি) নৌ-চলাচল, মৎস আহরণ, কেবলস ও পাইপলাইন বসানো, কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি এবং গবেষণা করা (ধারা-৮৬-১১৪), গভীর সমুদ্র তলদেশের (Deep seabed) খনিজ সম্পদ (Polymetallic nodules) আহরণ (ধারা-১৩৩-১৫৮), সমুদ্র বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ (ধারা-২৩৮-২৬৫) এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন হস্তান্তর

(ধারা-২৬৬-২৭৮) অধিকার রয়েছে। '৮২ কনভেনশনের নিয়মনীতির ভিত্তিতে বিশ্বের অন্যান্য সকল উপকূলীয় রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশও নিজ সমুদ্র নীতিমালা ঘোষণা করেছে।[২৪]

বাংলাদেশের সমুদ্র আইন নীতিমালা

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে সমুদ্র আইন নীতিমালা একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। বঙ্গোপসাগরে একটি বাস্তব ও স্বচ্ছ সমুদ্র আইন নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী একটি আইন পাশ করে, যা 'আঞ্চলিক সমুদ্র এবং সামুদ্রিক এলাকা এ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ২৬নং এ্যাক্ট)' নামে অভিহিত হয়েছে।[২৫] ১৯৭৪ সালের মার্চে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক ঘোষণার মাধ্যমে নিজস্ব আঞ্চলিক সমুদ্র ১২ নৌ-মাইল, সন্নিহিত এলাকা ১২ নৌ-মাইল এবং একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা ২০০ নৌ-মাইল নির্ধারণ করে।[২৬] ১৯৭৪ সালের এ আইনে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের বিভিন্ন সমুদ্রাঞ্চলের যে রূপরেখা দেখানো হয়েছে তা নিম্নরূপ-

আঞ্চলিক সমুদ্র

সরকার গেজেটের মাধ্যমে ঘোষণা করতে পারবে উপকূল ভাগ এবং অভ্যন্তরীণ জলরাশির বাইরে আঞ্চলিক সমুদ্রের সীমা কতটুকু হবে। ঘোষণার পাদরেখাও চিহ্নিত করা হবে যেখান থেকে (ক) দুরত্ব মাপার ব্যবস্থা থাকবে; এবং (খ) এ উপকূলীয় জলভাগ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলরাশির অংশ হবে (ধারা-৩ (১)। আঞ্চলিক সমুদ্রের উপরের আকাশসীমা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ ও তলদেশের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব থাকবে (ধারা-৩ (৩)। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও নিয়ম পালন করে বিদেশী জাহাজ আঞ্চলিক সমুদ্রে নির্দোষ নৌ চলাচলের অধিকার ভোগ করবে এবং সরকার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিসরূপ যে কোনো জাহাজের নিরপরাধ অতিক্রমণে স্থগিতাদেশ জারী করতে পারবে (ধারা- ৪,৫,৬)। সরকারের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোনো বিদেশী যুদ্ধজাহাজ আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা অতিক্রম করতে পারবে না (ধারা-৭)। এছাড়া নির্দোষ নৌ-চলাচলের অধিকারী নয় এমন বিদেশী নৌ-চলাচলে বাধা দান এবং এবং এসব আইন ভঙ্গকারী বা বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি হুমকিসরূপ জাহাজের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধানও সরকার করতে পারবে (ধারা- ৮ ক,খ,গ,ঘ) ।

সন্নিহিত এলাকা

আঞ্চলিক সমুদ্রের সন্নিকটস্থ মুক্ত সমুদ্রের ৬ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এলাকা হবে বাংলাদেশের সন্নিহিত এলাকা (ধারা- ৪(১)। বাংলাদেশের সন্নিহিত এলাকায় (ক) বাংলাদেশের নিরাপত্তা; (খ) ইমিগ্রেশন ও স্যানিটেশন; এবং (গ) কাস্টমস এবং অন্যান্য আর্থিক বিষয়গুলি সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে এবং এখানে যে কোনো বাধাদান এবং লংঘনের শাস্তি বিবেচনা করে প্রচলিত রেগুলেশন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে (ধারা- ৪(২)।

অর্থনৈতিক অঞ্চল

সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আঞ্চলিক সমুদ্রের নিকটস্থ মুক্ত সমুদ্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমা ঘোষণা করতে পারবে (ধারা- ৫(১)। অর্থনৈতিক অঞ্চলের জলস্থিত বক্ষ এবং তলদেশে এবং উপরস্থ জলভাগের জৈব ও অজৈব সকল প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বাংলাদেশের একচেটিয়া অধিকার থাকবে (ধারা- ৫(২)।

সংরক্ষিত অঞ্চল

সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আঞ্চলিক সমুদ্র সংলগ্ন সংরক্ষিত অঞ্চল চিহ্নিত করে সমুদ্রের জৈবিক সম্পদের নির্বিচারে শোষণ, হ্রাস বা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পরবে (ধারা-৬)।

মহীসোপান

এ আইনে বাংলাদেশের মহীসোপান বলতে উপকূলে আঞ্চলিক সমুদ্রের বাইরে ডুবোজাহাজ এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠ ও তলদেশ, সমুদ্র-অববাহিকা এবং অতল গহ্বর পর্যন্ত যে মহাদেশীয় প্রান্ত এবং যে কোনো দ্বীপ, পাহাড় বা সে ধরনের যে কোনো ভূ-খন্ডের নিকটবর্তী এলাকাকে বোঝায় (ধারা-৭(১)। এ সম্পর্কে আরো বলা হয়, সরকারের অনুমতি বা লাইসেন্স ছাড়া কেউ মহীসোপান এলাকায় কোনো সম্পদ আবিষ্কার বা আহরণ, খোঁজা বা খনন কাজ করতে অথবা গবেষণা চালিয়ে যেতে পারবে না (ধারা-৭(৩)।

সমুদ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ

সরকার সমুদ্র দূষণ রোধ এবং সামুদ্রিক পরিবেশের মান এবং প্রতিবেশী বিষয়ক সাম্যতা বজায় রাখার জন্য যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে (ধারা-৮)।

আইন প্রণয়ন ক্ষমতা

১৯৭৪ সালের আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী সরকার এ আইনকে কার্যকরী করতে যে কোনো নীতিমালা (Rules) তৈরি করতে পারবে। একই ধারার উপ-ধারা ২-এ বলা হয় যে, এসব নীতিমালার মধ্যে থাকবে-

ক. আঞ্চলিক সমুদ্র, সন্নিহিত এলাকা, অর্থনৈতিক এলাকা, সংরক্ষিত এলাকা এবং মহীসোপানে যে কোনো ব্যক্তির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।
খ. অর্থনৈতিক অঞ্চলের সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবহার ও আহরণের জন্য যে কোনো ব্যবস্থা।
গ. সমুদ্রের জৈবিক সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা।
ঘ. মহীসোপানের সম্পদ আবিষ্কার ও আহরণের ব্যবস্থা; ও
ঙ. মুক্ত সমুদ্রে দূষণ রোধের ব্যবস্থা ইত্যাদি।[২৭]

১৯৭৪ সালে প্রথম বাংলাদেশে সমুদ্র তটরেখা নির্ধারণে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বঙ্গোপসাগরে মহাদেশীয় ভূমিরূপের (Abyssal) এবং মহীসোপানের গভীরতাকে নিয়ামক ধরে

উপকূলীয় সমুদ্রের ১০ ফ্যাদম (৬০ ফুট) গভীরতা পর্যন্ত তটরেখাকে বাংলাদেশের 'পাদরেখা বা ভিত্তিরেখা (Baseline)' হিসেবে গ্রহণ করে।[২৮] এ পাদরেখার বাইরে বাংলাদেশ তার বিভিন্ন সমুদ্রাঞ্চল নির্ধারণ করে। পাদরেখা সংক্রান্ত নীতিমালা আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশ তুলে ধরেছে। ১৯৭৪ সালের ২০শে জুন থেকে ২৯শে আগষ্ট ভেনিজুয়েলার কারাকাসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতিসংঘ সমুদ্র আইন সম্মেলনে এ পাদরেখা নির্ধারণের প্রস্তাব পেশ করা হয়। পাদরেখার জন্য যে ৮টি বিন্দু নির্ধারণ করা হয় তা নিম্নের টেবিল ১-এ দেখুন-[২৯]

টেবিল- ১

পাদরেখা	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
১	২১.২২.০০ উঃ	৮৯.০৬.৪৫ পূঃ
২	২১.১৫.০০ উঃ	৮৯.১৬.০০ পূঃ
৩	২১.২৯.০০ উঃ	৮৯.৩৬.০০ পূঃ
৪	২১.২১.০০ উঃ	৮৯.৩৩.০০ পূঃ
৫	২১.১১.০০ উঃ	৮৯.৩৩.০০ পূঃ
৬	২১.০৭.০০ উঃ	৯১.০৬.০০ পূঃ
৭	২১.১০.০০ উঃ	৯১.৫৬.০০ পূঃ
৮	২০.২১.৪৫ উঃ	৯২.১৭.৩০ পূঃ

উৎস- Foreign Ministry Circular No.Lt-1/3/74

বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ ইতিমধ্যেই নিজ নিজ সমুদ্র আইন নীতিমালা তৈরি করেছে। তাছাড়া ১৯৮২ সালের জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন গৃহীত হওয়ায়[৩০] বাংলাদেশকে মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ সম্পর্কে জাতিসংঘ সনদের ধারা ৩৩-এ বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ, যেমন আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা, অনুসন্ধান, সালিশ, বিচার বিভাগীয় সংগঠন, আঞ্চলিক সংগঠন অথবা জাতিসংঘের মাধ্যমে মধ্যস্থতার ন্যায় পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। অথবা জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন ১৯৮২ এর ১৫ নং পরিচ্ছেদের ধারা ২৭৯-২৮৫ (বিরোধ নিষ্পত্তির সাধারণ নির্দেশাবলী) এবং ধারা ২৮৬-২৯৯ (আবশ্যিক পদ্ধতিসমূহ)-এ বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ[৩১] গ্রহণ করে বঙ্গোপসাগরে নিজেদের সামুদ্রিক স্বার্থ সংরক্ষণের সকল তৎপরতা জোরদার করা বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ

সামুদ্রিক সীমানা বিরোধ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানে মতানৈক্যের উৎস এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করে। কয়েক দশক ধরে এই বিরোধ দক্ষিণ চীন সাগর (SCS- The South China Sea)-এর ওপর তর্কসাপেক্ষ বিষয় এবং দেশগুলির

পররাষ্ট্রনীতির প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই অন্যান্য বিরোধের মধ্যে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সমুদ্রসীমা বিরোধের উত্থান এশিয়ায় সামরিক এবং কূটনীতিকভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য এই বিতর্ক দক্ষিণ এশিয়ায় কৌশলগত ও কূটনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রতিনিধিত্ব করে যা অন্তত আইনত ভারত এবং চীনের সঙ্গে জড়িত, কারণ আলাদাভাবে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয় দেশই এদের প্রতি আগ্রহী। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে লক্ষ্যণীয় যে, এই বিরোধ এবং ঐতিহাসিকভাবে রোহিঙ্গা ইস্যু উত্তর-পশ্চিম মিয়ানমারের জাতিগতভাবে মুসলিম জনগণের সমস্যা পাশাপাশি দুই রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বিষয় হিসেবে উল্লিখিত হয়।[৩২]

বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ দ্বন্দ্বের অন্যতম একটি কারণ হলো দুদেশের সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত নাফ্ নদী।[৩৩] ১৯৬৬ সালের ৯ই মে নাফ্ নদী সীমান্ত (পাকিস্তান-বার্মা চুক্তি নামে অভিহিত) চুক্তি হলো অধুনা বাংলাদেশ (১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়ার আগে) এবং মিয়ানমারের মধ্যে সীমান্ত সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রথম পদক্ষেপ। উক্ত চুক্তিতে নাফ্ নদীর মধ্যস্রোতরেখার যেসব স্থানে চিহ্ন নির্ধারিত হয়েছিল সে সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকায় বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্র আলোচনায় তা বাধা হয়ে দেখা দেয়। ১৯৮২ সালের জাতিসংঘ কনভেনশন অনুসারে প্রতিটি দেশকেই তার নিজ নিজ সমুদ্র এলাকা ভাগ করে দেয়া হয়। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের এলাকা আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে ৪ ভাগে বিভক্ত। এগুলো হলো উপকূলবর্তী এলাকা, সংলগ্ন এলাকা, মহীসোপান এলাকা এবং একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ এ কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। অবশ্য এর আগেই বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স এন্ড মেরিটাইম এ্যাক্ট (The Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974)' প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে একই বছর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ আইনকে কার্যকর করে। জাতিসংঘের দেয়া মডেল অনুসারেই এই আইন প্রণয়ন করা হয়।[৩৪]

১৯৭৩ সালে ভেনিজুয়েলার কারাকাসে জাতিসংঘ আয়োজিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন সম্মেলনে বাংলাদেশ সমুদ্র বিষয়ক তার দাবি তুলে ধরতে সমর্থ হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন- Bangladesh claimed exclusive jurisdiction over the 200 mile economic zone for the exploration and exploitation of natural resources. এছাড়া তিনি সন্নিহিত অঞ্চল, সংরক্ষিত এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার ও বাংলাদেশের উপকূলভাগের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তটরেখা নির্ধারণের বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করেন। কারণ গঙ্গা নদীর মোহনা ব-দ্বীপ এমন যে, এখানে স্থিতিশীল অগভীর জলরেখা অথবা স্থলভাগমুখী ও সমুদ্রাভিমুখী সীমারেখা নেই। অনবরত পলি জমার ফলে চড়ার সৃষ্টি হয় এবং সমগ্র এলাকা এত অগভীর যে ছোট ছোট নৌকা ছাড়া এখানে অন্য কোনো জলযান চলাচল করতে পারে না।

এমন প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তটরেখা নির্ণয়ের নতুন ফর্মূলার দাবি তোলা হয়। তা হল- The baseline may be drawn from a depth not exceeding ten fathoms.[৩৫]

এরপর ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিয়ে প্রথম বৈঠক হয়। ১৯৭৪ সালের ২৩শে নভেম্বর দ্বিতীয় দফা আলোচনায় বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার দুদেশের প্রতিনিধি দলের

মধ্যে সমুদ্রসীমা নিয়ে সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (The 1974 Agreed Minutes)। মিয়ানমারে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত খাজা মোহাম্মদ কায়সার (Kwaja Mohammad Kaiser) বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং নেভি ভাইস চীফ অফ স্টাফ কমোডর চিট লিয়াং (Commodore Chit Hliang) মিয়ানমার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। '৭৪ এ্যাক্ট-এ বিশেষ চার্ট ১১৪ সংযুক্ত ছিল এবং যে সীমানা অংকিত তা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের উপকূল এবং বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন দ্বীপের মধ্যে সমান্তরাল এবং সমদূরবর্তী রেখা অনুসরণ করে।[৩৬]

এরপর ১৯৭৮ সালে মিয়ানমার থেকে প্রায় দুই লক্ষ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করায় দুদেশের সম্পর্কের অবনতি সমুদ্রসীমা সম্পর্কিত আলোচনাকেও স্পর্শ করে।[৩৭] এতে এ আলোচনাও ভেঙ্গে যায়। ১৯৭৯ সালে অবশ্য রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে পুনরায় আলোচনা শুরু হয়। ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে রেঙ্গুনে নাফ্ নদী নিয়ে একটি 'সাপ্লিমেন্টারী প্রটোকল' দুদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। প্রটোকল অনুসারে বাংলাদেশের দিকে নাইথং পাহাড় (Naithang Hill- A Traingular Station) থেকে ২১টি সীমানাচিহ্ন (Reference Marks) এবং মিয়ানমারের দিকে ১৬টি চিহ্ন স্থাপন করা হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমানা নির্ধারণ আলোচনার বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়। বৈঠকগুলোর আলোচনায় ১৯৮০ সালের প্রটোকলটিও স্থান পায়।[৩৮] ১৯৭৪-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে আঞ্চলিক সমুদ্র, একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণের জন্য পর্যায়ক্রমে আট দফা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা আহ্বান করা হয়।[৩৯] কিন্তু মিয়ানমার সম-দূরত্ব নীতিতে অটল থাকায় আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বাংলাদেশের সমুদ্র সম্পদের ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও আহরণের একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্র সীমানা চিহ্নিতকরণ। উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালের চুক্তির অধীন একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপান সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুযায়ী সব উপকূলীয় রাষ্ট্রের সমুদ্রসীমা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার পর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমুদ্র সীমানাকরণ জটিলতর হয়। অর্থনৈতিক অঞ্চল যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী হওয়ায় এ জটিলতায় অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত হয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য ১৯৮২ সালের চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পক্ষরাষ্ট্রগুলো সে নীতিমালা অনুযায়ী সীমানাকরণে ব্যর্থ হলে চুক্তিতে বর্ণিত বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সমুদ্র-আইন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য পেশ করা।[৪০]

১৯৫৮ সালের কনভেনশন অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সমুদ্রের বাইরে কিন্তু তদ্‌সংলগ্ন জলরাশির তলদেশ ও তার অন্তর্ভূমি (Subsoil) যা ২শ' মিটার জলের গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত বা তার বাইরে যে এলাকায় কারিগরী উৎকর্ষতা দ্বারা সম্পদ আহরণ সম্ভব তাই মহীসোপান।[৪১] বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের মহীসোপান প্রায় ৩৪০ মাইল বিস্তৃত, যার মোট এলাকা প্রায় ২,০২,০০০ বর্গমাইল।[৪২] সমুদ্র তীর থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সব কিছুর ওপর তটবর্তী দেশের সার্বভৌম অধিকার থাকবে। এ অঞ্চলের কেবল জল নয়, আকাশ পথেরও নিয়ন্ত্রণ থাকবে সংশ্লিষ্ট দেশের। উপকূলবর্তী সমুদ্র এলাকার প্রশস্ততা সেখান থেকে মাপা হয় ঐ ভূমি রেখা থেকে ২৪ নটিক্যাল মাইল হচ্ছে সংলগ্ন এলাকা। সমুদ্রে নিমজ্জিত মহাদেশীয় ভূমিখন্ডের অংশ হচ্ছে মহীসোপান। মহীসোপানের জন্য ঊর্ধ্ব সীমারেখা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট ভূমিরেখা থেকে সাড়ে ৩শ' নটিক্যাল মাইল। সমুদ্র তীর থেকে

মহীসোপানের ২শ' নটিক্যাল মাইল এলাকাকে বলা হচ্ছে একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল বা সংক্ষেপে ইইজেড। তট এলাকা থেকে ২শ' ও সাড়ে ৩শ' মাইলের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে সামুদ্রিক সম্পদ উত্তোলনের সার্বভৌম অধিকার কেবল তীরের দেশের। এ অঞ্চলে সব রকম অনুসন্ধান, উত্তোলন, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার কাজ, কৃত্রিম দ্বীপ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পুরো ক্ষমতা, বিভিন্ন কাঠামো স্থাপন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন তৎপরতা, পানি স্রোত, ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের পুরো অধিকার তটবর্তী দেশের।[৪৩] '৮২ সালের কনভেনশনে সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষা, সমুদ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সমুদ্রের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য একটি কাঠামো গঠন করে। কনভেনশনে বিভিন্ন সামুদ্রিক অঞ্চল, ঐ অঞ্চলে উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহের প্রতিবন্ধকতা এবং অধিকার সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা রয়েছে। কনভেনশনে সামুদ্রিক মৎস্যের টেকসই শোষণের পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক ও অ-নবায়নযোগ্য সম্পদসমূহের ওপর ব্যাপকভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।[৪৪]

৯ই এপ্রিল ১৯৭৭ সালে মিয়ানমার তার আঞ্চলিক সমুদ্র এবং সমুদ্রাঞ্চল আইন (Territorial Sea and Maritime Sea Law 1977- Law no. 3 of April 1977) পাশ করে। কারণ মিয়ানমার উপকূলীয় দেশ হিসেবে ভেনিজুয়েলার কারাকাসে তৃতীয় জাতিসংঘ সমুদ্র আইন সম্মেলনের (১৯৭৩-১৯৮২) প্রথম অধিবেশন থেকেই অংশগ্রহণ করতে থাকে।[৪৫] এছাড়া সে ১৯৮২ সালে গৃহীত জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনের অন্যতম স্বাক্ষরদাতা দেশ। উপর্যুক্ত আইন অনুযায়ী মিয়ানমার বঙ্গোপসাগরে তার বিভিন্ন সমুদ্রাঞ্চলের দূরত্ব নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রাঞ্চল সীমানা নির্ধারণ আলোচনার পাঁচটি বৈঠক বসে। ভারতের মতো মিয়ানমারও সমদূরত্ব নীতিমালার যুক্তি আলোচনায় উপস্থাপন করে। সঙ্গত কারণেই এ আলোচনাতেও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায়পরতা নীতির যৌক্তিকতা তুলে ধরে। কিন্তু আলোচনা কোনো ফলপ্রসূ অগ্রগতি ছাড়াই ভেঙ্গে যায়।[৪৬]

১৯৮৬ সালের আগে সমুদ্রসীমা নিয়ে শুধুমাত্র বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হয়েছে। দুই দশকেরও বেশি সময় পর আলোচনা পরিশেষে নভেম্বর ২০০৭ সালে শুরু হয়ে ২০০৮ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ স্বত্ত্বেও দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সমুদ্রসীমা কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল না। কারণ কোনো পক্ষই সীমানা পুনর্নির্ধারণে মৌলিক নীতির ওপর আপোষ করতে রাজী না থাকায় আলোচনার অগ্রগতি হয়নি। বাংলাদেশের আইনি যুক্তি সমতার নীতি চায় যেখানে মিয়ানমার সমদূরত্ব নীতির ব্যাবহার চায়।[৪৭]

কেননা বঙ্গোপসাগরে প্রচুর হাইড্রোকার্বন সম্পদে সমৃদ্ধ। কৃষ্ণ গোদাবরী উপত্যকায় (Krishna Godavari Basins) ভারতীয় আবিষ্কার এবং মিয়ানমারের বিশাল তেল গ্যাসের অনুসন্ধানেও এটি প্রমাণিত হয়। বঙ্গোপসাগরে দুটি প্রধান উপত্যকা কৃষ্ণ গোদাবরী (Krishna Godavari) এবং মহানদী (Mahanadi) -তে প্রায় ১৮ বিলিয়ন ব্যারেল তেল এবং সমপরিমাণ গ্যাসের সম্ভাবনা দেখানো হয়। সরকারি উৎসে এ অঞ্চলে ১শ' ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং বেসরকারি মতে, ২শ' ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের মজুদের চিত্র তুলে ধরা হয়। ২০০৭ সালের শেষের দিকে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানি এর তথ্য অনুযায়ী- মিয়ানমারের ২১.১৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট অথবা সারাবিশ্বের

০.৩ শতাংশ, যেখানে বাংলাদেশের ১৩.৭৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট অথবা ০.২ শতাংশ গ্যাসের মজুদ রয়েছে যার অধিকাংশই বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।

বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক কখনোই শক্তিশালী হয়নি। তবুও বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মজুদ গ্যাসের ওপর পরস্পরের দাবির অবসান ঘটিয়ে ইতিমধ্যে তা আবিষ্কৃত হয়। নিম্নে টেবিল ২-এ তা দেখানো হলো-

টেবিল -২

বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে প্রমাণিত প্রাকৃতিক গ্যাস (টিলিয়ন ঘনফুট)

	বিপি পরিসংখ্যান পর্যালোচনা (বছরের- শেষ ২০০৭)	প্রাকৃতিক গ্যাসের আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন (CEDIGAZ) (জানুয়ারি ১, ২০০৮)	তেল এবং গ্যাসের জার্নাল (জানুয়ারি ১, ২০০৯)
বাংলাদেশ	১৩,৭৭৩	১৩.২০৮	৫.০০০
মিয়ানমার	২১.১৮৯	২১.১৮৯	১০.০০০

Source: Energy Information Administration, "World proved Reserves of oil and Natural Gas, Most Recent Estimates," 2010.

বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয় দেশের নিকটই সমুদ্রে গ্যাস মজুদের সম্ভাব্য একটা হিসাব রয়েছে। মিয়ানমারের হিসাব অনুযায়ী, ১০-২১.৮৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে। সরকারি হিসাবে, মিয়ানমারে দেখানো হয় ৩টি সাগরমুখী এবং ১৯টি উপকূলবর্তী তেল এবং গ্যাস ক্ষেত্রে মোট গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত এবং অন্যভাবে) ৮৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যদিও প্রাপ্ত এই সংখ্যা যাচাইযোগ্য। বাংলাদেশের হিসাব অনুযায়ী, এর পরিমাণ ৫-১৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ (USGS) অনুযায়ী, বাংলাদেশের আরও অতিরিক্ত ৩২.১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। বাংলাদেশ-মিয়ানমার উভয় দেশেরই সাগরমুখী অতিরিক্ত গ্যাস আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও জরিপ কাজে পরিমাণ অনুমান করা কঠিন। নিম্নে টেবিল ৩-এ তা দেখানো হলো-[৪৮]

টেবিল ৩

বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সাগরমুখী প্রত্যাশিত গ্যাসের মজুদ মূল্যায়ন (টিলিয়ন ঘনফুট)

	সম্ভাবনা				গড়
	৯৫%	৫০%	৫%		
বাংলাদেশ	৪,৭৭৬	১৬,৫৬০	৩৬,২৪৭		১৮,১০৭
মিয়ানমার	৩,৮৮৩	১৫,০৫১	৩৫,৮০৮		১৬,৮৬৫

Source: USGS, "Bangladesh: Assessment Results Summary-Allocated Resources; and USGS, "Burma: Assessment Results Summary-Allocated Resources, 2010.

বঙ্গোপসাগরে হাইড্রোকার্বন গ্যাসের মজুদ রয়েছে যা ২০০২ এবং ২০০৭ সালে আবিষ্কৃত হয়। যেখানে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ সংকটে জর্জরিত বিদ্যুৎ ঘাটতি দূর করার শক্তির উৎস সন্ধানে নিয়োজিত, মিয়ানমার সেখানে চীন ও ভারতে তার প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করে।[৪৯] কাজেই ২০০৮ সালের শুরুর দিকে বাংলাদেশ তার সমুদ্র অঞ্চল ২৮টি ব্লকে বিভক্ত করে এবং দীর্ঘস্থায়ী গ্যাস সংকটের সমাধান করতে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর সাথে নিলামে গ্যাস সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। মিয়ানমার এর প্রতিবাদ জানায়। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ ইউএস ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে তার সমুদ্রসীমানা নির্ধারণের চেষ্টা করে; কিন্তু ভারত ও মিয়ানমারের প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সমুদ্রসীমার বিরোধ সমাধানের লক্ষ্যে ২০০৭-২০০৮ সালে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বঙ্গোপসাগরে দুই প্রতিবেশী দেশ তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ২০০৮ সালের জানুয়ারীতে সমুদ্রসীমানা পুনর্নির্ধারণ আলোচনা শুরু করে।[৫০]

২০০৮ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার প্রতিনিধিদলের মধ্যে দুদেশের সামুদ্রিক সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনায় যৌথভাবে ১৯৭৪ সালের এ্যাক্ট- এর অনুরূপ একটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়। মিয়ানমারের ইরাবতী নৌ আঞ্চলিক কমান্ডের কমোডর মং লুই (Commodore Maung Lwin) এবং বাংলাদেশ অংশে অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব এ কে মাহমুদ (A K Mahmood) '২০০৮ এ্যাক্ট বা দলিলে' স্বাক্ষর করে। ২০০৮ এ্যাক্ট এর প্রধান পয়েন্ট হলো UNCLOS ধারা ১২১ অনুযায়ী দ্বীপপুঞ্জের শ্রেণীবিন্যাস পুনর্ব্যক্ত করে যা '৭৪ এ্যাক্ট এরমধ্যে প্রস্তাবিত লাইনের ব্যাখ্যা অনুসারে নির্দিষ্ট কয়েকটি অক্ষরেখার ও অনুদৈর্ঘ্য পয়েন্ট বরাদ্দ করে।[৫১] উপরন্তু, ১৯৮২ এর ধারা ১২১ (UNCLOS, 1982) অনুযায়ী, সেন্টমার্টিন দ্বীপ নামে পরিচিত জমির অংশকে একটি দ্বীপ বিবেচনা করার প্রস্তাব করা হয়। যাহোক মিয়ানমার উপকূলে ওয়েস্টার দ্বীপ, একটি দ্বীপ বিবেচনা করা হবে না কারণ পানির অভাব ও অর্থনৈতিক জীবন বা কোনো স্থায়ী জনসংখ্যা বজায় রাখার অক্ষমতার কারণে বসবাসের অযোগ্য বিবেচনা করা হয়। উপরে উল্লিখিত UNCLOS ধারা ১২১ মতে, শুধুমাত্র জনবসতি বা তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক জীবন-ধারণ করতে সক্ষম দ্বীপপুঞ্জ, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মহীসোপানের অন্তর্ভুক্ত তাই কনভেনশনের অধীন হবে (UNCLOS, 1982)।[৫২]

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমার সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দুই কারণে উত্তেজনা ছড়ায়। প্রথমত, সমুদ্রে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের নতুন সম্ভাবনা; দ্বিতীয়ত, দুই দেশেরই প্রাকৃতিক গ্যাসের অতিরিক্ত চাহিদা। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের সম্মুখীন যা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও বিদেশী রপ্তানি বাজারে ক্রমাগত গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য গ্যাস রপ্তানি করে মিয়ানমার বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ শক্তিশালী করে চীন ও ভারতের মতো দেশের আনুকূল্য পেতে আগ্রহী।[৫৩]

২০০৮ সালের অক্টোবর মিয়ানমারের ভাইস সিনিয়র জেনারেল মং আয় (Maung Aye, Vice Senior General) বাংলাদেশ সফরে অন্যান্য বিষয়সহ সামুদ্রিক সীমানা নিয়ে আলোচনা করেন।[৫৪] ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে এক দফা এবং মিয়ানমারের সঙ্গে পাঁচ দফা অলোচনা হয়। এরমধ্যে তিন দফা তত্ত্বাবধায়ক ও দুই দফা আওয়ামী সরকারের আমলে। ভারতের সঙ্গে হয়েছে চার দফা।[৫৫]

ভারতের মতো মিয়ানমারের উপকূলও বহির্মুখী। বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমারের রয়েছে ২২০ নৌ-মাইল উপকূলরেখা, যার সমুদ্রাঞ্চলের সীমারেখা পশ্চিমমুখী হওয়ায় বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলকে অতিক্রম করে। কাজেই মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে নিজের সমুদ্রসীমানা চিহ্নিত করতে গিয়ে ভারতের মতো একই ধরনের সমস্যায় পড়ে।[৫৬]

অর্থাৎ বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকা অনেকটা ইংরেজী 'ডি' অক্ষরের মতো হওয়ায় বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালেই ঘোষণা করে সরল রৈখিক ভূমি রেখার মাধ্যমে এ সমুদ্র এলাকা চিহ্নিত হবে। সে আইনে বলা হয় বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলের সকল ধরনের খনিজ দ্রব্যের অধিকার বাংলাদেশের। এখানে গড়ে ওঠা সকল ধরনের দ্বীপের মালিকানাও বাংলাদেশের। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ কনভেনশন অন দ্যা ল অফ দি সী-এর ড্রাফটিং কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশ সমুদ্রে সরল রৈখিক ভূমিরেখার বিষয়টি উত্থাপন করে এবং জাতিসংঘ তা গ্রহণ করে। কিন্তু মিয়ানমার এবং ভারত এটি মানতে চায়নি। ১৯৮২ সালের ২৮শে এপ্রিল সমুদ্রে সরল রৈখিক ভূমিরেখা অনুসারে বাংলাদেশের অংশের বিষয়টি উল্লেখ করে ম্যাপ দিয়ে মিয়ানমার ও ভারতকে একটি চিঠি দেয়া হয়। ১৯৮২ সালের ৩০শে এপ্রিল ভারত এ বিষয়ে উত্তর দেয়। বাংলাদেশ ঐ চিঠিতে জানায় মূলত বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বেশ কয়েকটি বড় বড় নদী যে নদীগুলোর মাধ্যমে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ টন পলি সাগরে পড়েছে। সাগরে পড়া এই পলি জমে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ অংশে নতুন নতুন দ্বীপ জেগে উঠছে। সমুদ্রের উচ্চতার সে হিসেবে বিভিন্ন এলাকা চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশ সে অনুসারেই সকল এলাকা চিহ্নিত করবে। ভারত এ বিষয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা না করে আনুষ্ঠানিক আলোচনার কথা বলে। অবশ্য তারা বাংলাদেশকে দেয়া চিঠিতে সরল রৈখিক ভূমিরেখার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে। অপরদিকে মিয়ানমার বাংলাদেশের প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে যুক্তি উপস্থাপন করে বলে সমুদ্রসীমা ভূমির শেষপ্রান্ত থেকে মাপা শুরু হবে। সমুদ্রের কোনো পয়েন্ট থেকে নয়।

ফলে বাংলাদেশ থেকে পলিমাটি পড়ে জন্ম নেয়া দক্ষিণ তালপট্টি, হাড়িয়াভাঙ্গা থেকে পড়া পলি দিয়ে মাঝবাড়ী দ্বীপ, রায়মঙ্গলের মোহনায় আরেকটি দ্বীপের কারণে বাংলাদেশের ভূমিসীমারও পরিবর্তন ঘটছে। বাংলাদেশ যদি সঠিক ডাটা উত্থাপনের মাধ্যমে দাবি জানাতে পারে তাহলে দেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে সাড়ে ৩শ' নটিক্যাল মাইল।[৫৭]

সমুদ্রসীমা পরিমাপের জন্য ভিত্তিরেখা নির্ধারণ প্রশ্নেও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ও মিয়ানমারের বড় ধরনের মতপার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালের আইনে উপকূলবর্তী জলরাশির ৬০ ফুট (১০ ফ্যাদম) গভীরতায় সরলরেখা টেনে রাষ্ট্রীয় সমুদ্র ও অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিমাপ করার ব্যবস্থা রাখা হয়, যা প্রথম থেকেই ভারত ও মিয়ানমার প্রত্যাখান করে আসছে। এ পদ্ধতি ১৯৮২ সালের চুক্তিতেও স্বীকৃতি লাভ করেনি। চুক্তিতে সাধারণভাবে ভাটার সময় উপকূলের নিম্নতম জলরেখাকে ভিত্তিরেখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উল্লেখিত দুটি মতপার্থক্য বাংলাদেশের অজানা ছিল না। যেহেতু বাংলাদেশের ভিত্তিরেখা নির্ধারণের পদ্ধতি আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতি লাভ করেনি এবং যেহেতু সীমানাকরণের প্রথম ও প্রধান পদ্ধতি

হিসাবে সমদূরত্ব পদ্ধতি বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে না। ফলে বাংলাদেশের প্রয়োজন আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃত ন্যায়পরতা পদ্ধতি প্রয়োগে প্রতিবেশীদের রাজি করানো।

বাংলাদেশের উপকূল অধিকতর ভগ্ন, অগভীর, অস্থিতিশীল ও অবতল (Concave); অর্থাৎ ধনুকের মতো ভেতরের দিকে বক্রতাযুক্ত। তদুপরি বাংলাদেশের অধিকাংশ উপকূলীয় জনগোষ্ঠী জীবিকার জন্য যুগ যুগ ধরে সমুদ্রে মাছ শিকার ও স্থানীয়ভাবে অন্যান্য সমুদ্র সম্পদ আহরণের ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সীমানা চিহ্নিতকরণে ন্যায়পরতা নীতিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। অন্যদিকে যান্ত্রিকভাবে সমদূরত্বনীতি প্রয়োগ করলে ভারত ও মিয়ানমারের উপকূল উত্তল (Convex) অর্থাৎ বৃত্তের মতো ক্রমোন্নত তলবিশিষ্ট হওয়ার কারণে এমন অনেক এলাকাই ভারত ও মিয়ানমারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে যার ওপর বাংলাদেশের ঐতিহাসিক দাবি রয়েছে। এবং এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্ভরশীল।

ভারত ও মিয়ানমার উভয় রাষ্ট্রই চায় অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানের সীমানাকরণের ক্ষেত্রে সমদূরত্ব নীতির প্রয়োগ, যা কোনোভাবেই বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে না। এটিই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ও মিয়ানমারের সীমানাকরণ আলোচনায় অচলাবস্থার মূল কারণ। ঢাকায় নভেম্বর '০৮ সমাপ্ত বাংলাদেশ-মিয়ানমার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার এটিই মূল কারণ ছিল।

২০০৮ সালের ১৭ই অক্টোবর বাংলাদেশ কর্তৃক ঘোষিত সমুদ্র অঞ্চলের কয়েকটি ব্লকে মিয়ানমারের যুদ্ধজাহাজ এবং গ্যাস অনুসন্ধানের রিগ বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের জলসীমায় অনুপ্রবেশের পর দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। বাংলাদেশের দাবি মিয়ানমার সমুদ্রের সার্বভৌম বিচারব্যবস্থা লঙ্ঘন করেছে; যা ছিল দুই দেশের মধ্যে চিহ্নিত প্রথম কূটনৈতিক সমস্যা। অবশেষে, বাংলাদেশের কূটনৈতিক চাপে মিয়ানমার তাদের জাহাজগুলি প্রত্যাহার করে নেয়।

কাজেই বাংলাদেশের সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যেই সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে বদ্ধপরিকর ছিল। বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ন্যায়পরতানীতিই যে অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং উল্লেখিত পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বে এটিই যে একটি স্বীকৃত ও আইনসিদ্ধ পন্থা তা আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত একাধিক মামলার রায়ে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৮২ সালের চুক্তিতেও অনুরূপ পরিস্থিতিতে ন্যায়পরতাভিত্তিক সীমানাকরণের কথা বলা হয়েছে।[৫৮] গুরুত্বপূর্ণ দুই প্রতিবেশী দেশের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি জটিলই শুধু নয়, স্পর্শকাতরও বটে।

সমদূরত্ব ও ন্যায্যভিত্তিক এই দুই পদ্ধতির সমন্বয়ে দুই দেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসনের জন্য বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের প্রধান রিয়ার এডমিরাল (অবঃ) মো. খুরশীদ আলম এবং মিয়ানমারের উপরাষ্ট্রমন্ত্রী ইউ মং মিং উপস্থিত ছিলেন। ২০০৮ সালে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিয়ে জাতিসংঘে নালিশ জানায় বাংলাদেশ। এর পরই আলোচনায় বসার আগ্রহ দেখায় মিয়ানমার। ১৯৮২ সালে জাতিসংঘ সমুদ্র কনভেনশন আইন (UNCLOS) প্রণীত হলেও ১৯৯৫ সালে ভারত, ১৯৯৬ সালে মিয়ানমার এবং ২০০১ সালে বাংলাদেশ এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশ তখনো তাদের দাবিনামা পেশ করেনি। তাই পেট্রোবাংলা ২০০৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী সমুদ্র অঞ্চলকে ২৮টি ব্লকে (৮টি অগভীর ও ২০টি গভীর) ভাগ করে বাংলাদেশের গভীর ও অগভীর সমুদ্রে গ্যাস ব্লকের মানচিত্র

প্রকাশ করে তৃতীয় দফা বিডিং এর সিদ্ধান্ত নেয় এবং তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ১৫ই ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে। ভারত এবং মিয়ানমার এই ঘোষিত ব্লকগুলো তাদের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমার অধীন দাবি করলে ২০০৯ সালের ৮ই অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার UNCLOS-এর ৭ ধারা অনুসারে ভারত ও মিয়ানমার ঘোষিত সমুদ্রসীমার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে।[৫৯]

২০০৯ সালের মে মাসে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি মিয়ানমার সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে বৈঠক চলাকালে সমুদ্রসীমার ইস্যু উত্থাপিত হয়। বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয়ই সামুদ্রিক ভিত্তিরেখা এবং একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্ধারণে সমস্যার জন্য আইনি নীতির কার্যধারায় ইস্যু ধরে সক্রিয়ভাবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ITLOS- The International Tribunal for the Law of the Sea) এর মাধ্যমে সমাধানের ঐক্যমত্যে পৌঁছায়।[৬০] তারা উভয়ই সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন স্বাক্ষরকারী হিসেবে জাতিসংঘে তাদের দাবি জমা দেওয়ার পরিকল্পনা করে। ১৯৭৪ সালের জাতিসংঘের 'কনভেনশন অন দ্য ল অফ দ্য সি' নির্দেশ অনুযায়ী মিয়ানমার ২০০৯ সাল এবং বাংলাদেশ ২০১১ সাল পর্যন্ত সমুদ্রসীমার দাবি জমা দেয়ার সময় পায়।[৬১]

২০০৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে বাংলাদেশ সরকার আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুসাারে, ভারত ও মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে একই দিনে প্রায় একই সময়ে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মিয়ানমার দূতাবাস ও ভারতীয় হাইকমিশনে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক পত্র দেয়া হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যখন রাষ্ট্রদূতদের কাছে চিঠি হস্তান্তর করা হয়, তখন তার অনুলিপি সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট মিশনেও হস্তান্তর করা হয়। পররাষ্ট্র সচিব মিজারুল কায়েস প্রথমে ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেন। তবে, ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে বিষয়টি প্রকাশ করার আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপুমণি টেলিফোনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণার সঙ্গে এ নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। এরপরই পররাষ্ট্রসচিব পিনাক রঞ্জনের কাছে চিঠি হস্তান্তর করেন। পরে মিয়ানমারই সালিশি আদালতের পরিবর্তে 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর ল অব দ্য সি (ITLOS- The International Tribunal for the Law of the Sea)'- এ যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। বাংলাদেশ তা মেনে ভারতকেও ইটলস-এ যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। দিল্লি (ভারত) তাতে রাজি হয়নি। মিয়ানমার ইটলস-এর প্রক্রিয়ার অংশ নেওয়ার তিন মাস পরে আকস্মিকভাবে সরে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালায়। জার্মানীতে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত ২০১০ সালের ১৪ই জানুয়ারী ইটলস-এ পত্র দেয়। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল মিয়ানমারের যুক্তি অগ্রাহ্য করে।[৬২]

অমীমাংসিত সমুদ্র এলাকা সম্পূর্ণ অধিকারে আনতে বাংলাদেশকে ২০১১ সালের মধ্যে জাতিসংঘে যেতে হয়। প্রস্তুতি অনুসারে তথ্য উপাত্ত হিসেবে গভীর সমুদ্রে পানির ঢেউ, জোয়ার ভাটা, তট রেখা, মাটির অবস্থানসহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে জার্মান, ফ্রান্সসহ কয়েকটি দেশকে দিয়ে গভীর সমুদ্রে বেশ কয়েকটি জরিপ চালায়। এছাড়া বাংলাদেশের কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানও নানারকম জরিপ চালায়।[৬৩]

সমুদ্র আইনের আওতায় তিনটা আদালত আছে। জার্মানিতে অবস্থিত 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর ল অব দ্য সি (ইটলস)'। কিন্তু ইটলস-এ যেতে ভারতের সম্মতির দরকার ছিল। বাংলাদেশের নীতি

নির্ধারকদের ধারণা ভারত তাতে রাজি ছিল না। পাকিস্তানের সঙ্গে 'রান অব কুচের' মামলায় হেরে যাওয়ার পর ভারত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা আর আদালতে যাবে না। দ্বিপক্ষীয় আলাপ-অলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহা করবে। দ্বিতীয় বিকল্প 'ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে)'- এ যাওয়া। ভারতকে সেখানেও নেয়া সম্ভব ছিল না, কারণ সেখানে তারা যাবে না বলে আগেই আপত্তি দিয়ে রেখেছিল। মিয়ানমারও সেখানে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল। তাই বাকি থাকে 'আরবিট্রেশন বা সালিশ আদালত'। অনেক ভেবেচিন্তে বাংলাদেশ সেখানে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ আগে আপত্তি না জানিয়ে রাখলে কোনো পক্ষের নোটিশ প্রদান বা মামলা দায়েরের উদ্যোগের পরে তা এড়ানোর উপায় থাকে না।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে মিয়ানমার মহীসোপানের বিষয়ে দাবিনামা পেশ করে। ২০০৯ সালের ১১ই মে ভারত দাবিনামা পেশ করে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল যে, ভারত তার দাবিনামায় মিয়ানমারেরর জন্য একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য তারা সাগরের ওই এলাকায় কোনো ধরনের বরাদ্দ রাখেনি। অন্যদিকে সমুদ্র আইনের আওতায় বাংলাদেশের দাবি পেশের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছিল। মহীসোপানের দাবি মিয়ানমারের আগে দিতে পারলে হামবুর্গ থেকেই বাংলাদেশ হয়তো চূড়ান্ত সুরাহা পেত।[৬৪]

'৮২ সালের UNCLOS-এর ৭ম অনুচ্ছেদ অনুসারে ২০০৯ সালের ৮ই অক্টোবর বাংলাদেশ সালিসী আদালতের পরিবর্তে জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর ল অব দ্য সি বা ইটলস (ITLOS-International Tribunal for Law of the Sea)'-এ মিয়ানমারের বিরুদ্ধে সালিশী কার্যক্রম শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক সমুদ্র, একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড) এবং মহীসোপান (সিএস)- এর জন্য সমুদ্রসীমা নিরাপদ করা।[৬৫]

২০০৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ ইটলস-এ মামলা দাখিল করে এবং এটি ইটলস-এর ১৬তম মামলা হিসাবে বিবেচিত হয়। এরপর এই বিরোধ নিষ্পত্তিতে ইটলস-এর বিচারিক এখতিয়ার মেনে নিতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে মতৈক্য হয়। ২০১০ সালের ১লা জুলাই বাংলাদেশ এবং ১লা ডিসেম্বর মিয়ানমার নিজেদের পক্ষে তাদের সব দালিলিক প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করে। মিয়ানমারের দাবির বিপক্ষে ২০১১ সালের ১৫ই মার্চ বাংলাদেশ বক্তব্য উপস্থাপন করে। ২০১১ সালের ১লা জুলাই বাংলাদেশের যুক্তির বিপক্ষে মিয়ানমার তাদের বক্তব্য তুলে ধরে। ২০১১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দুই দফায় মৌখিক শুনানিতে নিজেদের পক্ষে দাবিগুলো তুলে ধরে।[৬৬] এরফলে দুদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।

বাংলাদেশের দাবি ছিল বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল আঞ্চলিক সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল মহীসোপান থেকে ভেতরে এবং বাইরের দিকে নির্ধারণ করতে। এ ক্ষেত্রে ট্রাইবুন্যালের সামনে পূর্বে নির্ধারিত মামলা এবং উত্থাপিত কিছু ইস্যু ছিল-

- ১২ নটিক্যাল মাইল আঞ্চলিক সমুদ্র এর সীমানির্দেশ এবং UNCLOS-এর ১৫নং অনুচ্ছেদটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ঐতিহাসিক শিরোনাম (যদি থাকে)-এর ক্ষেত্রে সমদূরত্বের সমন্বয় দ্বারা সীমানা নির্ধারণ কার্যকর করে।

- ২০০ নটিক্যাল মাইল একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মহীসোপান-এর জন্য UNCLOS-এর অনুচ্ছেদ ৭৪ অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান অর্জনের মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যা কার্যকরীভাবে দলগুলোর উপকূলবর্তী অঞ্চলে নির্ধারিত মূল বিন্দু থেকে একটি সাময়িক সমদূরত্ব রেখা অঙ্কন করে। এবং তারপর প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতিতে রেখাটি 'সমতা' নিশ্চিত করতে সামঞ্জস্য করে।
- অনুচ্ছেদ ৮৩ অনুযায়ী মহীসোপানের ২০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে সীমানির্ধারণে ক্ষেত্রে ৭৪ অনুচ্ছেদের মত একই বিধান প্রদান করে।
- সীমানির্ধারণে ট্রাইব্যুনালের এক্তিয়ার সাধারণত, মহীসোপানের সীমার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৭৬ অনুযায়ী মহীসোপানের ২০০ কিলোমিটার পরে সীমানির্ধারণে মূলতবির প্রস্তাব; বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা ২০০ নটিক্যাল অতিক্রম করলে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে "বিচ্ছিন্ন (Cut off)" দ্বিপক্ষীয় সীমানা হতে পারে।
- অবশেষে, সমতাবিধি নির্ধারণের মাধ্যমেই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাসঙ্গিক সমুদ্রসীমার সমাধান করা হয়।[৬৭]

যাহোক, ২০১২ সালের ১৪ই মার্চ ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর ল অব দ্য সি-র রায়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে দীর্ঘ কয়েক দশকের সমুদ্রসীমার বিরোধ মীমাংসিত হয়। এই রায় শুধু বাংলাদেশ-মিয়ানমারের জন্যই নয় আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা আইনের ইতিহাসে মাইলফলক।[৬৮]

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা মামলার রায় এবং জয়, পরাজয়

২০১২ সালের ১৪ই মার্চ জার্মানীর হামবুর্গ শহরে অবস্থিত সমুদ্রবিষয়ক জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সমুদ্রসীমা বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির রায় প্রদান করেন। ১৫১ পৃষ্ঠাব্যাপী ৫০৬টি অনুচ্ছেদের এই রায়। ২১-১ ভোটে স্বীকৃত এই ১৫১ পৃষ্ঠার রায় ইটলস-এর সভাপতি জোসে লুই জেসাস (JOSE LUIS JESUS) পড়ে শোনান।[৬৯] রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সীমানা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়।

ট্রাইব্যুনালের ৫০৬টি ধারা সংবলিত রায়ে সালিশি আদালত গঠন বিষয়ে বিবরণ দেওয়ার পরই রয়েছে উভয় পক্ষের দাবিনামার বিবরণ। উভয় পক্ষের সম্মতিতে গঠিত সালিশি আদালত সেই সমাধানই দেন, যা দুই পক্ষের মধ্যে আপসে সম্ভব ছিল না। অতঃপর আদালতের রায় উভয় পক্ষই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সালিশি আদালতের এই রায়ে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে নীতিগত ও অধিকারগতভাবে জয়ী হয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরাজিত হয়েছে, যে ক্ষেত্রে মিয়ানমারের জয় হয়েছে।[৭০]

বিরোধ নিষ্পত্তির করার জন্য সালিশি আদালতের কাছে বাংলাদেশের দাবি ছিল যে, সমুদ্রসীমা বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন UNCLOS III অনুযায়ী সমুদ্রতট থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানের সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি ট্রাইব্যুনালের (ইটলস) এখতিয়ারে পড়ে (রায়ের

অনুচ্ছেদ ৪১, ৪২, ৪৩)। মিয়ানমার সমুদ্রসীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে ইটলস-এর এখতিয়ার সম্পর্কে সম্মতি জানালেও বলে, বর্তমান ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা ঠিক হবে না (রায়ের অনুচ্ছেদ ৪৪, ৪৫)। ট্রাইব্যুনাল উভয় দেশের কথা শুনে প্রথমে মহীসোপানের ২০০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড)-এর সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেন (রায়ের অনুচ্ছেদ ৪৯, ৫০)।[৭১] এটি ছিল বাংলাদেশের প্রাপ্তি।

১৯৭৪ এবং ২০০৮ সালে সমঝোতা চুক্তি পুনর্ব্যক্ত করে সমুদ্রের ভিত্তি ধরে বাংলাদেশ ট্রাইব্যুনালকে আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করে (রায়ের অনুচ্ছেদ ৫৭, ৫৮)।[৭২] মিয়ানমার এতে আপত্তি করে বলে (রায়ের অনুচ্ছেদ ৬৫), ওই সমঝোতা চুক্তিগুলো জাহাজ চলাচলবিষয়ক সীমানা নির্ধারণের চুক্তি নয় বা ওই কাজ যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা হয়নি (রায়ের অনুচ্ছেদ ৮৩)। ট্রাইব্যুনাল মিয়ানমারের যুক্তির প্রতি সমর্থন জানায় (রায়ের অনুচ্ছেদ ৯২, ৯৩, ৯৮)। বাংলাদেশ ওই চুক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে নানা প্রমাণ দেখালেও (রায়ের অনুচ্ছেদ ১০১, ১০২, ১০৩) মিয়ানমার তা অগ্রাহ্য করে (রায়ের অনুচ্ছেদ ১০৭, ১০৮, ১০৯)। ট্রাইব্যুনালও বাংলাদেশের দাবি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি (রায়ের অনুচ্ছেদ ১১৫, ১১৮, ১২৫)। মিয়ানমার বলে, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ তার স্থলসীমানার (নাফ্ নদী) ভেতরে পড়ে, তাই একে পৃথকভাবে দেখা হোক (রায়ের অনুচ্ছেদ ১৩১, ১৩২)।[৭৩] ট্রাইব্যুনাল মিয়ানমারের যুক্তিকে মেনে নিয়ে সেন্টমার্টিন দ্বীপকে মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ধরে বাংলাদেশকে সর্বাধিক ১২ নটিক্যাল মাইল (১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার) রাষ্ট্রীয় সমুদ্রে অধিকার প্রদান করেন (রায়ের অনুচ্ছেদ ৩৩৭)।[৭৪] ফলে বাংলাদেশ সমুদ্রতটের দক্ষিণ সীমানা সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ থেকে মূল ভূ-খন্ডে টেকনাফের কাছে সরে আসে। ফলে বাংলাদেশ তার ভূ-খন্ড হারায়। এ বিষয়ে রায়ে প্রস্তাবিত পৃষ্ঠা নং-৫৪ এবং ৫৭ অনুসারে দুটি মানচিত্র নিম্নে দেওয়া হলো-[৭৫]

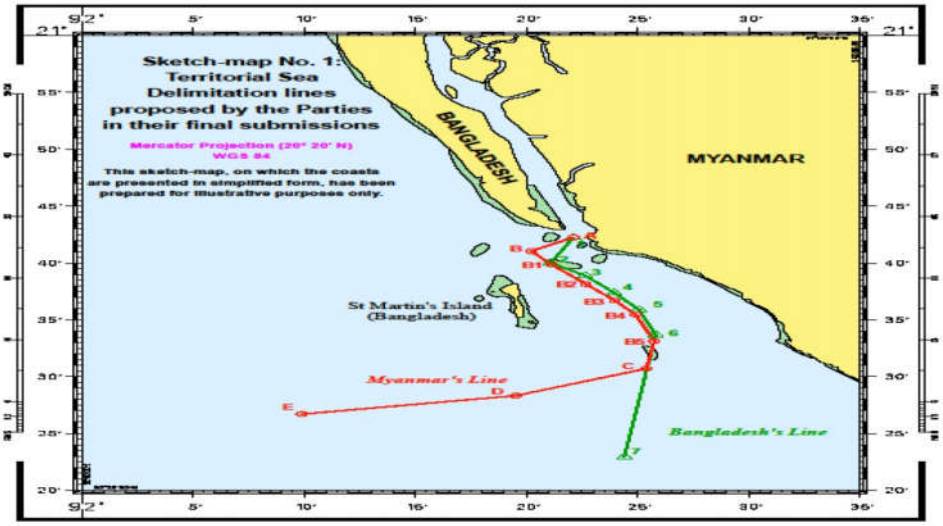

Source: Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar), Judgment, *International Tribunal for the Law of the Sea,* Case No. 16, 2012, p. 54.

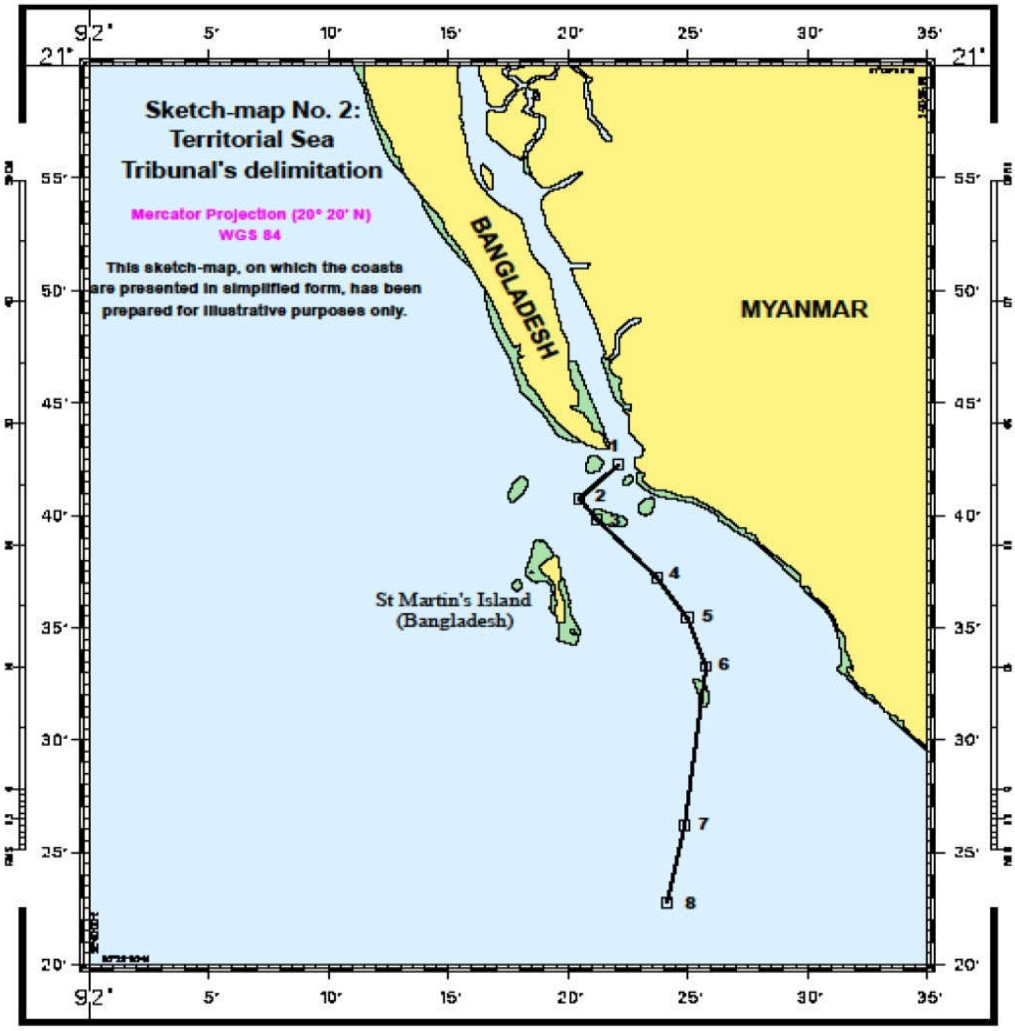

Source: Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar), Judgment, *International Tribunal for the Law of the Sea,* Case No. 16, 2012, p. 57.

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের ইইজেড নির্ধারণে সমদূরত্ব রেখা নির্ধারণের পূর্বে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের তটরেখা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে। ট্রাইব্যুনাল মেঘনা নদীর প্রবাহ বিবেচনা করে বাংলাদেশের জন্য পশ্চিমে মান্দারবাড়ী দ্বীপ থেকে পূর্বে কুতুবদিয়া দ্বীপ পর্যন্ত এবং উত্তরে কুতুবদিয়া থেকে দক্ষিণে টেকনাফ পর্যন্ত মোট দুটি তটরেখা প্রতিষ্ঠা করে (রায়ের অনুচ্ছেদ ২০২)।[৭৬] মিয়ানমার টেকনাফ থেকে সমুদ্রসীমার সমদুরত্ব রেখাটি মোটামুটি ২৩২০ আজিমুথ (Azimuth) বরাবর টানার দাবি জানায় (রায়ের অনুচ্ছেদ ২৬৮)। বাংলাদেশ এতে আপত্তি জানিয়ে (রায়ের অনুচ্ছেদ ২৬৯) বলে, বাংলাদেশের অবতল (Concave) সাগরতটের কারণে এ ধরনের সমদূরত্ব রেখা ভেতরের দিকে টেনে আনবে (রায়ের অনুচ্ছেদ ২৭৯) এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল দৈর্ঘ্য পেরোতে দেবো না (Cut off Effect)। ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশের দাবি বিবেচনায় এনে (রায়ের অনুচ্ছেদ ২৯৭) সমদূরত্ব

রেখাটিকে দক্ষিণে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় (রায়ের অনুচ্ছেদ ৩২৯)। ট্রাইব্যুনাল বিবেচনা করে যে, সমদূরত্ব রেখাটি ২১৫০ আজিমুথ বরাবর প্রলম্বিত হলে বাংলাদেশ কাট অব এফেক্টের সম্মুখীন হবে না (রায়ের অনুচ্ছেদ ৩৩৪)। অতঃপর ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশের অবতল সমুদ্রতটের বিষয়টি বিবেচনায় এনে সমদূরত্ব রেখাটি ২১৫০ আজিমুথ বরাবর সরিয়ে উভয় দেশের তটবর্তী ২০০ নটিক্যাল মাইল ইইজেড এলাকা ভাগ করে দেয় (রায়ের অনুচ্ছেদ ৩৪০)। এটি ছিল বাংলাদেশের প্রাপ্তি। এ বিষয়ে রায়ের পৃষ্ঠা নং ৬৭ এবং ৮৪ অনুসারে মানচিত্র নিম্নে দেওয়া হলো-

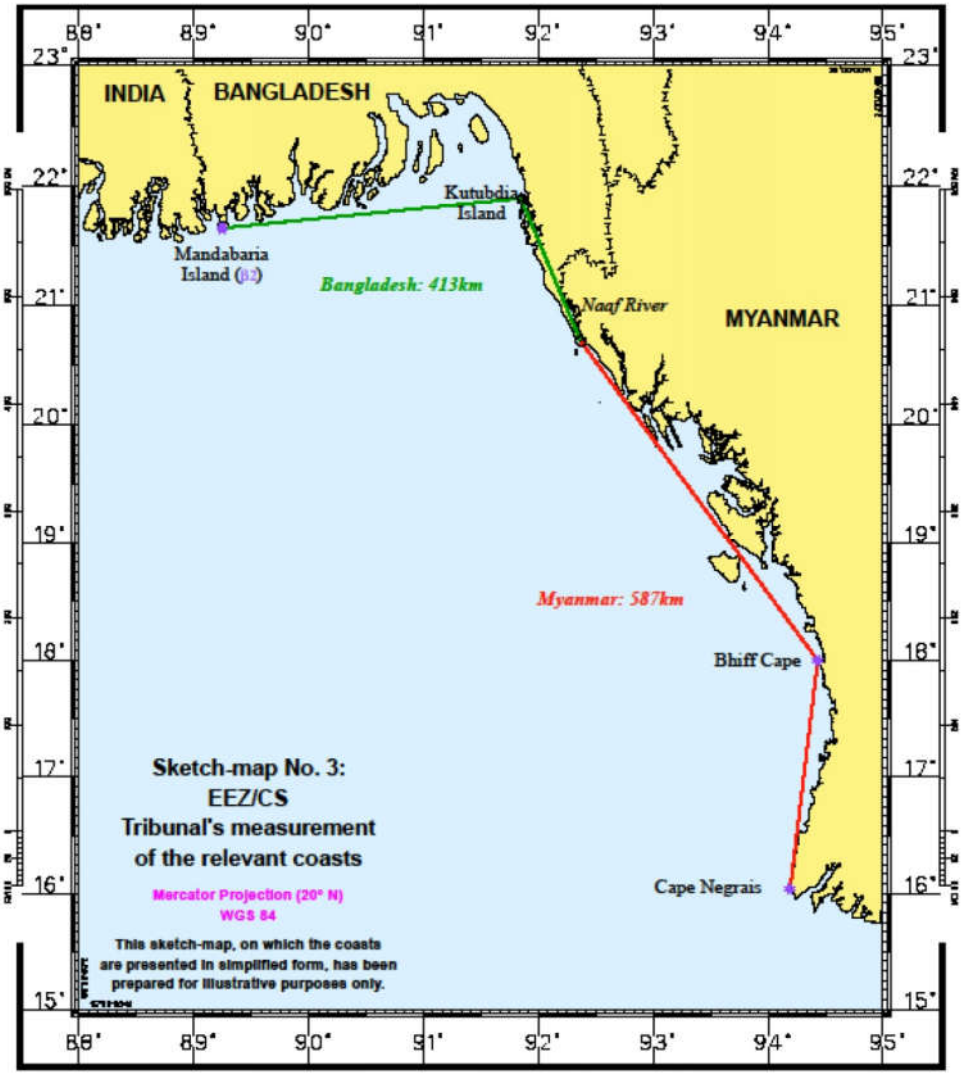

Source: Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar), Judgment, *International Tribunal for the Law of the Sea,* Case No. 16, 2012, p. 67.

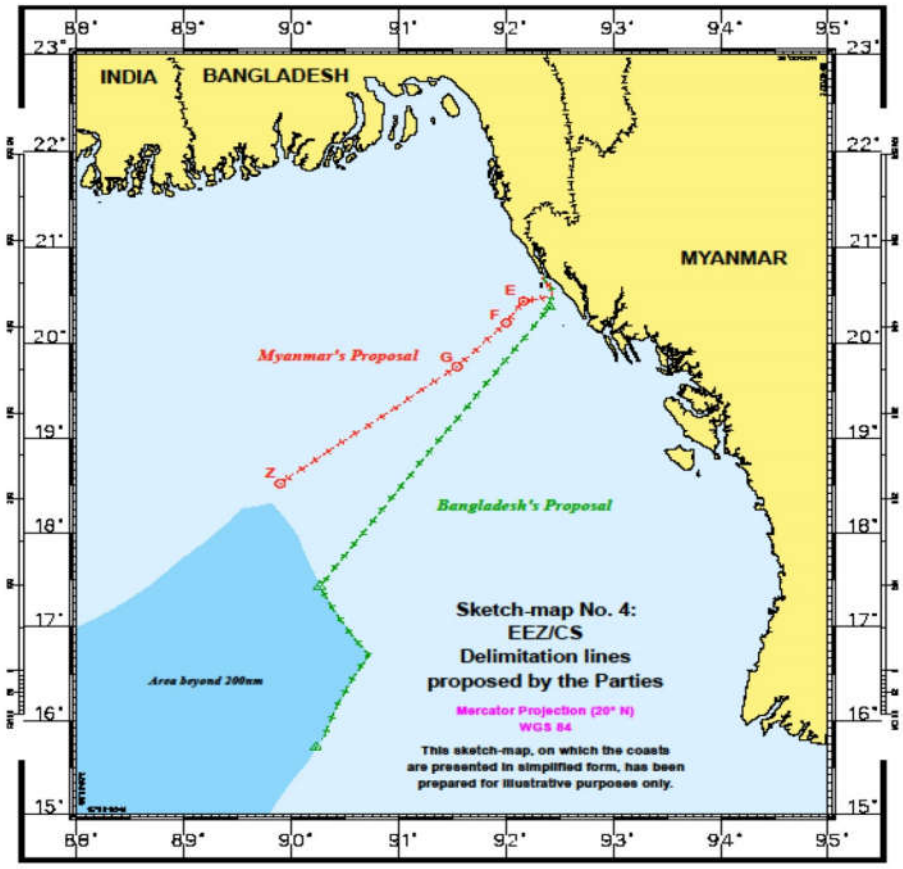

Source: Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar), Judgment, *International Tribunal for the Law of the Sea,* Case No. 16, 2012, p. 84.

মিয়ানমারের দৃষ্টিতে, ১৯৮২ সালে কনভেনশন গ্রহণের পর "সীমানা নির্ধারণের আইনটি যথেষ্ট উন্নত এবং আরো সুনির্দিষ্ট হয়েছে"। মিয়ানমারের যুক্তি হলো যে, বাংলাদেশের এখনও একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মহীসোপানের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালা সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা এবং সন্দেহ রয়েছে। মিয়ানমার আরও বলে, ১৯৮২ সালের মহীসোপান সম্পর্কিত আইনের চেয়ে ১৯৬৯ সালের আইন আরও ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলাদেশ কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে গত ৪০ বছরে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করে যাচ্ছে (রায়ের অনুচ্ছেদ ২১৮)।

বাংলাদেশ ট্রাইব্যুনালের কাছে উভয় দেশের ইইজেড নির্ধারণের জন্য সমদূরত্ব নীতি প্রয়োগের বিরোধিতা করে (রায়ের অনুচ্ছেদ ২১৬)। কিন্তু মিয়ানমার সমদূরত্ব নীতি অবলম্বনের কথা বলে (রায়ের অনুচ্ছেদ ২১৮, ২২৩)। ট্রাইব্যুনাল নদীর মুখকে সমদূরত্ব রেখা শুরুর বিন্দু সাব্যস্ত করে রায়ের (অনুচ্ছেদ ২৭২)। বাংলাদেশ UNCLOS II-এর ৭৬.১ ধারার পলিপাতন নীতি দাবি করলেও (রায়ের অনুচ্ছেদ ২৭৬, ২৭৭) ট্রাইব্যুনাল সমদূরত্বের নীতিই গ্রহণ করেন (রায়ের অনুচ্ছেদ ২৯৩)। বাংলাদেশ বঙ্গীয় সমুদ্রে পলিপাতনের বিবরণ দিলে (রায়ের অনুচ্ছেদ ৩২০) মিয়ানমার তার ওপর

আপত্তি জানায় (রায়ের অনুচ্ছেদ ৩২১)। ট্রাইব্যুনাল মিয়ানমারের দেওয়া আপত্তি গ্রহণ করে বাংলাদেশের যুক্তি অগ্রাহ্য করে (রায়ের অনুচ্ছেদ ৩২২)। এটি ছিল বাংলাদেশের পরাজয়। এ বিষয়ে রায়ের পৃষ্ঠা নং ৮৬ এবং ১০২ অনুসারে মানচিত্র নিম্নে দেওয়া হলো-[৭৭]

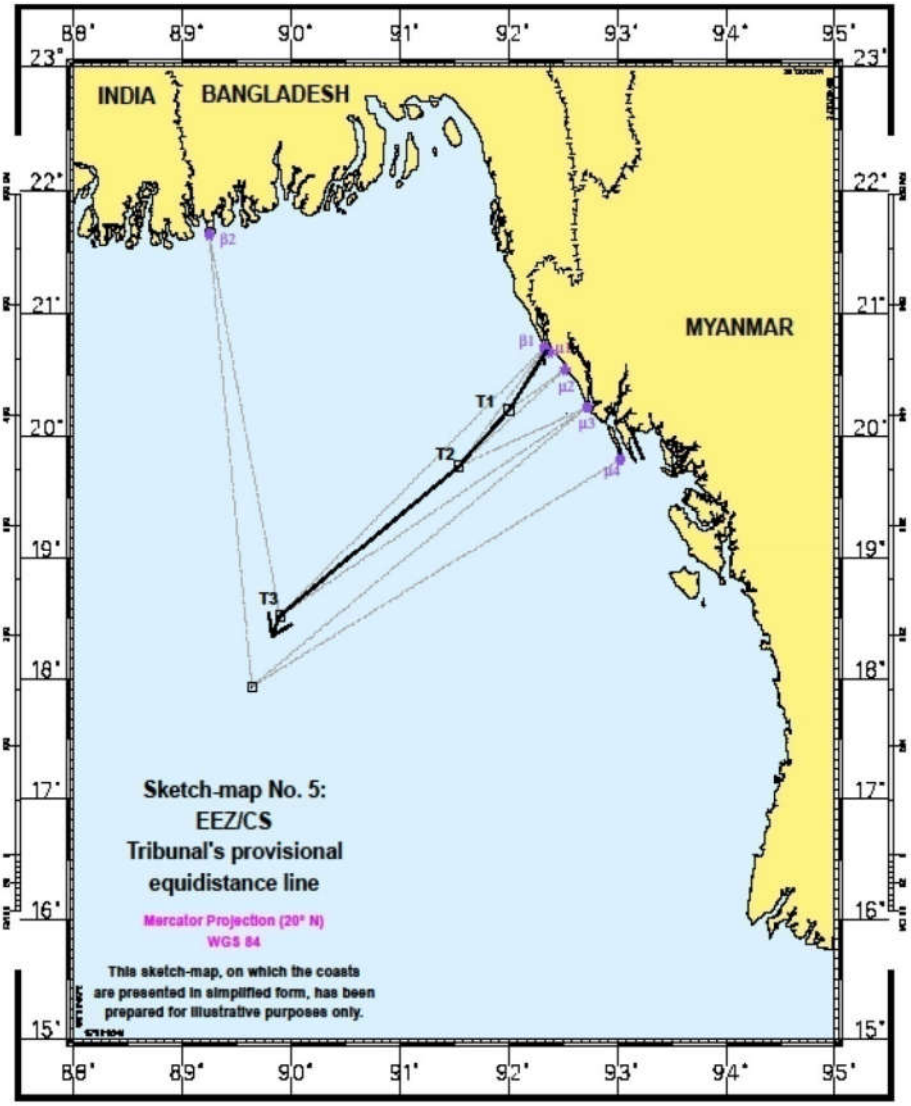

Source: Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar), Judgment, *International Tribunal for the Law of the Sea,* Case No. 16, 2012, p. 86.

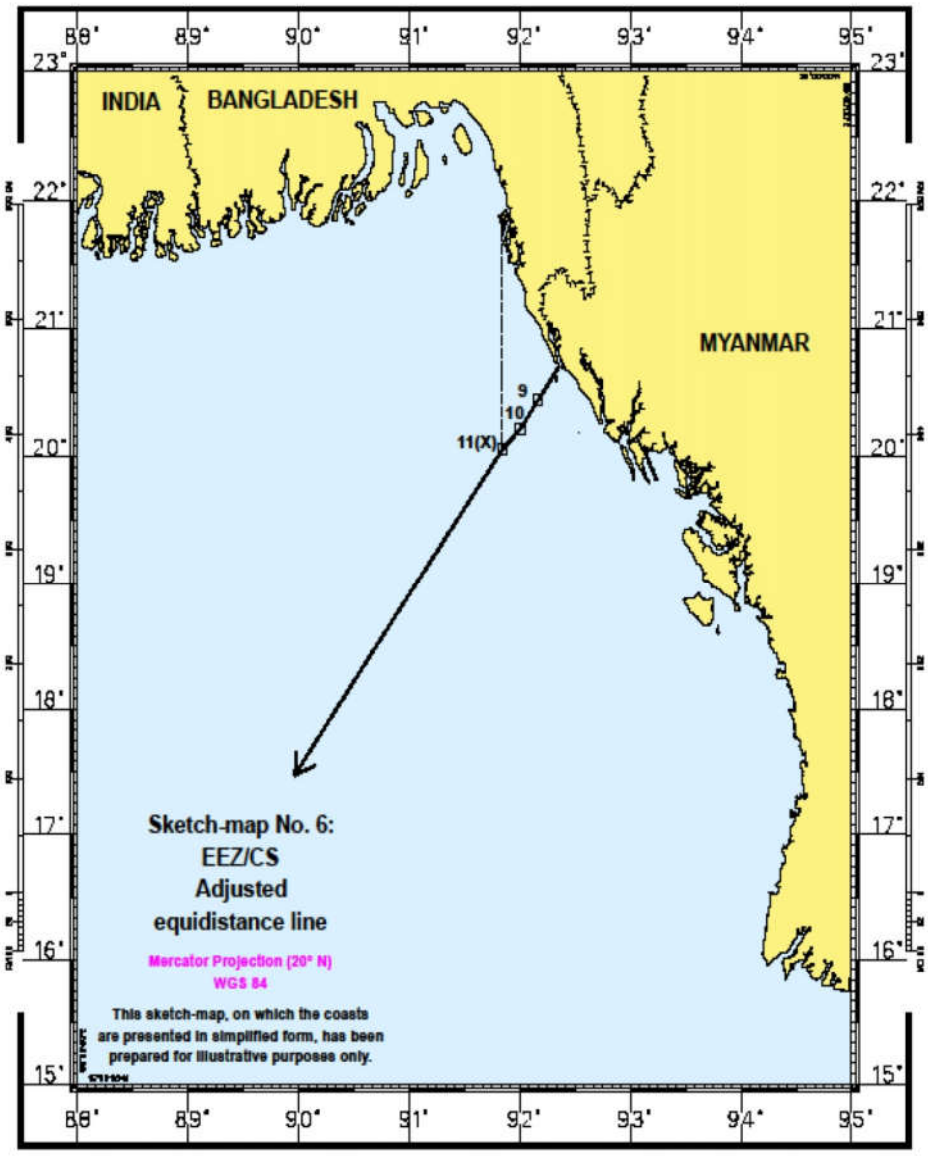

Source: Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar), Judgment, *International Tribunal for the Law of the Sea,* Case No. 16, 2012, p.102.

ট্রাইব্যুনাল মহীসোপান নির্ধারণের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হলে মিয়ানমার বলে, ২০০ নটিক্যাল মাইল দূরত্বেই উভয় দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ হয়ে গেছে (রায়ের অনুচ্ছেদ ৩৪৩)। বাংলাদেশ এর প্রতি আপত্তি জানায় (রায়ের অনুচ্ছেদ ৩৫৪)।[৭৮] বাংলাদেশ UNCLOS III-এর ৭৬.৫ ধারা অনুযায়ী Natural Prolongation-এর যুক্তি দিলে ট্রাইব্যুনাল তা গ্রহণ করে না (রায়ের অনুচ্ছেদ ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৪৮, ৪৫৫)।[৭৯] ট্রাইব্যুনাল বলে, বাংলাদেশ ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানের যে দাবি করে তা মিয়ানমার ২০০ নটিক্যাল মাইল ইইজেড এলাকা। যেহেতু দুই দেশের ইইজেড এলাকা

একে অপরের উপর পড়ছে না, সেহেতু ইইজেড ভাগাভাগির প্রশ্নই ওঠেনা (রায়ের অনুচ্ছেদ ৪৭১)।[৮০] অতঃপর ট্রাইব্যুনাল সমদূরত্ব রেখাটিই ২১৫০ আজিমুথ বরাবর প্রলম্বিত করে উভয় দেশের মহীসোপান চূড়ান্তভাবে ভাগ করে দেয় (রায়ের অনুচ্ছেদ ৫০৫)। এটি ছিল বাংলাদেশের পরাজয়। এ বিষয়ে রায়ের পৃষ্ঠা নং ১৪৬ অনুসারে মানচিত্র নিম্নে দেওয়া হলো-[৮১]

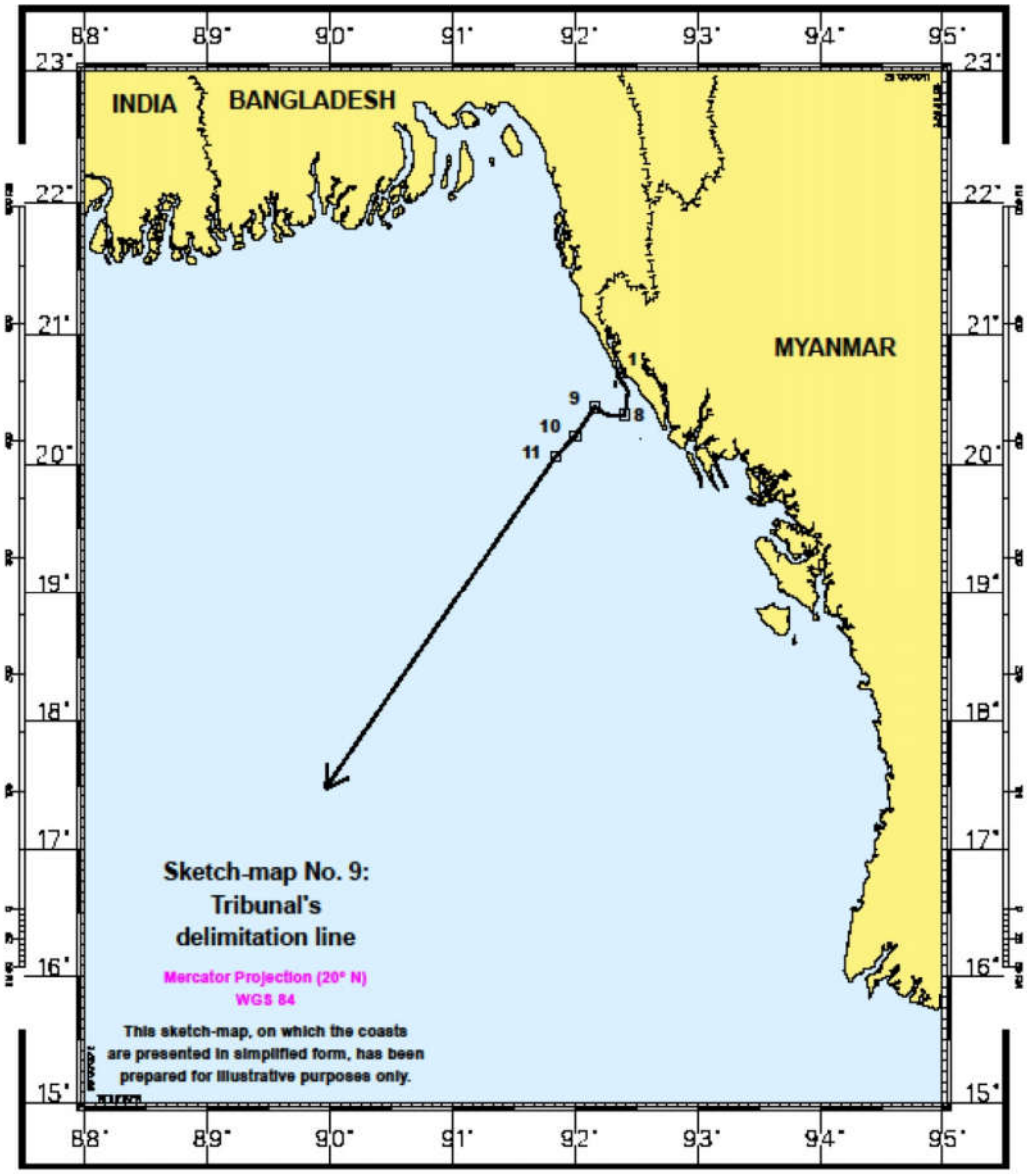

Source: Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar), Judgment, *International Tribunal for the Law of the Sea,* Case No. 16, 2012, p.146.

ইটলস-এর রায়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দাবির সঙ্গে আদালতের রায়ের ঘোষণা অনুযায়ী হাতছাড়া হওয়া ব্লকগুলোর পরিমাণ হলো মিয়ানমারের সমদূরত্বরেখা দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশের অগভীর সমুদ্রের ১৮নং ব্লকের অংশবিশেষসহ গভীর সমুদ্র ব্লকের ৭টি পূর্ণব্লক (DS-08-18, DS-08-21, DS-08-22, DS-08-23, DS-08-26, DS-08-27, DS-08-28) এবং ৭টি ব্লকের (DS-08-12, DS-08-13, DS-08-16, DS-08-17, DS-08-20, DS-08-24, DS-08--25) অংশবিশেষ মিলে মোট ৩৪ হাজার ৯৩ দশমিক ৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা।

বাংলাদেশ তার দাবি ন্যায্যতার ভিত্তিতে করেছে এবং এই দাবিরেখা অনুযায়ী ২০০৮ সালে নিজেদের ঘোষিত তিনটি পূর্ণব্লক (২৩, ২৭, ২৮) এবং ৫টি ব্লকের (১৩, ১৭, ১৮, ২২, ২৬) অংশবিশেষ মিলে মোট ১৪ হাজার ৭৪৪ দশমিক ১৪২ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিজেদের দাবি হতে বাদ দিয়েছে। ইটলসের রায়ের ৫০০ হতে ৫০৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে মীমাংসা রেখা বর্ণনা করা হয়েছে সে অনুযায়ী বাংলাদেশ তার অগভীর সমুদ্রের ১৮নং ব্লকের অংশবিশেষসহ গভীর সমুদ্র ব্লকের ৫টি পূর্ণব্লক (১৮, ২২, ২৩, ২৭, ২৮) এবং ৬টি ব্লকের (১২, ১৩, ১৭, ২১, ২৫, ২৬) অংশবিশেষ মিলে মোট ২২ হাজার ৪৯ দশমিক ৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা হারিয়েছে।[৮২]

বাংলাদেশ বনাম মিয়ানমার মোকদ্দমায় সমুদ্র বিষয়ক আইনের ধারা ৭(৪), ১৫, ৭৪, ৮৪ এবং ১২১ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ মোকদ্দমায় গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হলো সেন্টমার্টিন দ্বীপের উপকূলীয় দ্বীপ হিসেবে বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির প্রশ্নটি। এ সম্পর্কিত কাতার বনাম বাহরাইন মামলা (২০০১), নিকারাগুয়া বনাম হন্ডুরাস মামলা (২০০৭), কৃষ্ণসাগর মামলায় (রুমানিয়া বনাম ইউক্রেন মামলা, ২০০৯) প্রদত্ত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ আইনি যুক্তি তুলে ধরে। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য বনাম ফ্রান্স মামলা (১৯৭৭), তিউনিসিয়া বনাম লিবিয়া মামলা (১৯৮২), দুবাই বনাম শারজাহ মামলা (১৯৮১) ভিত্তিতে মিয়ানমার নিজ দাবির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। আন্তর্জাতিক সালিশি আদালত প্রাসঙ্গিক বিশেষ পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় এনে সেন্টমার্টিন দ্বীপকে উপকূলীয় দ্বীপের পূর্ণ মর্যাদা প্রদান পূর্বক বাংলাদেশের পক্ষে টেরিটরিয়াল সমুদ্রাঞ্চল নির্ধারণে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সীমানা নিশ্চিত করেন। এক্ষেত্রে ন্যায্যতার ভিত্তিতে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করণে আদালত কর্তৃক সীমিত পরিসরে সমন্বয় সাধিত সমদূরত্ব নীতি এবং প্রাসঙ্গিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচিত হয়। একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার প্রশ্নে বাংলাদেশ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত দাবি তুলে ধরে। অন্যদিকে মিয়ানমার সমুদ্র আইনের ধারা ৭(৪), ১৫, ৭৪ এবং ৮৩ এর প্রেক্ষিতে মোকদ্দমা আইনে অনুসৃত তত্ত্বের ভিত্তিতে উপকূলীয় তটরেখার আনুপাতিক হারে একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা দাবি করে। বাংলাদেশের ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মিয়ানমারের ২০০ নটিক্যাল মাইল একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা 'ধূসর এলাকা' (ধূসর এলাকা বলতে বোঝায়- এর মাছ খাবে মিয়ানমার, তলদেশের খনিজ তুলবে বাংলাদেশ) সৃষ্টি করলেও সালিশি আদালত আদালতের বিচারিক সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে আদেশ প্রদান করেন, যা মোকদ্দমা আইনে একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত। এখানেই এ রায়ের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত।[৮৩]

ট্রাইব্যুনালের রায় সমুদ্রসীমার সীমানা নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাংলাদেশ বনাম মিয়ানমার সালিশি মোকদ্দমায় বিচার্য বিষয় হলো আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা, একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা

এবং মহীসোপানের বিস্তৃতি নির্ধারণ। এক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল গত কয়েক দশক ধরে অন্যান্য আন্তর্জাতিক আদালত এবং ট্রাইব্যুনালের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তিন পর্যায়ের (সমতা নীতি, সমদূরত্ব নীতি এবং সমানুপাত নীতি) নীতি অনুসরণ করে। আন্তর্জাতিক সালিশি আদালত কর্তৃক বাংলাদেশ বনাম মিয়ানমার মামলার প্রদত্ত রায় সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা এবং প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের বিধিবদ্ধ আইনি কাঠামোর বাইরে উচ্চতর আদালতে সৃষ্টিশীলতার এক অনন্য উদাহরণ।[৮৪]

সমুদ্রসীমা বিরোধের প্রভাব

বাংলাদেশ সমুদ্রপারের দেশ। বাংলাদেশের উপকূল নাজুক এবং নিরন্তর পলি জমাটের কারণে তীরের গভীরতাও এতই কম যে জাহাজ সরাসরি বন্দরে ভিড়তে পারে না। অন্যদিকে ভারত ও মিয়ানমারের উপকূল উত্তল (Convex), অর্থাৎ তাদের উপকূল সমুদ্রের দিকে অর্থাৎ বহির্মুখী। আর বাংলাদেশের উপকূল হলো অবতল (Concave), সমুদ্র এখানে উপকূলের দিকে অর্থাৎ অন্তর্মুখী। এ রকম পরিস্থিতিতে উপকূল আঁকাবাঁকা হয়, পলি বেশি জমা হয়। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনে ভূ-সন্নিহিত এরকম সমুদ্র সম্পদে পরিপূর্ণ হলে সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারই বেশি বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্র চিংড়ি-ইলিশ-লবণ এবং নানা রকম খনিজ পদার্থ ও গ্যাস-সম্পদে পরিপূর্ণ। এখানকার ইলিশ ও চিংড়ি পৃথিবীতে বিরল এবং এগুলোর বিকল্প কোনো উৎসও বাংলাদেশের নেই। বাংলাদেশের যাবতীয় লবণও এখান থেকেই আসে। দেশের মোট জনসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ হলো উপকূলীয় এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠী। তাদের জীবন-জীবিকাও এর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং সমুদ্র বাংলাদেশের জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ, অনেক দেশের জন্য ততটা নয়।[৮৫]

দুদেশেরই প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা প্রচুর। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতা কিন্তু চাহিদার ব্যাপকতা একধরণের দেশীয় রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করছে। জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের অভাব ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতার কারণে দু'দেশই তেল ও গ্যাস উত্তোলনে সক্ষম হয়নি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশই প্রথম ১৯৭৪ সালে সমুদ্রসীমা আইন প্রণয়ন করে। তারপর ১৯৭৬ সালে মিয়ানমার এবং সর্বশেষ ১৯৭৭ সালে ভারত এ আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এধরনের বিরোধে বিরোধপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে চুক্তিপত্র রয়েছে। কিন্তু ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের এখনো পর্যন্ত কোনো চুক্তি হয়নি। ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমার ১৯৮৪ সালেই বঙ্গোপসাগরীয় এলাকায় নিজেদের মধ্যে ২০০ নটিক্যাল পর্যন্ত সমুদ্রসীমানার বিষয়টি মীমাংসা করে ফেলে। একমাত্র বাংলাদেশ এ ব্যাপারে কখনোই অর্থবহ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বিপুল সম্পদ সমৃদ্ধ সমুদ্রের জন্য নেই কোনো অধিদপ্তর। বাংলাদেশ অদ্যাবধি একটি পূর্ণাঙ্গ সমুদ্র গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেনি। সমুদ্রসীমানা নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার মতো দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা হয়নি।[৮৬]

বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে সামুদ্রসীমা বিরোধ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশলগত, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত বৃহত্তর প্রভাব বিস্তার করে। এই বিরোধ যা চার দশকেরও বেশি সময় ধরে দুদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা হয়ে রয়েছে। ১৯৭৪ সালের পর থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের এবং ভারতের অর্থনৈতিক এলাকা নির্ধারণ নিয়ে কোনো সমঝোতা

হয়নি। আর জলসীমা নির্ধারণ না হবার কারণে ভারত ও মিয়ানমার বাংলাদেশের সীমার মধ্যে প্রবেশ করে তেল গ্যাস অনুসন্ধান চালায় এবং বিভিন্ন ধরনের জাহাজ সমুদ্রসীমা অতিক্রম করে।[৮৭] ২০০৭ সালে ভারত ও মিয়ানমার বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ নিলে বাংলাদেশ এর প্রতিবাদ জানায়। ফলে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ যখন একই উদ্যোগ গ্রহণ করে ভারত ও মিয়ানমারের প্রতিবাদের কারণে তা অসমাপ্তই থেকে যায়। ফলে এই ধরনের টানাপোড়নে প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্কের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।[৮৮]

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে বিভিন্ন সামুদ্রিক উদ্ভিদ/শেওলা, ঝিনুক, কচ্ছপ ও মুক্তা আহরণ করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব,[৮৯] যা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত। সমুদ্রসীমা অনির্ধারিত থাকায় এক দেশের জেলেরা যেমন এসে পড়ে অন্য দেশের সমুদ্রসীমায়। একই ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশের কোস্টগার্ড এবং মিয়ানমারের নাসাকা বাহিনীর ক্ষেত্রেও। অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানীরা এই সুযোগটিকে কাজে লাগায় পুরো মাত্রায়।[৯০] এরফলে উভয় দেশের বহু নিরীহ হতদরিদ্র মানুষকে বিনা অপরাধে জেল খাটতে হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান জ্বালানি তথা গ্যাস সংকট দেশের অর্থনীতিতে যে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা লাঘবের একমাত্র উপায় দেশের সম্ভাবনাময় গ্যাস সম্পদের ত্বরিৎ আহরণ ও ব্যবহার। দেশের সমুদ্র অঞ্চলে গ্যাস অনুসন্ধানের বাধা হিসেবে প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে সমুদ্রসীমানা বিরোধ একটি প্রধান উপাদান হিসেবে দেখা হয়। মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমানা বিরোধ নিস্পত্তির ফলে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার তাদের নিজ সমুদ্র এলাকা নিষ্কন্টকভাবে চিহ্নিত করতে পারবে। উভয় দেশই নতুন সীমানারেখা অনুযায়ী তাদের সমুদ্রের গ্যাস ব্লকসমূহ নতুনভাবে চিহ্নিত করতে পারবে। বাংলাদেশের জন্য কাজটি দ্রুত করা আবশ্যক। বিশেষকরে মিয়ানমারের সমুদ্রসীমানায় প্রমাণিত গ্যাসভান্ডার সংলগ্ন টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন এলাকায় যে সম্ভাবনার জানালা রয়েছে, তাকে সুপ্ত না রেখে কার্যকরভাবে জাগিয়ে তোলা আবশ্যক। বাংলাদেশের নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধানী কোম্পানি দিয়ে সমুদ্রসীমানায় অনুসন্ধান কাজ করতে হবে। দেশীয় অনুসন্ধানী কোম্পানি (বাপেক্স) মূল ভূ-খন্ডে সফলতা অর্জন করলেও সমুদ্রবক্ষে এই মুহূর্তে এককভাবে অনুসন্ধান করার কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেনি। এই দক্ষতা গড়ে তুলতে হলে দেশীয় কোম্পানিকে বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে সমুদ্রবক্ষে যৌথভাবে অনুসন্ধান কাজ করতে দেওয়া যেতে পারে। আর এ ধরনের যৌথ উদ্যোগ বেসরকারি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সঙ্গে করার পরিবর্তে বিদেশী সরকারি তেল কোম্পানির সঙ্গে করাটা বাংলাদেশের জন্য বেশি লাভজনক হবে। বাংলাদেশের গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়নে রাশিয়া ও গণচীনের সরকারি তেল অনুসন্ধানী প্রতিষ্ঠানসমূহ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এদের কেউ কেউ বাংলাদেশী কোম্পানি বাপেক্সকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছে। বাংলাদেশের উচিত সীমানা নির্ধারণ করে সমুদ্রসীমারেখা অনুযায়ী সমুদ্রব্লকসমূহ ঘোষণা এবং গ্যাস অনুসন্ধান শুরু করা।[৯১]

অপ্রত্যাশিতভাবে ২০০৫ সালের শেষের দিকে মিয়ানমমারের জ্বালানি মন্ত্রী আর চীনের প্রেট্রাচায়না কোম্পানির উপ-সভাপতি একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এতে করে মিয়ানমার সরকার উপসাগরে তাদের উপকূলবর্তী এ- ১ ব্লক থেকে আগামী ৩০ বছরে প্রেট্রাচায়নার কাছে মোট সাড়ে ৬ লক্ষ কোটি ঘনফুট পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস বিক্রি করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। সমঝোতা স্মারকে বলা

হয়, মিয়ানমারের এ-১ ব্লক থেকে ভূপৃষ্ঠস্থ পাইপলাইনের সাহায্যে ঐ গ্যাস দক্ষিণ-পূর্ব চীনের কুনমিং প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হবে। মিয়ানমার ও চীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐ চুক্তির ফলে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পাইপলাইনের সাহায্যে ভারতে গ্যাস সরবরাহের ব্যাপারে যে ত্রি-দেশীয় কথাবার্তা চলেছে তাতে নিঃসন্দেহে বিরূপ প্রভাব পড়বে। কেননা সে ক্ষেত্রেও, এ-ব্লক থেকেই ভারতে গ্যাস সরবরাহের কথা হয়। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের মোহনা হোল্ডিংস লিমিটেড মিয়ানমারের পশ্চিম উপকূলের এ-১ ব্লক এবং তার পাশের এ-৩ ব্লকের গ্যাস ফিল্ডগুলো থেকে ২৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইনের সাহায্যে ভারতের পশ্চিমবাংলায় গ্যাস সরবরাহের ত্রি-দেশীয় প্রকল্পটি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে। বিগত প্রায় দশক কাল তারা এ বিষয়ে তাদের তৎপরতাও অব্যাহত রেখেছে।[৯২] কাজেই সমুদ্রসীমা দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং সমূহ অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকটি মনে রেখে স্বাধীনতার পরপরই প্রতিবেশী ভারত এবং মিয়ানমারের সাথে জলসীমা নির্ধারণের বিষয়াদি চূড়ান্ত হওয়া বিধেয় ছিল। কারণ ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা ও বিশেষত অর্থনৈতিক জলসীমা নির্ধারিত না হওয়ায় বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সম্পদ ও স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কাজেই আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন মোতাবেক গভীর সমুদ্রে যে সীমানা বাংলাদেশের পাওনা তাতে অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারত এবং মিয়ানমারের সঙ্গে সমঝোতা হওয়া অত্যন্ত জরুরী ছিল। এক্ষেত্রে যতই বিলম্ব হয়েছে ততই প্রতিবেশী দেশের মধ্যকার শুধু সখ্যই হুমকির মুখে পড়েনি; অর্থনৈতিকভাবেও বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।[৯৩] আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমানা নির্ধারণ করার ফলে দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস-সম্ভাবনাময় এই সমুদ্র অঞ্চল নিয়ে দুটি দেশের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তার নিরসন হয়।

সম্ভাবনা

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিতর্কের প্রধান কারণ হলো বঙ্গোপসাগরে জ্বালানি সম্পদ তথা প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সমুদ্রে তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও উত্তোলন বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ'। মিয়ানমারের অবস্থাও প্রায় একই রকম। বঙ্গোপসাগরে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি সম্পদ তথা প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ থাকার পরও এটি বিশ্বের সবচেয়ে কম জ্বালানি উৎপাদনকারী অঞ্চল। ভারত ও মিয়ানমার মাত্র কিছুদিন আগে সমুদ্রে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান শুরু করেছে। বর্তমানে গভীর সমুদ্র থেকেও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের প্রযুক্তির সহজলভ্যতা রয়েছে। সাইসমিক সার্ভের মাধ্যমে এবং রিগ স্থাপন করে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উঠানো যায়। এসব প্রযুক্তির উন্নতির কারণে বঙ্গোপসাগরে খনিজ সম্পদ উঠানোর কাজ সহজ হয়ে গেছে। আগে মাত্র ৬০০ মিটার গভীর সমুদ্র থেকে খনিজ তেল ও গ্যাস উত্তোলন করা যেত। এখন গভীর সমুদ্র থেকেও তেল-গ্যাস উঠানো যায়। এরফলে একে কেন্দ্র করে বিনিয়োগ ও ব্যবসা গড়ে ওঠেছে। পরস্পরের দাবির ভিত্তিতে প্রাপ্ত নতুন

গ্যাস ক্ষেত্রগুলোতে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই প্রযুক্তিগত এ উন্নতির ফলে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টিও নতুন মাত্রা পেয়েছে।[৯৪]

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর মতে- "সমুদ্র ছাড়া ভবিষৎ অর্থনীতি চলবে না। জ্বালানি ব্যয় বাড়বে, তাই সমুদ্রপথই হবে কম খরচে পণ্য পরিবহনের সবচেয়ে উপযোগী উপায়। বাংলাদেশের সেই সুবিধা রয়েছে। ২০৩০ সালের বৈশ্বিক বাস্তবতা মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ অপরিহার্য"। তিনি আরো বলেন- "চট্টগ্রামের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেরও সম্ভাবনা আছে। চট্টগ্রামের সম্ভাবনার সাথে বাংলাদেশের সম্ভাবনা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এককভাবে বাংলাদেশের সম্ভাবনার সঙ্গে পৃথিবীর সম্ভাবনাও জড়িত। ২০৩০ সালের মধ্যে চীন হবে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। আর দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হবে ভারত। বাংলাদেশ এ দুই বিরাট জায়ান্টের মাঝখানে। এই দুই অর্থনৈতিক জায়ান্টের চাহিদা পূরণে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে"। কেননা মিয়ানমারের আর্থিক ও শিক্ষা খাত প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায় সেখানে বিপুল সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান, যেখানে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা চীন, মালয়েশিয়া এবং ভারতীয় অংশীদারীত্বের সঙ্গে কাজ করতে পারে। সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসনের ফলে বাংলাদেশও ভারত এবং চীনের সঙ্গে মিয়ানমার থেকে শক্তির আঞ্চলিক আমদানিকারক হিসেবে প্রতিযোগীতায় নামতে পারবে। তাছাড়া বাংলাদেশের ব্লকগুলো আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীগুলোকে উৎসাহিত করবে প্রতিযোগীতায় নামতে। এই রায় আঞ্চলিক সহযোগীতার শক্তি হিসেবে কাজ করবে এবং অঞ্চলগুলি প্রত্যাশার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই রায় দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।[৯৫]

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা দেশীয় বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক যা অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির সাথে অসামঞ্জস্য। যা দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রধান উৎস হলো প্রাকৃতিক গ্যাস। আশি ও নব্বই-এর দশকে দেশটির প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৩.৪% ও ৪.৯%। ২০০০ সালে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৫.৮%। ২০০৪ সালে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৬% ছাড়িয়ে যায়। এ সময়ের মধ্যে শিল্প খাতের প্রসার ঘটে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। মোট বিদ্যুতের ৮৫ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাসের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশ বিদেশ থেকে গ্যাস আমদানি করে ঘাটতি মেটাতে পারছে না বলে দেশের গ্যাসের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। কিন্তু দেশে মজুদ গ্যাস চাহিদা মেটাতে পারছে না। উপরন্তু, বাংলাদেশে গ্যাস আমদানির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পাইপলাইনের সাহায্যে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানীতে অবকাঠামোগত প্রযুক্তির ঘাটতি রয়েছে। ২০০৮ সালে যেখানে প্রতিদিন প্রায় ১,৯০০-১,৯৫০ মিলিয়ন ঘনফুট এর কাছাকাছি চাহিদা কিন্তু তৈরি হচ্ছে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এনামুল হক বলেন, '২,২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের বিপরীতে বর্তমানে ১,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা যাচ্ছে। ফলে ৪০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের ঘাটতি রয়েছে'। এরফলে একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না, অন্যদিকে কল কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের এখন যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে তাতে ২০২৫ সালে ৫,৬০৬-৭,৪৪১ ঘনফুট গ্যাসের প্রয়োজন পড়বে। এরফলে সরকারের উপর চাপ বাড়ছে এবং বাংলাদেশকে

নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে হচ্ছে। বঙ্গোপসাগর এই ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। দ্রুত গতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের শক্তির উৎস হতে পারে। আর সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসনের ফলে বঙ্গোপসাগরে এ সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল।[৯৬]

বাংলাদেশের বিশেষ ভৌগোলিক ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এবং সমুদ্র সম্পদের প্রাচুর্য ও উপকূলের গঠনের ফলে এই অঞ্চল একদিকে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশে গর্জনশীল চল্লিশার অংশ হিসেবে দুর্যোগপূর্ণ। অন্যদিকে হিমালয়সহ ভারতবর্ষের পলি এখানে নির্গত হয়। পাকিস্তান আমলের শেষদিকে জাতিসংঘের উদ্যোগে বঙ্গোপসাগরে একটা জরিপ হয়। সেই জরিপ দলের প্রধান মি. জ্যাকব বলেন- বঙ্গোপসাগরে প্রচুর সম্পদ স্তূপীকৃত রয়েছে; সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো এ সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারলে শতাব্দীর পর শতাব্দী এর ওপর নির্ভর করে তারা চলতে পারবে। এখন প্রয়োজন আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত সামুদ্রিক সীমানার মধ্যে অনাদিকাল থেকে জমা হওয়া বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

কাজেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনমানের অবস্থার উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে ইইসি, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রযুক্তি উন্নত দেশের সাহায্যে সমুদ্রাঞ্চলের খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু আহরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে ১৯৮২ সালের জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনের চতুর্দশ অধ্যায়ের ধারা ২৬৬ (২) এবং ধারা ২৭০ নীতিমালায় বর্ণিত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। উক্ত কনভেনশনের ধারা ২৬৬ (২)-এ বলা হয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহ সামুদ্রিক সম্পদ অবিষ্কার, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণরোধ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন করতে চাইলে সকল রাষ্ট্র তাতে সহযোগিতা দিয়ে যাবে। এবং ধারা ২৭০-এ বলা হয় যে, প্রয়োজনে সামুদ্রিক প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশসমূহের নিকট হস্তান্তরে সকল উন্নত রাষ্ট্রকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।[৯৭] এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭২-৭৬ সালে সোভিয়েত নৌবাহিনীর জাহাজ বাংলাদেশের মাইন অপসারণ, নৌসুবিধা সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণ কাজে এবং ১৯৯১ সালের এপ্রিলের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অঞ্চলের লোকজনদের ত্রাণ কাজে যুক্তরাষ্ট্রের 'টাস্কফোর্স' নিয়োজিত ছিল।[৯৮]

১৯৮২ সালের কনভেনশনের নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে প্রযুক্তি উন্নত দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় চুক্তি স্বাক্ষরের পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।[৯৯] বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অন্যান্য রাষ্ট্র যথা শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার যৌথ উদ্যোগে বঙ্গোপসাগরের সম্পদ, বিশেষকরে মৎস্য আহরণের সকল পদক্ষেপ বাংলাদেশকে গ্রহণ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, মৎস্যজীবীদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে (ইউএনডিপি/এফএও) চালু হয় 'বঙ্গোপসাগর কর্মসূচী বা বিওবিপি (Bay of Bengal programme)'। ১৯৮৭ সালে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী সাতটি দেশকে নিয়ে এ বিওবিপির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। যার মূল লক্ষ্য হয় বঙ্গোপসাগরের দূষণমাত্রা নির্ধারণ, মৎস্য উত্তোলন ও বাজারজাতকরণ, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিল্পের জৈব অর্থনীতি চালু এবং জেলেদের জন্য ছোট নৌকা তৈরি ইত্যাদি।[১০০] সমুদ্রাঞ্চলের সম্পদ সংরক্ষেণের স্বার্থে এ ধরনের সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। এছাড়া জনগণের প্রোটিনের চাহিদা

মেটাতে বড় বড় মৎস্য আহরণকারী রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতায় সমুদ্রগামী ট্রলার সংগ্রহের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের গভীরে মৎস্য আহরণের ব্যবস্থাও নিতে হবে।

বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা অসংখ্য দ্বীপে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে বনসৃষ্টি এবং কৃত্রিম সেচব্যবস্থা ও চাষবাসের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে জনবসতি স্থাপন করতে হবে। যৌথ কৃষিখামারের মতো ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে সরকারি ও বেসরকারি শিল্প পর্যায়ে সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কৃষি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, লোকবসতির ঘনত্ব কমানো এবং বনজ সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যসমূহ সামনে রেখে নতুন জেগে ওঠা ভূ-খন্ডে আবাদের ব্যাপারে সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ ও কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

সমুদ্রাঞ্চলের সম্পদ (জৈবিক ও অজৈবিক) আহরণ, ব্যবহার এবং সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণরোধ, স্বাস্থ্যবিধি ও চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন এবং বাণিজ্য নৌ-পথ সুগম রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী কোস্টাল গার্ড গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।[১০১]

এছাড়া বাংলাদেশের খনিজ বিশেষজ্ঞগণ কক্সবাজার সমুদ্রতীরে বালু থেকে বিভিন্ন প্রকার খনিজ উৎপাদনের সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছেন। বিজ্ঞানীদের অভিমত, তীরবর্তী বালুকণা থেকে আহরিত ইনমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, জিরকন, গার্নেট এবং রিউটাইল নামক খনিজদ্রব্য, ব্যাটারীসেল, রং এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল।[১০২]

ইটলস এর রায়ে বাংলাদেশের পলিপাতনকে চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রতিবছর বাংলাদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বিলিয়ন টন পলিকে তাহলে কেন অন্যের সমুদ্রসীমায় চলে যেতে দেব? বাংলাদেশ মেঘনা মোহনায় পলি সংগ্রহ করে সমুদ্র হতে ভূমি পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা নিতে পারে। এক্ষেত্রে নেদারল্যাণ্ডস বাংলাদেশের জন্য উদাহরণ হতে পারে। উল্লেখ্য যে, নেদারল্যাণ্ডসের মোট আয়তনের এক পঞ্চমাংশ (৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার) সমুদ্র হতে উদ্ধার করা। সমুদ্রে মৎস শিকারের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা এবং মৎস শিকারের সাথে জড়িতদের জন্য উন্নত সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে এই খাতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। সমুদ্রসীমা নিয়ে রাজনীতি না করে এসব বিষয়ে মনযোগী হওয়াটাই দেশ ও দেশের জনগণের জন্য উত্তম।[১০৩]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসনে বাংলাদেশে-মিয়ানমার উভয় দেশের বেশ কিছু উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয় বিশেষকরে-

- বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সামুদ্রিক সীমানা চুক্তিতে যে সম্ভাব্য সম্পদ আহরণ করা সম্ভব হবে তা বাংলাদেশের গ্যাস সংকট সমাধানে এবং মিয়ানমারের আরো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- মিয়ানমারের সদ্য চিহ্নিত সামুদ্রিক সীমানার মধ্যে গ্যাস আবিষ্কার শিউ গ্যাসক্ষেত্র থেকে চীন ও ভারতের মধ্যকার গ্যাস রপ্তানির প্রতিযোগিতার অনুরূপ হবে।
- অতিরিক্ত দাবিকৃত এলাকায় গ্যাস আবিষ্কার মিয়ানমারকে ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক, কৌশলগত ও রাজনৈতিক শক্তিশালী সংযোগ তৈরির সুযোগ এনে দেবে।

• উত্তর-পশ্চিম মিয়ানমারে শক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন রোহিঙ্গাদের জীবনধারণ সামঞ্জস্যহীনভাবে প্রতিযোগিতামূলক হবে।

• বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতার জন্য বিমসটেকের মতো আঞ্চলিক বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান কিছু সুযোগ দেয়, যা গ্রহণ করতে হবে।

• ইটলস-এর মাধ্যমে বিতর্ক নিষ্পত্তি হওয়ায় এর প্রভাবে ভবিষ্যতে অন্যত্র সমুদ্রসীমার ক্ষেত্রে আইনি নজির সৃষ্টি হয়েছে।[১০৪]

এ কথা নিংসন্দেহে বলা যায় যে, বঙ্গোপসাগরের উজ্জ্বল গ্যাস-সম্ভাবনাই মিয়ানমার, বাংলাদেশ ও ভারতকে সমুদ্রসীমানা নিয়ে পরস্পরের প্রতি বেশি করে প্রতিযোগী করে তুলেছে। ভারত ও মিয়ানমার উভয়ই তাদের সমুদ্রে বড় আকারের গ্যাসপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করেছে। বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমানায় সে রকম জোর অনুসন্ধান কাজ সম্পন্ন করতে না পারার ফলে আশানুরূপ গ্যাসের সন্ধান পায়নি। বাংলাদেশের পক্ষে জোর অনুসন্ধান চালানোর একটি বাধা ছিল পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার ও ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে পারস্পরিক সীমানা বিরোধ। তাই মিয়ানমারের সঙ্গে এ বিরোধ নিরসনের ফলে পূর্ব দিকে আর কোনো সমস্যা থাকলো না। নতুন সীমারেখা নির্ধারণ হওয়ার পর যে কাজটি প্রথমে সম্পন্ন করা প্রয়োজন তা হলো সেই অনুযায়ী সমুদ্রের গ্যাস ব্লকসমূহ নতুন করে নির্ধারণ করা। এর ফলে নিষ্কন্টক এই ব্লকসমূহে পুরোমাত্রায় অনুসন্ধান চালাতে আর কোনো বাধা নেই।[১০৫] বাংলাদেশ সরকার বঙ্গোসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের কনোকো ফিলিপস ও আইরিশ কোম্পানি তাল্লোকে বঙ্গোপসাগরের ৫, ১০ও ১১ নং ব্লক তিনটি অনুসন্ধানের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। তবে এ দুটি কোম্পানিকে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের ইজারা দেয়ায় বিরোধিতা করে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর 'তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রা জাতীয় কমিটি' পেট্রোবাংলা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। তারা নতুন প্রোডাকশান শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (psc) এর বিরোধিতা করে, যেখানে ৮০% গ্যাস রফতানির সুযোগ দেয়া হয়েছে।[১০৬] কাজেই এই তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বিদেশী কোম্পানির হাতে তুলে না দিয়ে দেশি কোম্পানি বাপেক্সকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।[১০৭] গভীর সমুদ্রসীমায় তেল-গ্যাস বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান এবং মৎস্য সম্পদ আহরণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে একান্তই অপরিহার্য। সুতরাং প্রত্যাশা এই যে, সমুদ্রীমা নির্ধারণের গুরুত্ব সংশ্লিষ্টমহল অনুধাবন করে প্রতিবেশী দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থে তা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে।

তথ্য নির্দেশ-

১. Muhammad Jamiruddin Sircar, *Glimpses of International Law*, 1st ed. (Bibidh, Dhaka, 1997), p. 56.

২. ডঃ মিজানুর রহমান, *পরিবর্তনশীল বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইন*, (পলল প্রকাশনী, ঢাকা; সেপ্টেম্বর ২০০৩), পৃ. ১৩৯।

৩. Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar), Judgment, *International Tribunal for the Law of the Sea*, Case No. 16, 2012, pp.19-20.

৪. Riddhi shah, "Possible Repercussions of ITLOS Verdict in Bangladesh-Myanmar Maritime Boundary Disputes for India", *Insight South-East Asia*, Vol.1, No.3 (July 2012), p.15.

৫. Mohd Khurshed Alam, "Law of the Sea and Implication in Bangladesh", *BISS Journal,* vol 19, no. 4, (1998), p.529.

৬. Md. Shayeed Hossain, *Bangladesh-Myanmar Relations, 1972-2010,* Unpublished Ph.D thesis, Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi, August 2014, pp.91-92.

৭. ডঃ মিজানুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯।

৮. Henry Wheaton, *Elements of International Law with a Sketch of History of the Science*, (B Fellows London 1836), pp. 212-214; Green Haywood Hackworth, *Digest of international Law*, Vol. II, US Government Printing Office, (Washington, 1941), pp. 651-829.

৯. Arthur Nussbaum, *A Concise History of the Law of Nation*, (New York, 1961), pp. 107-14; L. Oppenheim, *International Law*: Vol. I, (law of Peace: Longman, London 1953), pp. 91-95.

১০. ডঃ মিজানুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০।

১১. C. John Colombos, *The International Law of the sea*, (Longman, London, 1968), p. 49; G. J. Mangone, Law for the World Ocean, (Stev & Sons, London), pp. 4-5; D. P. O Connell, *International Law of the Sea*, Ed .by I. A. Shearer, (Clarendon, Oxford 1982), pp. 2, 124.

১২. মামলার পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন, L. C. Green, *International Law Through case*, (Stevens, London, 1959); L. Oppenheim, *International Law: A treatise.* Vol. II: Disputes War & Neutrality, Edited by H. Lauterpacht, (Longman, London, 1955); C. J. Colombos, *Op. cit.,* pp.172-73; D. P. O: Connel, *Op. cit.,* pp. 522-24.

১৩. অবশ্য এর পূর্বেই ১৯৪৫ সনের ২৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের 'ট্রুম্যান মতবাদে' ঘোষণার মাধ্যমে ৬০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত মহীসোপানের সকল সম্পদের ওপর তার একক কর্তৃত্ব স্থাপন করে। দেখুন C. John Colombos, *Op. cit.,* p.49.

১৪. ডঃ মিজানুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪১।

১৫. *Second United Nations Conference on the Law of the Sea: Official Records*. Geneva. 1960 Yearbook of the United Nations 1960, pp. 542-45.

১৬. ডঃ মিজানুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪২।

১৭. Bangladesh Ministry of foreign Affairs, *Commemoration Ceremony of the 30th Anniversary of the United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS 1982, 1982-2012, (December 2012),* p.15.

১৮. সম্মেলনের পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন, *Third United Nations Conference on the Law of the Sea: Official Records*, Vol. I-XVII, United Nations, New York, 1983; মুহম্মদ রমজুল হক, "জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন ঃ পশ্চাতের কূটনীতি," *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ত্রয়োবিংশ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯২, অক্টোবর, ১৯৮৫, পৃ.পৃ. ৫৬-১১৭; *UN Law of the sea Convention 1982: Official Text United Nations*,(New York, 1983) pp.97-104, 141-154.

১৯. ডঃ মিজানুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৪।

২০. K. J. Houghton, "Maritime boundaries in a Rising Sea", *Nature Geosciences*, Vol. 3, No.12, 2010, pp. 813-816.

২১. Shabbir Ahmed Chowdhury, "Delimitation of Maritime Boundaries of Bangladesh: Problems and Prospects", *The National Defence College (NDC) Journal,* Vol. 7, No. 1, June 2008, pp. 185-201.

২২. Harun ur Rashid, "Law of Maritime Delimitation", *Dhaka Courier*, Vol. 24, No. 39, 18 April 2008, pp.18-19.

২৩. T. L. McDorman, "Towards the Conceptualization of Maritime Delimitation: Legal and Technical aspects of a Political Process", *Ocean Development and International Law*, Vol. 35, No. 4, 2004, p. 384.

২৪. M. Habibur Rahman, Delimitation of Maritime Boundaries: A Survey of Problems in the Bangladesh Case, *Asian Survey*, Vol. 24, No. 12, December 1984, p.1306.

২৫. *The Bangladesh Gazette: Extraordinary:* Part V, February 14, 1974, Government printing press, Dacca, pp. 2334-2337.

২৬. *UN Legislative Series*, ST/LED/SER/B/19, pp. 62-63.

২৭. Mohd Khurshed Alam, "Law of the Sea and Implication in Bangladesh", *BISS Journal,* vol 19, no.4, (1998), p.534; *Territorial Waters and Maritime Zones Act*

1974, Act No. XXVI of 1974, National legislation - DOALOS/OLA - United Nations asdf.

২৮. ডঃ মিজানুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৬; পাদরেখা নির্ধারণের নিয়মনীতির জন্য দেখুন, M. Habibur Rahman, The Legal Basis for the Delimitation of Baselines', *BISS Journal*, Vol. 6. No. 2, 1985।

২৯. *The Law of the Sea: Baselines: National Legislation with Illustrative Maps*, Office of the Ocean Affairs and the Law of the Sea, United Nations. New York, 1989, pp. 62-63; *The Law of the Sea: National Legislation & E. E. 2.,* Office of Special Representative of Secretary General for the Law of the sea, U.N. N.Y. 1986, pp. 38-39; Notification No. LT - I/3/74, *The Ministry of Foreign Affairs*, Dacca, April 13, 1974.

৩০. *Yearbook of the United Nations 1991*. Vol. 45, United Nations New York, 1992 (Maritinus Nijhoff Publishers), p. 833.

৩১. বিশেষকরে ধারা ২৮৭ (১) - এ বর্ণিত হয়েছে যে, রাষ্ট্রসমূহ বিরোধ নিষ্পত্তি করতে নিম্নের যে কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে-

(ক) সংযোজনী ৬ (৪১টি ধারা সম্বলিত)- এর ভিত্তিতে গঠিত ২১ জন বিচারিক সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন ট্রাইব্যুনাল (কার্যালয় জার্মানীর হামবুর্গ শহর)।
(খ) আন্তর্জাতিক আদালত (হেগে অবস্থিত জাতিসংঘের বর্তমান বিচারালয়)।
(গ) সংযোজনী ৭ (১৩টি ধারা)- এর ভিত্তিতে গঠিত ৫ জন বিচারিক নিয়ে আরবিট্রাল ট্রাইবুনাল;
(ঘ) সংযোজনী ৮ (৫টি ধারা)- এ বর্ণিত ৫ সদস্যের একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল।
UN Law of the Sea Convention 1982, Official Text, op. cit., pp. 97-104, 141-154.

৩২. Jared Bissinger, The Maritime Boundary Dispute between Bangladesh and Myanmar: Motivations, Potential Solutions and Implications*, The National Bureau of Asian Research*, Seattle, Washington, Asia Policy, No. 10, July 2010, p.105.

৩৩. Ravi A. Balaram, Case Study: The Myanmar and Bangladesh Maritime Boundary Dispute in the Bay of Bengal and Its Implications for South China Sea Claims, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 31, No. 3, 2012, p. 87.

৩৪. Riddhi shah, *Op.cit,* p.15.

৩৫. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণ: আইনি জয়ের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত*, http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/19134.

৩৬. Ravi A. Balaram, *Op.cit,* p. 87.

৩৭. *Asian Yearbook*, 1979.

৩৮. Md. Ramjul Huq, Exclusive Economic Zone in the Bay of Bengal: Implications for Bangladesh and Other Littoral States', *Social Science Review*, The Dhaka University Studies, Part-D, Vol.VII, No. 2, December 1990, pp.154-179; শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া ও এ, কে, এম রাশিদুজ্জামান, *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভূ-রাজনীতিক বাস্তবতা*, (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, জুলাই ১৯৯২), পৃ. পৃ. ৬২-৬৮।

৩৯. Riddhi shah, *Op.cit,* p.15.

৪০. *দৈনিক প্রথম আলো*- ২৩ নভেম্বর, ২০০৮।

৪১. ডঃ মিজানুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৩।

৪২. M. Habibur Rahman, The Continental Shelf: A Study with Reference to the Bangladesh-India Situation', *BISS Journal*, Vol. II. No. 2, 1990, p. 174.

৪৩. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p. 87.

৪৪. Bangladesh Ministry of foreign Affairs, *Op.cit.,* pp.15-16.

৪৫. *Law of the Sea Bulletin No. 9*, November 1987, pp. 105, 107.

৪৬. Md. Ramjul Huq, *Ibid.*, p.171.

৪৭. Jared Bissinger, *Op.cit.,* p.104.

৪৮. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* pp.111-112.

৪৯. Ravi A. Balaram, *Op.cit.,* p. 88.

৫০. Huma Yusuf, *Bangladesh-Burma (Myanmar) maritime boundary dispute escalates*, NOVEMBER 4, 2008, http://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2008/1104/p99s01-duts.html.

৫১. Ravi A. Balaram, *Op.cit.,* p. 88.

৫২. Judgment, *Op.cit.,* p. 27.

৫৩. Jared Bissinger, *Op.cit.,* p.104.

৫৪. "Dhaka Delegation in Naypyidaw for Border Talks", *Indo-Burma News*, July 31, 2009.

৫৫. মো. খুরশেদ আলম, *ন্যায্য সমুদ্রসীমাই বাংলাদেশের চাওয়া*, ১৪ মার্চ, ২০১২, পৃষ্ঠা- ১২, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2012-03-14/12.

৫৬. Md. Habibur Rahman, 'The Maritime Jurisdiction– Where is the End?' *South Asian studies*, Lahore, January, 1988, p. 4.

৫৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*- ২১ এপ্রিল, ২০০৭।

৫৮. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.95; Md Khurshed Alam, "Maritime Boundary Issues Between Bangladesh and Myanmar", Paper presented in the Seminar on *Maritime Boundary Issues Between Bangladesh and Myanmar',* organised by *BIISS*, 28 February, 2012; Adnan Firoze, "Bangladesh-Myanmar Maritime Dispute: What Actually Happened?", *Dhaka Courie*r, Vol. 28, No. 36, 23, March 2012, pp. 12-13; *দৈনিক প্রথম আলো*- ২৩ নভেম্বর, ২০০৮।

৫৯. Bangladesh Ministry of foreign Affairs, *Op.cit.,* p. 15; Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.95; *বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা চিহ্নিত হবে দুই পদ্ধতির সমন্বয়ে*, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2010-01-10/1, 10 January, 2010, PP.1, 19; *বিজয়, পরাজয়, না কি মিমাংসা? সমুদ্রসীমা রায়ের একটি ভৌগোলিক বিশ্লেষণ*, ১৪ এপ্রিল, ২০১২, https://www.facebook.com/notes/.../ বিজয়... রায়ের.../10151504011895322/

৬০. Jared Bissinger, *Op.cit.,* pp.104-105.

৬১. Huma Yusuf, Bangladesh-Burma (Myanmar) maritime boundary dispute escalates, NOVEMBER 4, 2008, http://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2008/1104/p99s01-duts.html.

৬২. মিজানুর রহমান খান, *বাংলাদেশের 'মহান জয়ের' নেপথ্যের গল্প*, ১৭ মার্চ, ২০১২, পৃষ্ঠা-১২, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2012-03-17/12.

৬৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*- ১১ নভেম্বর, ২০০৮।

৬৪. মিজানুর রহমান খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।

৬৫. Md Khurshed Alam, "Maritime Boundary Issues Between Bangladesh and Myanmar", Paper presented in the Seminar on *Maritime Boundary Issues Between Bangladesh and Myanmar',* organised by *BIISS*, 28 February, 2012.

৬৬. Judgment, *Op.cit.,* pp. 9-15.

৬৭. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.96.

৬৮. Riddhi shah, *Op.cit.,* p.15.

৬৯. Judgment, *Op.cit.,* pp.1-151; Md Shahidul Hasan, Maritime Verdicts and Avenues of Resource Exploration for Bangladesh, *BIISS Journal*, Vol. 35, No. 3, July 2014, P. 232.

৭০. ম ইনামুল হক, *সমুদ্রসীমাবিষয়ক রায়: কতটা জয়?*, ৩০ মার্চ, ২০১২, পৃষ্ঠা- ১২, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2012-03-30/12.

৭১. Judgment, *Op.cit.,* pp. 22-24.

৭২. Shamim Ahmed, "Winning the Bay", *Dhaka Courier,* Vol. 28, No. 36, 23 March 2012, pp.12-13.

৭৩. Judgment, *Op.cit.,* pp. 29-46.

৭৪. Judgment, *Ibid.,* p.101.

৭৫. Judgment, *Ibid.,* pp. 54-57.

৭৬. Judgment, *Ibid.,* p. 65.

৭৭. Judgment, *Ibid.,* pp. 67-102.

৭৮. Judgment, *Ibid.,* pp. 103-106.

৭৯. Judgment, *Ibid.,* pp. 127-132.

৮০. Judgment, *Ibid.,* p. 136.

৮১. Judgment, *Ibid.,* pp. 145-146.

৮২. এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান, সমুদ্রসীমার রায়ের একটি ভৌগোলিক বিশ্লেষণ, *আমাদের সময়.কম*, ১৪ এপ্রিল ২০১২।

৮৩. Judgment, *Op.cit.,* pp. 93, 94, 134; কমান্ডার এম ইয়াদুল ইসলাম, *সমুদ্র এলাকায় সার্বভৌমত্ব নির্ধারণে সালিশি আইন-বিজ্ঞান ব্যবহারত্ব এবং আইনি প্রেক্ষিত*, ২১ নভেম্বর, ২০১৩, পৃষ্ঠা-২৮, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2013-11-21/28.

৮৪. ITLOS delimits maritime boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal, Volterra Fietta, *The Public International Law Firm,* 22 March 2012.

৮৫. এম হাবিবুর রহমান (প্রথম আলো কর্তৃক গৃহীত বিশেষ সাক্ষাতকার), *সমুদ্রের এই অর্জন সতর্কভাবে রক্ষা করতে হবে*, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2012-03-18/12, 18 March 2012, p.12.

৮৬. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.117; *বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার সমুদ্রসীমা নির্ধারণ: বিতর্কের মূল কারণ গ্যাস উত্তোলন*, https://nesaramin.wordpress.com/2015/06/03/বাংলাদেশ-ও-মিয়ানমারের-মধ/JUNE 3, 2015.

৮৭. Md. Shayeed Hossain, *Ibid.,* p.115; *দৈনিক ইত্তেফাক*- ২১ এপ্রিল, ২০০৭।

৮৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*- ২১ আগস্ট, ২০০৮।

৮৯. ডঃ মি, মু, আ, কুদ্দুস, ও ডঃ মোঃ শফি, *বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ,* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩), পৃ. ৪৭৬।

৯০. Riddhi shah, *Op.cit.,* p.15.

৯১. বদরূল ইমাম, *গভীর সমুদ্র কি গ্যাসের নতুন দিগন্ত হতে পারে?*, ৫ অক্টোবর, ২০০৯, পৃষ্ঠা-১৩, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2009-10-05/11.

৯২. *দৈনিক ইত্তেফাক*- ২৯ জানুয়ারী, ২০০৬।

৯৩. *প্রাগুক্ত*- ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮।

৯৪. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.117; *বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার সমুদ্রসীমা নির্ধারণ: বিতর্কের মূল কারণ গ্যাস উত্তোলন*, https://nesaramin.wordpress.com/2015/06/03/বাংলাদেশ-ও-মিয়ানমারের-মধ/JUNE 3, 2015.

৯৫. Md. Shayeed Hossain, *Ibid.,* pp. 117-118; http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2012-04-11/24, 11 April, 2012, p. 24.

৯৬. Md. Shayeed Hossain, *Ibid.,* p.113; Jared Bissinger, *Op.cit.,* p.120.

৯৭. *UN Law of the Sea Convention: Official Text, op. cit.* pp.97-104, 141-154; Lt. com. James Stavrides, 'Marine Technology Transfer and the Law of the Sea', in *Naval War college Review*, July- August 1983, pp. 38-49; এম হাবিবুর রহমান (প্রথম আলো কর্তৃক গৃহীত বিশেষ সাক্ষাতকার), *পূর্বোক্ত,* p.12.

৯৮. Sadeq Khan, 'Reorienting Ties with People of Bay of Bengal Littoral', *Holiday,* August, 1991.

৯৯. *UN Law of the Sea Convention1982, official Text, op. cit.*, pp.97-104, 141-154.

১০০. *Coastal Environmental Management Plan for Bangladesh,* Volume One: Summary, ESCAP. United Nations, Bankok, Thailand, no date, p. 16.

১০১. Nurul Momen, *Bangladesh in the United Nations: A Study in Diplomacy*, (University Press Ltd., Dhaka, January 1987) pp. 120-121, Sadeq Khan, 'Reorienting Ties with People of Bay of Bengal Littoral', *Holiday,* August, 1991, *ভোরের কাগজ*, ৮ অক্টোবর, ১৯৯৪, পৃ.৮। জাতীয় সংসদে ৮/১২/৯৪ কোস্টগার্ড বিল ১৯৯৪ পাশ হয়েছে। *ভোরের কাগজ*- ৯/১২/৯৪।

১০২. Activities and Achievements of the Beach Sand exploration Centre, *Bangaldeh Atomic Energy Commission*, (Beach Sand Minerals Exploitation Centre-BSMEC, Cox's Bazar, April 1985), p. 4/A.

১০৩. বিজয়, পরাজয়, না কি মিমাংসা? সমুদ্রসীমা রায়ের একটি ভৌগোলিক বিশ্লেষণ, 14 April 2012, https://www.facebook.com/notes/.../ বিজয়... রায়ের.../10151504011895322/

১০৪. Jared Bissinger, *Op.cit.,* P.104.

১০৫. বদরূল ইমাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩।

১০৬. বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার সমুদ্রসীমা নির্ধারণ: বিতর্কের মূল কারণ গ্যাস উত্তোলন, https://nesaramin.wordpress.com/2015/06/03/বাংলাদেশ-ও-মিয়ানমারের-মধ/JUNE 3, 2015.

১০৭. বিজয়, পরাজয়, না কি মিমাংসা? সমুদ্রসীমা রায়ের একটি ভৌগোলিক বিশ্লেষণ, 14 April 2012, https://www.facebook.com/notes/.../ বিজয়... রায়ের.../10151504011895322/

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ-মিয়ানমার বাণিজ্যিক সম্পর্ক

বাংলাদেশ-মিয়ানমার নিকটতম প্রতিবেশী দেশ হিসেবে স্বাভাবিক সম্পর্ক দীর্ঘ সাড়ে তিন দশকেও গড়ে উঠেনি; যা দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে একটি টেকসই অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরির জন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়।[১] দু'দেশকেই তাদের নিজ নিজ উন্নয়ন সমস্যা অর্থ্যাৎ অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তাই তেমন কোনো দ্বিপাক্ষিক সমস্যার উদ্ভব না হলে পরস্পরের প্রতি দৃকপাত করার সময় কারো ছিল না। তবে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয় রাষ্ট্রই পরস্পরের সাথে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী।[২] তথাপি গোড়া থেকেই দুদেশের মধ্যে একটি দৃশ্যমান নৈকট্য থাকলেও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থবিরতা বিরাজ করছে।

শুরু থেকে কয়েক দশক জুড়ে মিয়ানমারে সামরিক শাসন থাকায় চীন ও থাইল্যান্ড ছাড়া অন্যান্য দেশের সঙ্গে কোনো দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখা থেকে দেশটি নির্লিপ্ত ছিল। দেশটি কিছু সংখ্যক অংশীদার এবং অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে অধিকাংশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখত।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার পাশাপাশি দুই প্রতিবেশী সত্ত্বেও এর সাথে মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও প্রাচীন বাণিজ্য, প্রাথমিকভাবে কিছু বিরোধ যথা মিয়ানমারের দীর্ঘমেয়াদী সামরিক শাসন, বিধিনিষেধমূলক অর্থনৈতিক নীতি, সামুদ্রিক বিরোধ এবং দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রোহিঙ্গা সংঘাত ও জাতিগত সহিংসতা ইত্যাদির কারণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্র যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়নি। যদিও দুই দেশের মধ্যে বরাবর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা, রেল রোড ও সমুদ্র যোগাযোগের বিপুল সম্ভাবনার উদাহরণ রয়েছে। ফলে বিভিন্ন সময় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শক্তি সহযোগিতা, সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে উভয় দেশই অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনঃনির্ধারণের জন্য কিছু কিছু গঠনমূলক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে।[৩]

সরকারিভাবে বাংলাদেশ[৪] ও বার্মার[৫] মধ্যে বাণিজ্য শুরু না হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর আট দশক হতেই উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।[৬] বাংলাদেশ ও বার্মার মধ্যে বাণিজ্য প্রধানত ব্যক্তিগত বণিকদের মাধ্যমেই চলত।[৭] কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় আগত ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার মূলে ছিল উপনিবেশবাদ বিস্তারের আকাঙ্খা। ভারতে বাণিজ্যরত থাকাকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্মার বাণিজ্যিক সম্ভাবনার প্রতি উৎসাহী হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে বার্মার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ব্রিটিশ শক্তি বার্মার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ছয় দশকে নোগ্রাইস হত্যাকান্ডে বর্মী সৈন্য কর্তৃক ইংরেজদের কিছু সৈন্য নিহত হবার পর কয়েক দশকের জন্য বার্মার সাথে কোম্পানির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।[৮] ১৭৮৫ সালে বর্মীরাজ আরাকান দখল করলে আরাকান বার্মা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তখন হতে

কোম্পানি বর্মী সরকারের সাথে পুনরায় যোগাযোগ করে। কোম্পানির এই প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ ও বার্মার সাথে বাণিজ্যিক তৎপরতা শুরু হয়।[৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৭৫-১৮০০) চীন হতে কোম্পানির আমদানির পরিমাণ বেড়ে গেলে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ কোম্পানির রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দান করেন। এর অর্থ ছিল গ্রেট ব্রিটেনের শিল্প ও উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করার নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা। আশা করা হয়েছিল যে, আসাম, ভুটান ও তিব্বতের সাথে ব্যবসার উন্নতি হলে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এ স্থান হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব হবে এবং এরফলে ভারতে ইংল্যান্ডের রেশম দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিক্রি করাও সম্ভব হবে।[১০] উল্লেখ্য যে ভারতে ইংল্যান্ডের রেশম দ্রব্যের চাহিদা ছিল না বললেই চলে। স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানির এ পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি। ফলে ব্রিটিশ শিল্পের ভালো বাজারের জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ নতুন কোনো দেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ১৭৯৭ সালে কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ বাংলাদেশের প্রতিবেশী বার্মার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং এ পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের সরকারকে নির্দেশ দেন। এরপর হতেই কোম্পানি বার্মার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কোন্নয়নে তৎপর হয়।[১১]

মূলত জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সেগুন কাঠের সরবরাহ ছিল বার্মা ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।[১২] ১৭৮৫ সালে বাংলাদেশ-বার্মার মধ্যে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। বার্মার সাথে কোম্পানির বাণিজ্যিক যোগাযোগ সহজতর করার জন্য ক্যাপ্টেন সাইমস্ বর্মীরাজের নিকট হতে কতিপয় বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ে সমর্থ হন। বাণিজ্যিক নীতিমালা ও সুবিধাসমূহ দুটি নথিতে বিধিবদ্ধ করে উভয় সরকারের মধ্যে বিনিময় করা হয়। বার্মায় বিভিন্ন সামুদ্রিক বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং পেগুর ভাইসরয়কেও এই নীতিমালা প্রদান করা হয়।[১৩] এই বাণিজ্যিক নীতিমালা ও সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ-

১. ইংরেজ বণিকগণ অথবা তাদের এজেন্টগণই বার্মায় উৎপাদিত দ্রব্যাদি ক্রয় এবং তাদের আনীত পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বার্মায় যে কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতে পারবেন।

২. বার্মার কোনো শহর অথবা প্রদেশের গভর্ণর কোনো দ্রব্যের ওপর আমদানি শুল্কের সার্টিফিকেট প্রদান করলে ঐ দ্রব্যাদির ওপর অভ্যন্তরীণ শুল্ক ধার্য্য করা হবে না এবং এ সমস্ত পণ্যদ্রব্য বার্মার যে কোনো স্থানে কোনো প্রকার শুল্ক ছাড়াই সরবরাহ করা যাবে।

৩. রেঙ্গুন (বর্তমান ইয়াঙ্গুন) ও অমরাপুরার মধ্যে ১৭টি বিভিন্ন চৌকীর প্রত্যেকটিতেই আমদানি রপ্তানি শুল্ক আদায় করা হতো। এ পর্যায়ে আমদানি শুল্ক বাতিল করে বার্মায় উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানির জন্য প্রত্যেকটিতে প্রদেয় শুল্ক নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত করা হয়।

৪. অন্য কোনো শুল্ক ব্যতীত রেঙ্গুনে কেবল মাত্র ৫% শুল্ক প্রদানের মাধ্যমে ইংরেজ বণিকগণ বার্মার যে কোনো স্থান হতে দারুবৃক্ষ সংগ্রহ করতে পারবেন।

৫. ইংরেজ বণিকগণ প্রয়োজনবোধে বার্মায় প্রাদেশিক গভর্ণরের মাধ্যমে অথবা স্বয়ং রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে বর্মীরাজের নিকট তাদের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবেন।

৬. রেঙ্গুনে অমরাপুরার উৎকৃষ্ট রৌপ্য মুদ্রায় অবৈধভাবে বন্দর শুল্ক আদায় করা হতো। এই প্রথা বাতিল করা হয় এবং রেংগুনের মুদ্রাকে প্রতিস্থাপিত করা হয়। রেংগুনের মুদ্রা ছিল অমরাপুরার মুদ্রার চেয়ে ২৫% মানের নিম্ন মানের।

৭. ইংরেজ বণিকগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী দোভাষী নিয়োগ করতে পারবেন। তবে নিয়োগের পূর্বে দোভাষীর নাম ও বিবরণ বর্মীরাজের প্রধান দোভাষী বা নাথানকে জানাতে হবে।

৮. রেঙ্গুনে প্রথা অনুযায়ী জাহাজের প্রদেয় ভাড়া ও শুল্ক যথাযথভাবে নির্দিষ্ট ও সীমিত রাখা হবে।

৯. ইংরেজদের কোনো জাহাজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় তাড়িত হয়ে অথবা মেরামতের জন্য বার্মায় এলে বর্মী কর্মচারীগণ প্রচলিত হার অনুযায়ী সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করবেন।[১৪]

বার্মার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্যদ্রব্য ছিল সেগুন কাঠ। যা জাহাজ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল। সেগুন কাঠছাড়া বার্মায় আরো মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যেত যেমন রূপা, টিন, লাক্ষা, মোম ইত্যাদি।[১৫] বার্মা হতে বাংলাদেশে রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে চালও ছিল উল্লেখযোগ্য এবং এ পর্যায়ে কোম্পানী বর্মী বণিকদের উৎসাহিত করত।[১৬] ক্যাপ্টেন মাইকেল সাইমস্ বার্মায় তার প্রথম মিশনের সময় প্রদত্ত বিবরণীতে লাভজনক যে সকল পণ্যদ্রব্যের উল্লেখ করেছেন তারমধ্যে লাক্ষা, দারুবৃক্ষ, টিন, পান্না, মতি, খনিজ সম্পদ, লবণ, সোরা, চিনি, নীল, ধান, সিল্ক ও তুলা বিশেষভাবে উল্লে-খযোগ্য।[১৭] ক্যাপ্টেন কক্স এর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, আরাকানের পথে বর্মী বণিকগণ রূপা রপ্তানি করতেন এবং বিনিময়ে তারা বাংলাদেশ হতে সিল্ক ও তুলা বস্ত্রের থান আমদানি করতেন। বর্মী বণিকদের বক্তব্য অনুযায়ী ৫শ' বর্মী নৌকা এই রূপা রপ্তানি কাজে নিয়োজিত ছিল।[১৮] বাংলাদেশে রপ্তানিকৃত বার্মার অন্যান্য দ্রব্যাদির মধ্যে উদ্ভিদ হতে প্রস্তুত তেল ও খনিজ তেল উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে বার্মায় কোম্পানির প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলো ছিল চিনি, বাংলার মসলিন, মৃন্ময় পাত্রাদি, লোহা-পিতলের পণ্যদ্রব্য এবং পশমী কাপড়।[১৯] বর্মীদের বাণিজ্য প্রসঙ্গে ১৭৯৮ সালে ক্যাপ্টেন কক্স এর বিবরণ একদিকে বর্মী বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং অন্যদিকে বর্মী বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রাধান্য সম্পর্কে আলোকপাত করে।[২০]

বাংলাদেশে বর্মী বণিকদের বাণিজ্যে কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তারা বাংলাদেশে বাণিজ্য করতেন। অনেক সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও বর্মী বণিকগণ বাণিজ্যিক সম্ভার নিয়ে বাংলাদেশে আসতেন। ১৮১৩ সালে বর্মী বণিকগণ নৌকাযোগে হাতীর দাঁত, মোম ও রূপা নিয়ে বাংলাদেশে আসেন।[২১] তারা ঢাকা, ত্রিপুরা ও বাখরগঞ্জ[২২] হতে কাপড় ও সুপারি সংগ্রহ করেন।[২৩] উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাখরগঞ্জের নলছিটিতে মগপাড়া নামক স্থান হতে বর্মী বণিকগণ সুপারি সংগ্রহ করতেন।[২৪]

১৮২৩ সালের শেষের দিক হতেই বাংলাদেশ ও বার্মার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে মতভেদ ও বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় এবং এরফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম বার্মা যুদ্ধ হতে কোম্পানি কর্তৃক বার্মার এক অংশ দখল করার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ-বার্মা বাণিজ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না।[২৫]

১৮২৪ হতে ১৮৮৬ সালের মধ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে বার্মা ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে। ফলে বার্মায় ভারতীয় ও বাঙালিদের অভিবাসন শুরু হয়। বার্মায় অভিবাসনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চট্টগ্রামের কৃষি শ্রমিকবৃন্দ। বার্মার চাল উৎপাদন ও উন্নয়নের প্রয়োজনেই এই অভিবাসন অতি প্রয়োজনীয় ছিল। বার্মায় অভিবাসনকারীরা বর্মী জাতীয়তাবাদী চেতনায় সম্পূর্ণরূপে উদ্দীপিত হতে পারেনি। ফলে বর্মীদের সাথে অভিবাসনকারীদের সম্পর্ক ক্রমশ হয়ে ওঠে তিক্ত এবং ব্যবধান হয় দুস্তর। ১৯৪৭ সালের পূর্বে রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মতৎপরতায় বর্মী অভিবাসীদের স্বতন্ত্র সত্তার প্রকাশ বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ হতে বার্মায় অভিবাসনকারীরা বর্মী জাতীয়তাবাদের সাথে বিভিন্ন কারণে একাত্ম হতে পারেনি এবং এ বিষয়টি এই অঞ্চলের সমকালীন ও পরবর্তীকালের জনমিতি সম্পর্কিত পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করেছে। বর্তমানের রোহিঙ্গা সমস্যা প্রকৃতপক্ষে বর্মীদের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত সমস্যা।[২৬]

১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খননের পর কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ সম্ভব হয় অর্থাৎ এরফলে বার্মায় বাণিজ্যিক স্বার্থে চাল আবাদ শুরু হয়। ১৯ শতকের ৮ম দশকে বাংলা থেকে বার্মায় জন অভিবাসন শুরু হয় এবং জন অভিবাসন ছিল কতকাংশে স্বপ্রণোদিত এবং কতকাংশে সরকারিভাবে উৎসাহিত। বাংলাদেশ হতে বার্মায় জন-অভিবাসনের বহু কারণ ছিল।[২৭]

১৮৮৫ সালে নতুনভাবে বার্মায় বিশেষকরে আরাকানে যে জন-অভিবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তা 'মাউন্টজয়' (Mountjoy) পরিকল্পনা হিসেবে খ্যাত; এই পদ্ধতির প্রধান বিষয় ছিল চট্টগ্রাম হতে অভিবাসনের ব্যবস্থা করা। 'মাউন্টজয়' প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম হতে আগত অভিবাসীদের অত্যন্ত কম হারে অথচ স্থায়ী জমি বন্দোবস্তের নীতি গৃহীত হয়। তবে সমকালীন অন্যান্য উৎস হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা হতে বহু সংখ্যক পরিবার আরাকান অঞ্চলে গমন করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বার্মায় অভিবাসনকারীদের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাদের অধিকাংশই ছিল চট্টগ্রামের অধিবাসী। পরবর্তীকালে বিবাহ সম্পর্কের মাধ্যমে মুসলমানদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। যাহোক ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ হতে বার্মায় জন-অভিবাসন সম্পর্কিত চিত্র নিম্নোক্ত টেবিল-১ এ তুলে ধরা হলো-[২৮]

টেবিল-১

বাংলাদেশ ও বার্মায় জন-অভিবাসন

সময়	বার্মা হতে বাংলায় আগত	বাংলা হতে বার্মায় মোট পরিযায়ী	চট্টগাম হতে বার্মায় পরিযায়ী	চট্টগ্রামের পরিযায়ী জনগণের শতকরা%
১৮৯১		৬১.১১৫	৫৪,৭৩৪	**৮৯.৫০**
১৯০১	১,৬৬৪	১,৫৭,০৩৪	৭৯,২৬২	**৫০.৪৭**
১৯১১	২,৫৯৬	১,৩৪,৯৮৫	৩০,৫২১	**২২.৬১**
১৯২১	২,৩৬১	১,৪৬,০৮৭	(কেবল আকিয়াবে) ৮৮,৩৪৫	**৬০.৪৭**
১৯৩১	৩,৭৯১	১,৫৮,০৫৫		

উৎস- Census of India, 1898-1931, (Bengal and Burma Volumes).

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অনেক সময় রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত ছিল।[২৯] ১৯৮০ সালে যখন মিয়ানমার বিশ্বের বৃহত্তম আফিম বিক্রেতা ছিল তখনও বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পিছনে মৌলিক লক্ষ্য ছিল মাদক বিরোধী কার্যক্রমে সহযোগিতা করা। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে দু'দেশের সম্পর্ক সামুদ্রিক সীমানা নির্ধারণ, রোহিঙ্গা শরণার্থী ও মাদক পাচারের মতো জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হয়।[৩০]

অপার সম্ভাবনা স্বত্ত্বেও মিয়ানমারের সঙ্গে বিনিয়োগের ব্যাপারে কোনো চুক্তি, কোনো শিপিং বা এয়ার চুক্তি, পর্যটন চুক্তি, সড়ক যোগাযোগ চুক্তি বা মুদ্রা বিনিময় চুক্তি ছিল না। কজেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয়ই ভবিষ্যতে এগিয়ে নিতে পারে যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সেখানে সন্তোষজনক স্তর অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তথাপি স্বাধীনতার আগে (১৯৬৬ সালে) মিয়ানমারের সঙ্গে স্থল সীমানা নির্ধারণ করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অর্থনৈতিক সংযোগ স্থাপনে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বার্ষিক বৈঠকে সম্মত হয়ে বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একটি যৌথ বাণিজ্য কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩১]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায় ও মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারি উভয় দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক চালু হয়। ১৯৭৩ সালের ৩রা আগস্ট দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের ওপর বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; কিন্তু কয়েক মাস না যেতেই তা বন্ধ হয়ে যায়।[৩২] ১৯৭২-৮৫ সাল পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেগুলো হলো- (১) সাধারণ বাণিজ্য চুক্তি, ১৯৭৩ (General Trade Agreement, 3 August, 1973), (২) উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসন চুক্তি, ১৯৭৮ (Repatriation of Refugee Agreement, 1978) এবং (৩) ভূমি সীমানা চুক্তি, ১৯৭৯ (Land Boundary Agreement, 1979)।[৩৩] ১৯৮৮ সালে সীমান্ত চুক্তি এবং নাফ নদী সীমানা নির্ধারণ; এবং ১৯৮৯ সালে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক বা এমওইউ (MOU- Memorandum of understanding) অন্যতম।[৩৪] এই চুক্তিসমূহ দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাইলফলক ছিল। তারপর উচ্চ পর্যায়ে উভয় পক্ষের অনেক সফর বিনিময় হয় যা বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক জোরদার করে।

সীমান্ত বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদানে সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগতভাবে যৌথ উদ্যোগ ছাড়াও এফবিসিসিআই (FBCCI- Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry) ও ইউএমসিসিআই (UMCCI- Union of Myanmar Chamber of Commerce and Industry) এর মতো বেসরকারি সহযোগিতায় ১৯৮৯ সালের ১লা জুন তিনটি 'সমঝোতা স্মারক' বা এমওইউ (MOU- Memorandum of understanding) স্বাক্ষরিত হয়।[৩৫]

তবে কৌশলগত বিষয়ে আরো অনেক অগ্রগতি প্রয়োজন। কৌশলগত কিছু বিষয়ে সহযোগিতার অভাব সত্ত্বেও বিমসটেক (BIMSTEC- The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), এআরএফ (ARF- ASEAN regional Forum), বিসিআইএম (BCIM- The Bangladesh-China-India-Myanmar Forum), উভয় ধরনের নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক ফোরামের মাধ্যমে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করা হয়।[৩৬]

১৯৯৪ সালের ১৮ই মে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার ও বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৩৭] ১৯৯৪ সালের বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম (M. Shamsul Islam) ও মিয়ানমারের বাণিজ্য মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট জেনারেল তুনকাই (Lt. Gen. Yun Kyi) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৯৪ সালের ১৫ই জুন থেকে দু'দেশের মধ্যে এই চুক্তি কার্যকর হয়। বাংলাদেশের বাণিজ্য টেকনাফ থেকে এবং মিয়ানমারের বাণিজ্য মংডু থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাণিজ্য বিল পরিশোধ সোনালী ব্যাংক ও ব্যাংক অব মিয়ানমারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ-মিয়ানমার উভয় দেশের ব্যবসায়ীরা প্রত্যেকেই ৫ হাজার ডলারের সমমূল্যের দ্রব্যাদি ক্রয় করার সুযোগ লাভ করে। এই সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্যের ইতিহাসে এক নতুনমাত্রা যোগ করে।

এই চুক্তিতে ৯টি অনুচ্ছেদ যা দুই দেশের সীমান্ত বাণিজ্যে সাধারণ ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়। দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে সাথে বাণিজ্য সচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ২৫শে জুন ১৯৯৫-এ মিয়ানমার সফর করেন। প্রাথমিকভাবে একটি দেশের ব্যবসায়ীদের অন্যদেশ সফরের জন্য ৪৮ ঘন্ট সময় দেয়া হয়। পরে এটা বাড়িয়ে ৭ দিন করা হয় যাতে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা মিয়ানমারের সিটুওয়ে এবং মিয়ানমারের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পর্যন্ত আসা যাওয়া করতে পারে। বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৫ সালের ৩১শে মে বাংলাদেশের "সোনালী ব্যাংক" ও মিয়ানমারের "মিয়ানমার ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক"-এর মধ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা স্বাক্ষরিত হয়।[৩৮] এরপর দুই দেশের মধ্যে টেকনাফ-মংডু সীমান্তে ১৯৯৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সীমান্ত বাণিজ্য সম্পর্ক শুরু হয়।[৩৯] ১৯৯৬ সালে দুই দেশের সরকারের মধ্যে একটি সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি ও বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিয়ানমারে বাংলাদেশের রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য ছাড়া সব ধরনের পণ্যই যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সঙ্গে মিয়ানমার থেকে বাঁশ, কাঠ, চাল, চিংড়ি, সিমেন্ট ও ক্লিংকার সামগ্রী এদেশে আনার সিদ্ধান্ত হয়। এতে ব্যবসায়ীদের প্রতিদিন ৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত এল/সি খোলার অনুমতি দেয়া হয়। মিয়ানমারে বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদা ব্যাপক এবং বাংলাদেশেও মিয়ানমারের পণ্যের প্রচুর আগ্রহী ক্রেতা বিদ্যমান। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যা থাকায় উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের তীব্র আগ্রহ সত্ত্বেও বাণিজ্যে অগ্রসর হওয়া যায়নি। যে কোনো দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের শর্ত হলো ব্যবসায়ীদের কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা। ব্যবসায়ীদের কাগজপত্র, সহজ ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ডলারের সহজ প্রাপ্যতা ও ব্যবসায়ীদের অবস্থান সময়সীমা, থাকা-খাওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ব্যবসায়ীদের কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।[৪০]

কাজেই বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারের সঙ্গে সরকারি পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উভয় দেশের সরকারের আন্তরিকতা ও বিচক্ষণতায় উদ্ভাবিত বিশেষ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো -

১. প্রতিবারে ২৫শ' মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য এলসি খোলার প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। একজন আমদানিকারক সোনালী ব্যাংকের টেকনাফ শাখা থেকে একটি ইউএস ডলার ড্রাফট ক্রয় করে মিয়ানমারের মংডুতে এমআইসিবি ব্যাংকে জমা

দিলে এমআইসিবি ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সমপরিমাণ মার্কিন ডলার কয়েন এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট প্রদান করবে, যা মিয়ানমারে আনঅফিসিয়াল হারে বিনিময়যোগ্য। মিয়ানমারের একজন আমদানিকারকও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করতে পারবেন। এরফলে একদিকে এলসি খোলার ঝামেলা থেকে আমদানিকারকগণ রেহাই পান। অন্যদিকে মিয়ানমারে মার্কিন ডলারের অফিসিয়াল ও আনঅফিসিয়াল হারের ব্যবধানজনিত সমস্যাও আর থাকলো না।

২. সীমান্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী আমদানি ও রপ্তানিকারকদের জন্য পাসপোর্ট ও ভিসার প্রয়োজন হবে না। তারা সরাসরি টেকনাফের ইমিগ্রেশন অফিস থেকে বর্ডার পাস বা এন্ট্রি পারমিট নিয়ে মংডু ও সিটুওয়ে (আকিয়াব) পর্যন্ত সফর করতে পারবেন। বর্ডার পাস নিয়ে মংডুতে ৪৮ ঘন্টা অবস্থান করতে এবং এন্ট্রি পারমিট নিয়ে মিয়ানমারের সিটুওয়ে পর্যন্ত যেতে এবং ৭ দিন থাকতে পারবেন। অনুরূপভাবে মিয়ানমারে ব্যবসায়ীগণ বর্ডার পাস নিয়ে টেকনাফ এবং এন্ট্রি পারমিট নিয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আসতে পারবেন।

৩. আমদানি ও রপ্তানি নীতিতে নিষিদ্ধ বা শর্ত সাপেক্ষে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য এমন সকল পণ্য ব্যতীত সকল পণ্য সীমান্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি করা যাবে।[৪১]

তাই বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালের মার্চ এবং ১৯৯৬ সালে ২৪শে মে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্যের চাহিদা বাড়ানোর জন্য মিয়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গুনে প্রথম একক বাণিজ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে। যা বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদা তৈরিতে সাহায্য করে।[৪২] ১৯৯৯ সালের অক্টোবর-এর প্রথম সপ্তাহে দুই দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ঢাকায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার ব্যাপারে ঐক্যমত্যে আসায় একটি সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করেন। সীমিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিপ্রেক্ষিতে মিয়ানমারের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুসারে দুদেশের মধ্যে 'কাউন্টার ট্রেড' চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই ব্যবস্থায় দুদেশই আমদানির সম-পরিমাণ রপ্তানি করতে পারে। সীমান্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে মিয়ানমার বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য পণ্য-সামগ্রীর মধ্যে নিউজপ্রিন্ট, ঔষধ এবং বাংলাদেশ চামড়া, লাইম স্টোন, টিককাঠ প্রভৃতি আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়। উভয় সরকার শতকরা একভাগ মালিকানায় অথবা যৌথভাবে বাঁশ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট, মন্ড তৈরির কারখানা, মাছ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টসহ বিভিন্ন শিল্প স্থাপনে সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হয়।[৪৩]

বাংলাদেশ-মিয়ানমার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ বেশ কয়েকবার মিয়ানমারে বাণিজ্য মেলার আয়োজন করে। মিয়ানমারে বাণিজ্য মেলা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করার ফলে সহজেই মিয়ানমারের লোকজন বাংলাদেশী পণ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে। তাছাড়া বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরাও সেখানকার লোকজনদের বাংলাদেশী কোন পণ্যের চাহিদা তাদের কাছে রয়েছে সে সম্পর্কেও জানতে পেরেছে। এভাবে ইয়াঙ্গুনে '৯৫ এবং '৯৬-এর বাংলাদেশী বাণিজ্য মেলা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন বাংলাদেশ থেকে পণ্যের চাহিদা তৈরিতে সহায়তা করেছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ২০০৩ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং মিয়ানমারে বাংলাদেশের দূতাবাস-এর আয়োজনে মিয়ানমারে বাণিজ্য মেলা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করে।[৪৪] ১৯৯৭ সালের ২৬শে জুন সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সীমান্ত বাণিজ্যের পর্যালোচনা সভায় স্থায়ী প্রদর্শনীর জন্য স্টল বা বিক্রয়কেন্দ্র এবং

একটি মোটেল মংডুতে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও শুল্ক বিভাগ এবং ব্যাংকিং পদ্ধতি সহজ এবং সীমান্ত বাণিজ্য আরও উন্নত করার জন্য সতেজ এবং হিমায়িত খাবার সহ কিছু নতুন রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৪৫] ২০০৩ সালের ২২শে মার্চ মিংগালা তাংনিউন টাউনশিপে (Mingala Taungnyunt Township) বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা বাড়ানোর জন্য ইয়াঙ্গুন ট্রেড সেন্টার খোলা হয়েছিল। এ ধরনের মেলা উভয় দেশের পণ্যের প্রচার এবং প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।[৪৬]

মিয়ানমার ও বাংলাদেশ উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে পর্যাপ্ত ক্ষেত্র রয়েছে। তথাপি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য শক্তিশালী করার জন্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোর বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে; দুটি দেশই (১) বিনিয়োগ, (২) শিপিং বা বিমান ভ্রমণ, (৩) পর্যটন, (৪) সড়ক সংযোগ এবং (৫) মুদ্রা বিনিময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ চুক্তি করেনি। তবে ২০০২ সালের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী জেনারেল থান শোয়ে (General Than shwe) বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিনিয়োগ সহযোগিতা, সরাসরি সড়ক এবং জল পরিবহন সহযোগিতা এবং দ্বৈত করের পরিহারের বিষয়ে আলোচনা বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হয়। মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউ উইন অং (U Win Aung) এবং মোর্শেদ খান (Morshed khan) একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করে এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করায় এই সফরটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়।[৪৭]

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO- The World Trade Organization) বা আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা যথা ইইউ, আসিয়ান, সাফটা, এপটা (EU, ASEAN, SAFTA, APTA) ইত্যাদির মাধ্যমে বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দুদেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য ২০০৩ সালে বাংলাদেশ-মিয়ানমার যৌথ বাণিজ্য কমিশন (JTC- Joint Trade Commission) গঠিত হয়। এরপর যৌথ বাণিজ্য কমিশনের দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাণিজ্য সম্পর্কিত সমস্যা বা ইস্যু যেমন- এল/সি খোলা, পরিবহন, গ্যাস ও সারের পারস্পরিক বিনিময় ইস্যু, চুক্তিভিত্তিক কৃষিকাজ, মিয়ানমারের মধ্যে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, সীমান্ত বাজার এবং বাণিজ্য প্রদর্শনী ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

তবে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের বান্দরবন বনাঞ্চলের সীমান্ত থেকে অস্ত্র উদ্ধারের পর দুদেশের সীমান্ত বাণিজ্য স্থগিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ মিয়ানমারকে সীমান্ত জঙ্গিদের অবৈধ কার্যক্রম বন্ধের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানায়। মিয়ানমারের বাণিজ্য মন্ত্রী মেজর জেনারেল টিন নাঈং থেইন (Major General Tin Naing Thein)-এর নেতৃত্বে ২৪ জন সামরিক কর্মকর্তার একটি প্রতিনিধি দল ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সফরে আসেন। তখন জঙ্গিদের অবৈধ কার্যক্রম যে দু'দেশের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের বাধা সৃষ্টি করছে তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তবুও, জঙ্গিদের অবৈধ কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে থামানো যায়নি। এছাড়াও বাংলাদেশ রপ্তানি প্রমোশন ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দুদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধিতে কিছু বাধা

লক্ষ্য করেন। সেগুলো হলো- ক) অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব, খ) জল পরিবহণ চুক্তি বাস্তবানের অভাব; গ) ব্যাকিং ব্যবস্থা এবং সেবার অব্যবস্থাপনা এবং ভিসা সম্পর্কিত সমস্যা।

এছাড়াও মিয়ানমারে বদ্ধ অর্থনীতি এবং পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত। ফলস্বরূপ তারা মার্কিন ডলারে তাদের আমদানি-রপ্তানি কাজ করতে অক্ষম। একই কারণে মিয়ানমারের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অনেক সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। কাজেই তৃতীয় দেশের মাধ্যমে এল/সি (L/C) খুলে মিয়ানমারের সঙ্গে আমদানি বা রপ্তানি চলে। মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি থাকায় বাংলাদেশকে ইউরো বা সিঙ্গাপুর ডলারের মতো কোনো এশিয়ান মুদ্রার মাধ্যমে মিয়ানমারে রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয়ই এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU-Asian Clearing Union) এর সদস্য হওয়ায় এর অধীনে এল/সি খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিন্তু মিয়ানমারের ব্যাংকিং কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ইস্যু সম্পর্কে সচেতন নয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার যৌথ বাণিজ্য কমিশন (JTC- Joint Trade Commission)-এর সেমিনারে আলোচনার মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করা উচিত।[৪৮]

নিকটবর্তী প্রতিবেশী হওয়া স্বত্ত্বেও বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক এখনো প্রত্যাশিত স্তরে উন্নীত হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের তিন ধরনের বাণিজ্য রয়েছে- (ক) সরকারি বাণিজ্য, (খ) সীমান্ত বাণিজ্য এবং (গ) অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য। সরকারি বাণিজ্য এবং সীমান্ত বাণিজ্য চিত্র দেখা গেলেও কিন্তু পরিসংখ্যানে অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্যের কোন চিত্র দেখা যায় না।[৪৯]

মিয়ানমার হতে বাংলাদেশে আসে মাছ, মসলা, হলুদ, ডাল, পিঁয়াজ, ছোলা, বড়ই, বড়ইয়ের আচার ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ হতে মিয়ানমারের বাজারে যায় রড, সিমেন্ট, এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী, কসমেটিক্সসহ কিছু অপ্রচলিত পণ্য। সেসব পণ্যের মধ্যে গরুর ভুঁড়ি, কচ্ছপের খোল, হাঙ্গরের চামড়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মিয়ানমারে বাংলাদেশের ঔষধ এবং সিরামিক্স সামগ্রীর চাহিদা থাকলেও সেভাবে রপ্তানি হয় না। মিয়ানামারের সঙ্গে বাংলাদেশের বৈধ আমদানি রপ্তানির তুলনায় চোরাচালানীর ব্যবসা অনেক বেশি জমজমাট। নদী ও সমুদ্র পথে বিপুল পরিমাণে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক চালান হয়ে যাওয়া কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশের জন্য লাভজনক নয়। আমদানি করা সার ভর্তুকি দিয়ে চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। সেই সার চাষীদের মাঝে বিতরণ না করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী মিয়ানমারে পাচার করে দেয়। বিনিময়ে সে দেশ হতে পাচার হয়ে আসে আচার, ফোমের জুতা, বার্মিজ চাদর, লুঙ্গি এমনকি ক্ষতিকর উত্তেজক ঔষধ। বিরাজমান এই পরিস্থিতি আদর্শ বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে না।

মিয়ানমারের দীর্ঘমেয়াদী সামরিক শাসন এবং বদ্ধ অর্থনৈতিক নীতির কারণে মূলত দুদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে রোহিঙ্গা সংকট, দ্বিপাক্ষিক সীমান্ত উত্তেজনা, অবৈধ মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান, সামুদ্রিক সীমানা বিরোধ এবং জঙ্গি তৎপরতা দুদেশের দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ককে ব্যাহত করে।[৫০] বাংলাদেশ মিয়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্য অগ্রগতির জন্য উপযুক্ত বাণিজ্য কূটনীতি অনুসরণ করেনি। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে বর্তমান বাণিজ্যের ভলিউম এবং ধরন উভয় দেশের মধ্যকার বাণিজ্যে বৈচিত্র্য বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। বিদ্যমান আমদানির পণ্য ছাড়াও, বাংলাদেশ সরকার কাগজ ও

কাগজ পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, জি আই পাইপ, বৈদ্যুতিক তার এবং ক্যাবলস, রেডিমেড গার্মেন্টস এর মতো অন্যান্য পণ্য সামগ্রী রপ্তানি করার জন্য মিয়ানমারের সঙ্গে সুসংহত আলোচনা শুরু করতে পারে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ মিয়ানমার থেকে আরো কিছু পণ্য আমদানি করতে পারে যেমন- কাঁচা রাবার, পাল্‌সেস এবং সুপারি।[৫১]

দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হলো উন্নত পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিয়মিত জল পরিবহণে অব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার অভাব এবং বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের জন্য ভিসা সীমাবদ্ধতা। বর্তমানে চট্টগ্রাম-রেঙ্গুন-আকিয়াব-চালনা বন্দরে নিয়মিত শিপিং ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। এছাড়াও লক্ষ্যণীয় যে, মিয়ানমার থেকে মাঝে মাঝে চট্টগ্রামে শুধুমাত্র আমদানি পণ্যের জন্য জাহাজ আসে। অন্যদিকে চাহিদা অনুযায়ী বাংলাাদেশী পতাকাবাহী জাহাজ ইয়াঙ্গুন অথবা আকিয়াবে যায় শুধুমাত্র চাল ও অন্যান্য পণ্য আমদানি করতে।[৫২]

যদিও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য খুব ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে, তবুও মিয়ানমার থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশের সংকট মোকাবিলা করতে চাল আমদানির প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে উভয় দেশের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ের সফর বিনিময়ে অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে সহযোগীতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখা যায়।[৫৩]

বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য পরিসংখ্যান

বাংলাদেশ-মিয়ানমারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করা প্রয়োজন। মিয়ানমার, বাংলাদেশ ও ভারত একত্রিত হয়ে 'ত্রিমুখী' ধারণা বাস্তবায়ন করলে নিশ্চিতভাবে তিন দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার দুদেশের সরকারের পক্ষ থেকে বৈধ সীমান্ত বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ-মিয়ানমার দুদেশের বৈধ বাণিজ্যের অবনতি হয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এমনিতেই অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশির ভাগটাই আমদানি-রপ্তানির ভলিউম নগণ্য। বিশ্বের যেসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, তার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ঘাটতি অবস্থা।

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য প্রচলিত পণ্যের তালিকা মোটেও দীর্ঘ নয়। কিন্তু যতটুকু আছে অনেকক্ষেত্রে তারও সদ্ব্যবহার সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা। কোনো কোনো দেশের রক্ষণশীল নীতি ব্যবহারের কারণেও বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার বাধাগ্রস্ত হয়। প্রতিবেশী মিয়ানমারে বাংলাদেশের প্রচলিত এবং অপ্রচলিত অনেক পণ্যেরই চাহিদা রয়েছে। সে দেশের বাজারে সহজ প্রবেশাধিকার পাওয়া গেলে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি অনেকটাই কমে আসতে পারে। এক্ষেত্রে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশিত।

বিশ্বের প্রায় ১৩০টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। এরমধ্যে ৯০টি দেশের সঙ্গেই বাণিজ্য ঘাটতি। সার্কভুক্ত নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও পাকিস্তানের সঙ্গেও বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বিপুল। সার্কের বাইরে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কম করে হলেও দেড়শত কোটি টাকা। আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে এরূপ ভারসাম্যহীনতা জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব যে রেখে যাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।[৫৪]

১৯৯০ থেকে ১৯৯৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩০.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে আমদানি ছিল ৩৮.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময় মিয়ানমার উদ্ধৃত বাণিজ্য সম্পর্ক চালিয়ে যায়। ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৩-৯৪ প্রথম চার অর্থবছরে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৯৪-৯৫ থেকে ১৯৯৭-৯৮ শেষ চার অর্থবছরে রপ্তানি সমহারে হ্রাস পায়। অন্যদিকে একই সময়ে প্রথম চার অর্থবছর আমদানি বৃদ্ধি পায় এবং শেষ চার অর্থবছর আমদানি সমহারে হ্রাস পায়। বাংলাদেশ-মিয়ানমার বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল অনুসারে, ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে দুদেশের মধ্যে মাত্র দেড় কোটি টাকার মতো বৈধ বাণিজ্য হয়। কিন্তু এই সময়ে অন্তত ৫শ' কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী চোরাচালান হয়। অবৈধ পথে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বর্মী লবণ এবং নিষিদ্ধ সিগারেট এসেছে। ১৯৯৮-৯৯ এই এক বছরে এ দুটি পণ্যই এসেছে অন্তত ১শ' কোটি টাকার। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, পুলিশ এবং বিডিআর এ সময়ে প্রায় ২০ কোটি টাকার বর্মী লবণসহ নিষিদ্ধ পণ্য আটক করেছে। সর্বোপরি বাংলাদেশ-মিয়ানমারের আমদানি-রপ্তানি চিত্র স্থিতিশীল অবস্থায় নেই তা নিম্নের টেবিল ২-এ তুলে ধরা হলো-[৫৫]

টেবিল-২

আমদানি এবং রপ্তানি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

অর্থবছর	রপ্তানি	আমদানি	বাণিজ্য ভারসাম্য
১৯৯০-৯১	০.১৯	০.৩০	(-) ০.১১
১৯৯১-৯২	০.৫৮	০.১৩	(+) ০.৪৫
১৯৯২-৯৩	৬.৭৩	২.৪৮	(+) ৪.২৫
১৯৯৩-৯৪	১০.৩৬	৬.৬৭	(+) ৩.৬৯
১৯৯৪-৯৫	৪.৪২	৮.৯৮	(-) ৪.৭৪
১৯৯৫-৯৬	৩.৩৩	৩.৩৭	(-) ০.০৪
১৯৯৬-৯৭	৩.৪৫	৩.৮	(+) ০.৩৭
১৯৯৭-৯৮	১.৩৯	১২.৩৯	(-) ১১
মোট	৩০.২৮	৩৮.১২	(-) ৭.৮৫

উৎস- Brief on Bangladesh-Myanmar Trade Relations (1996), Bangladesh, Ministry of Commerce.

১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে রপ্তানি হতো পাট জাতীয় দ্রব্য, অপরিশোধিত রাবার, রাসায়নিক, ইউরিয়া সার, কচ্ছপের খোলস, কন্ডেন্সড মিল্ক, ঔষধ, ময়দা, ফেব্রিকস, এমএস রড, এলুমিনিয়াম পণ্য, কাপড় এবং চামড়া। অনেকগুলো রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ১৯.৯৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের রাসায়নিক সার রপ্তানি করে। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫.৪২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পাটজাতীয় পণ্য রপ্তানি করে। বাংলাদেশ অতিরিক্ত রপ্তানি করে কিছু ট্রান্সফরমার (০.০৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ফার্মাসিউটিক্যালস (০.২৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), অপরিশোধিত রাবার (০.০৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), কাঁচা পণ্য এবং চামড়া (০.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীসমূহ (২.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে পণ্য অনুসারে রপ্তানি চিত্র নিম্নের টেবিল ৩-এ দেওয়া হলো-[৫৬]

টেবিল-৩

(মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

পণ্য (মিলিয়ন ডলার)	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	মোট
পাট জাতীয় দ্রব্য	-	০.০৩৬	১.২৩	০.০২	২.৮৬	১.২৭৮	-	প্রযোজ্য নয়	৫.৪২৪
অপরিশোধিত রাবার	-	-	০.০২৭	০.০৭	-	-	-	প্রযোজ্য নয়	০.০৯৭
রাসায়নিক সার	-	০.৫৩	৫.৪৭	১০.২৩	১.১৭	২.৪২	২.৩৪১	প্রযোজ্য নয়	১৯.৯৮৩
ফার্মাসিউটিক্যালস	০.১৮৭	০.০১৪	-	-	০.০৫২	০.২৬	-	প্রযোজ্য নয়	০.২৭৯
কাঁচা পণ্য এবং চামড়া	-	-	-	০.০৫	-	-	-	প্রযোজ্য নয়	০.০৫
অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	-	-	-	-	০.৬	.৩৯৪	১.০৮৬	প্রযোজ্য নয়	২.০৮
ট্রান্সফরমার	-	-	-	-	০.০৩৩	-	-	প্রযোজ্য নয়	০.০৩৩

উৎস- Brief on Bangladesh-Myanmar Trade Relations (1996), Bangladesh, Ministry of Commerce.

১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আমদানি পণ্যের ধারাবাহিকতায় রয়েছে প্রধানত কৃষি পণ্য যেমন- চাল, মটরশুঁটি, ডাল, ভুট্টা এবং সুপারি, বাদাম, পাল্প, খনিজ, লগ, শুকনো মরিচ, শুটকি, প্যাড লক্স, অপরিহার্য বালি, বাঁশের পণ্য, টায়ার, আচার, খাঁজ, লোহার স্ক্র্যাপ, হলুদ, কাঁঠাল, বাল্ব, মুগডাল, কুক্কুট মটরশুঁটি, আদা, সবজি, ডেনীলীফ, কাঠের পেন্সিল, ছাতা, জুতা, চিংড়ি, নারকেল, প্রস্তুতকৃত খাবার, পানীয়, স্পিরিট এবং ভিনেগার, তামাক এবং প্রস্তুতকৃত তামাক, স্যান্ডেল এবং পাইলন প্রভৃতি। এ সময়ে ১৮.৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সবজি পণ্য, পশু তেল এবং চর্বি আমদানি হয়। একই সময়ে ১২.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের কাঠ এবং কাঠের পণ্যসমূহ আমদানি হয়। সেইসঙ্গে বাংলাদেশ কিছু প্রস্তুতকৃত খাদ্যসমূহ, স্পিরিট, ভিনেগার এবং তামাক (৫.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং রাসায়নিক বা সংশ্লিষ্ট শিল্পজাত পণ্যসমূহ (০.০২২৭ মিলিয়ন

মার্কিন ডলার) এবং অন্যান্য পণ্যসমূহ (০.১৮ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার) মিয়ানমার থেকে আমদানি করে। ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পণ্য অনুসারে আমদানি চিত্র নিম্নের টেবিল ৪-এ দেওয়া হলো-[৫৭]

টেবিল-৪

(মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

পণ্য (মিলিয়ন ডলার)	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	মোট
কাঠ এবং কাঠের পণ্যসমূহ	০.২৭	-	০.৬৪	১.৭৪	১.৬৯	১.৪	৩.১৮	৩.৪৩	১২.৩৫
সবজি পণ্য, পশু তেল এবং চর্বি	-	০.০৮	১.৮৬	৪.৮৫	৭.২৯	০.৫	০.৫৩	৩.৮৩	১৮.৯১
রাসায়নিক বা সংশ্লিষ্ট শিল্পজাত পণ্যসমূহ	-	-	০.০১	০.০০৬	-	.০০৪৭৮	.০০২০০৭	-	০.০২২৭
প্রস্তুতকৃত খাদ্য স্টাফ, স্পিরিট, ভিনেগার এবং তামাক	-	-	০.০১	০.০০৬	-	.০০৪৭৮	.০০২০০৭	-	০.০০৬৭৮৭
প্রস্তুতকৃত তামাক	-	-	-	-	-	-	-	৫.১৩	৫.১৩
অন্যান্য	০.০৭	০.০৪	-	০.০৭	-	-	-	-	০.১৮

উৎস- Brief on Bangladesh-Myanmar Trade Relations (1996), Bangladesh, Ministry of Commerce.

মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি অব্যাহতভাবে বেড়েই চলেছে। দুদেশের মধ্যে এ্যাকাউন্ট ট্রেড চালুর আগেই চুক্তির মেয়াদ শেষ এবং যৌথ বাণিজ্য কমিশনও কাজ করছে না। ২০০২-০৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ১শ' ৪৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা বা ৩ কোটি ৪৭ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার। এ ঘাটতি আগের অর্থবছরের তুলনায় ১ কোটি ৯১ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার বেশি। বাংলাদেশ ২০০২-০৩ অর্থবছরে মিয়ানমার থেকে ১শ' ৫১ কোটি ৩০ লাখ টাকা বা ২ কোটি ৬১ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করে। আর বিপরীতে রাসায়নিক পণ্য, নিটওয়্যার রপ্তানি করে ৫ কোটি ৭০ লাখ টাকা বা ৯ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার

আয় করেছে। শুধু ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরেই বাণিজ্য ব্যবধান বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। আগের বছরের তুলনায় ২০০১-০২ অর্থবছরে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের আমদানি কম ছিল। কিন্তু ২০০২-০৩ অর্থবছরে আমদানি আবার বেড়ে যাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। নিম্নের টেবিল ৫-এ আমদানি-রপ্তানির এ চিত্র তুলে ধরা হলো-

টেবিল -৫

বছর	রপ্তানি	আমদানি (কোটি টাকায়)
২০০২ - ২০০৩	৫.৭০	১৫১.৩০
২০০১ - ২০০২	১৩.৭৮	৯৭.২৯
২০০০ - ২০০১	৫.৮৮	১৩৩.২৬
১৯৯৯ - ২০০০	৩.০০	৬৫.৮৮
১৯৯৮ - ১৯৯৯	৬.১০	৭৪.২২
১৯৯৭ - ১৯৯৮	৬.২৬	৩৮.৭২
১৯৯৬ - ১৯৯৭	১৪.৭৩	১৬.২৩
১৯৯৫ - ১৯৯৬	৮.২০	৭.৭৯

উৎস- Import Payment, Bangladesh Bank & Export Statistics, Export Promotion Bureau & Bangladesh Bank.

এটি উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য এফটিএ-(FTA- Free Trade agreement) এর প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালের ১৯শে মার্চ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতাও বাস্তবায়ন হয়নি।[৫৮] নিম্নের টেবিল ৬-এ ২০০৩-০৪ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য চিত্র তুলে ধরা হলো-

টেবিল-৬

(মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

অর্থবছর	রপ্তানি	আমদানি	বাণিজ্য ভারসাম্য
২০০৩ - ২০০৪	৩.৯৩	২৬.৫৩	(-)২৩.০০
২০০৪ - ২০০৫	৪.০৭	৩২.৫৯	(-)২৮.৫২
২০০৫ - ২০০৬	৫.১৪	২৯.৫৭	(-)২৪.৪৩

উৎস- Export Promotion Bureau (EPB) and Bangladesh Bank.

উক্ত টেবিলে দু'দেশের বাণিজ্য চিত্র খুবই নগণ্য। তবে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের রপ্তানির পাশাপাশি সেই দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য তালিকা বেশিরভাগই অস্থিতিশীল। এর দুটি প্রধান কারণ রয়েছে; প্রথমত, বাণিজ্য সম্পর্ক এখনও অপর্যাপ্ত এবং দ্বিতীয়ত, মিয়ানমার থেকে একমাত্র প্রধান আমদানি পণ্য চাল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ যখন খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হয়, মিয়ানমারে থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে খাদ্য আমদানি করা হয়, ফলে বাণিজ্য ভারসাম্য মিয়ানমারের অনুকূলে।[৫৯]

মিয়ানমার সামুদ্রিক পণ্য, মটরশুটি, ডাল এবং রান্নাঘরের সামগ্রী বাংলাদেশে রপ্তানি করে আর ফার্মাসিউটিক্যালস, সিরামিক, কটন কাপড়, কাঁচা পাট, প্রসাধনী এবং আনুষঙ্গিক বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে। ২০০৮ সালে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ১৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা দুদেশ ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৫শ' মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার চেষ্টা করে। টেবিল ৭-এ ২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছরের আমদানি- রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হলো-[৬০]

টেবিল-৭

(মূল্য-ডলার মিলিয়ন)

বছর	রপ্তানি	আমদানি	বাণিজ্য অনুপাত
২০০৫-০৬	৩৪৬.১৩ (৫.১৪)	১৯৮৩.৬ (২৯.৫৭)	১: ৫.৭৫
২০০৬-০৭	৪০৯.৩৫ (৫.৯৩)	১৪১৯.৪ (২০.৫৬)	১:৩.৪৬
২০০৭-০৮	৬৫৮.৫৬ (৯.৬)	৭৯৪৪.৫ (১১৫.৮১)	১:১২.০৬
২০০৮-০৯	৬৩২.৯৬ (৯.২)	৪৮৮৫.৫ (৭১.০১)	১:৭.৭২
২০০৯-১০	৬৯৩.৮৭(১০.০৩)	৪৮১৮.৯ (৬৯.৬৫)	১:৬.৯৪

উৎস- Import Payment, Bangladesh Bank & Export Statistics, Export Promotion Bureau & Bangladesh Bank, 2010.

নিচের টেবিল-৮ বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরের চলমান বাণিজ্যের সূচক নির্দেশ করে। মিয়ানমারে শীর্ষ ৫টি রপ্তানি পণ্যের মোট রপ্তানির ৯৪.৬ শতাংশ (প্রায়) এবং শীর্ষ ৫টি আমদানি পণ্যের মোট ৯৯.৭ শতাংশ (প্রায়) পণ্য আমদানি হয়। মিয়ানমারে প্রধানত বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য রপ্তানি হয়। মিয়ানমারে মোট রপ্তানি পণ্যের ৫০ শতাংশের বেশি ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য রপ্তানি হয়। রপ্তানির পণ্যে দ্বিতীয় স্থানে লৌহ ও ইস্পাত রয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ২০০৯-১০ অর্থবছরে মিয়ানমারের কাঠ ও কাঠ জাতীয় ভারী পণ্যের আমদানি করে মোট ৬৯.৬ মিলিয়ন ডলার যেখানে ৪১.৩ (৫৯.৩ শতাংশ) মিলিয়ন ডলার নিবন্ধিত হয়। এছাড়া উদ্ভিজ্জ পণ্য, খাদ্য, জীবন্ত প্রাণী ও মাছের তালিকা নিম্নের টেবিল ৮-এ দেয়া হলো-[৬১]

টেবিল-৮

(ডলার মিলিয়ন)

পণ্য	২০০৯-১০ সালে (ডলার মিলিয়ন) পণ্য রপ্তানি	পণ্য	২০০৯-১০ সালে (ডলার মিলিয়ন) পণ্য আমদানি
মিয়ানমারে রপ্তানি	১০.০	মিয়ানমার থেকে আমদানি	৬৯.৬
ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য	৫.৬	কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য	৪১.৩
লোহা ও ইস্পাত	৩.৩	উদ্ভিজ্জ পণ্য	২৫.৩
লবণ, সালফার, পাথর, প্লাস্টার, চুন ও সিমেন্ট	০.৩	খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত; পানীয়, প্রফুল্লতা এবং ভিনেগার; তামাক;	১.৪
বেস মেটালের বিবিধপণ্য	০.২	জীবিত পশু ও প্রাণীর বিবিধ পণ্য;	১.২
প্রাণীজ খনিজ জ্বালানি, তেল, পাতন পণ্য, ইত্যাদি	০.১	প্রাণী বা উদ্ভিজ্জ চর্বি এবং তেল	০.৩
উপ-মোট - শীর্ষ ৫ পণ্য	৯.৫	উপ-মোট - শীর্ষ ৫ পণ্য	৬৯,৪
মিয়ানমারে শীর্ষ ৫ পণ্যের মোট রপ্তানি অংশ	৯৪,৬	মিয়ানমার থেকে শীর্ষ ৫ পণ্যের মোট আমদানি অংশ	৯৯.৭

উৎস- Export Promotion Bureau (EPB) Data, 2011

উভয় দেশের মধ্যে যথাযথ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার অভাব এবং শিপিং চুক্তির অ-বাস্তবায়নের কারণে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। গত দশকে বাণিজ্যের ভারসাম্য চিত্র সবসময়ই মিয়ানমারের অনুকূলে ছিল। ইতিবাচক ধারণা ও আনুষ্ঠানিক বাণিজ্য চুক্তি সত্ত্বেও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রত্যাশিতভাবে উন্নত হয়নি।[৬২] বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে বাণিজ্য পরিসংখ্যান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রাথমিক কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকায় একটি সুষম বাণিজ্য সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হয়েছে তা নিয়েই দুদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং ট্রান্সশিপমেন্টের মাত্রা বোঝা দরকার।[৬৩]

বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চোরাচালান এবং বৈধ ব্যবসায়ীদের শুল্ক বিভাগের অসহযোগীতার কারণে অবৈধ বাণিজ্য বাড়ায় প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত বাণিজ্যে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটছে। তাই ১৯৯৪ সালের ১লা ডিসেম্বর বাংলাদেশ-মিয়ানমার উভয় দেশই পারস্পরিক সহায়তার জন্য মাদকদ্রব্য, উত্তেজক পদার্থ এবং এ জাতীয় দ্রব্যের অবৈধ পাচার প্রতিরোধের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। দুদেশের সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী (Abdul Matin Chowdhury) এবং মিয়ানমারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এইচ.ই.লে. জেনারেল মেয়া থিন (H.E. Lieutenant General Mya Thin)। উভয় দেশ সাংবিধানিক, আইনি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়ে সম্মত হয়-

ক. পরিচালনাগত, প্রযুক্তিগত এবং সাধারণ প্রকৃতির তথ্য বিনিময়ের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে সংযোগসাধনকারী কার্যকর সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন।

খ. প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানমূলক কৌশল নিয়োগ সহ পরিচালনাগত বিষয়ে আবেদনের ভিত্তিতে একে অন্যের সহায়তা করবে।

গ. অবৈধ মাদক সরবরাহ অঞ্চলগুলি এবং ল্যাবরেটরিগুলি চিহ্নিত ও ধ্বংস করা এবং যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই ক্যানবিচ ও আফিয়াম পপির অবৈধ চাষকে চিহ্নিত ও নির্মূল করা।

ঘ. মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি করে সংরক্ষণ, বিতরণ এবং বিক্রয়, অবৈধ মাদকদ্রব্যের কারখানায় উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে এমন প্রারম্ভিক, প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রাবকের নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণ করা। এবং

ঙ. প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং জনসচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে এর চাহিদা কমানো।[৬৪]

এরপরও বিভিন্ন কারণে বৈধ সীমান্ত বাণিজ্যে ধস নামার পাশাপাশি বেড়ে চলেছে চোরাচালান। বাংলাদেশ থেকে রড, সিমেন্ট এবং মিয়ানমার থেকে সিগারেট, লবন, মরিচ, আদা, ডিনার সেট, টয়লেট্রিজ, দুধ এবং মাদকদ্রব্য প্রভৃতি টেকনাফের সীমান্ত অঞ্চল নয়াপাড়া, জালিপাড়া, জাডিমুড়া এবং নীলা হয়ে চোরাচালান করা হয়। মে থেকে জুলাই '৯৭ বাংলাদেশে নাফ নদীর সীমানা দিয়ে ডলার, চাল কেরোসিন, ডিজেল এবং ঔষধের বিনিময়ে অবৈধভাবে মিয়ানমার থেকে প্রচুর পরিমাণে লবণ এসেছে। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের নাগরিকেরা ট্রানজিট পাস (গমনামনের অনুমতিপত্র) নিয়ে আট ঘন্টার জন্য সীমান্ত পেরিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে পারে। সেজন্য তাদের ৩০ টাকা কর দিতে হয়। ট্রানজিট পাসধারীদের চলাচল সীমান্তের পাঁচ মাইলের মধ্যে সীমিত থাকে। এই পদ্ধতি ১৯৪৭ সালের পর চালু হয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত চুক্তিতে তা নবায়ন করা হয়। চুক্তিতে উল্লেখ ছিল, পাসধারীরা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় উপহার হিসেবে ৮শ' টাকা মূল্যের মালামাল নিয়ে যেতে পারবে। এর জন্য কোনো শুল্ক দিতে হবে না। এই অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে ২০০৯ সালে স্থানীয়ভাবে ৩ হাজার টাকার মালামাল বহন করার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রায় ৫শ'টি পাস ইস্যু করা হলেও নিয়মিত ব্যবহৃত হয় প্রায় ১৫০টি পাস। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০ জন এই পাস ব্যবহার করে। মিয়ানমার থেকেও গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৮০ জন মালামালসহ বাংলাদেশে আসেন। পাসধারীরা টেকনাফ বাজার সংলগ্ন ট্রানজিট ঘাট দিয়ে যাতায়াত করে। এই পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা শুল্ক ছাড়া দ্রব্য সামগ্রী এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যায়। বাংলাদেশীরা মংডু শহরে গিয়ে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করে। তাঁরা অর্থাৎ ভ্রমনকারীরা গেঞ্জি, বিস্কুট, চিপস, হালকা পানীয়, প্লাষ্টিক দ্রব্য, আলকাতরা নিয়ে যায়। মিয়ানমার থেকে আসে আচার, তোয়ালে, চাদর, স্যান্ডেল, থামি (লুঙ্গি), বার্মিজ কাপড়, লজেন্স, প্রসাধন ইত্যাদি। এছাড়াও ট্রানজিট পাসের সাহায্য নিয়ে হেরোইন ও ইয়াবাসহ ভয়ঙ্কর সব মাদকদ্রব্য নির্বিঘ্নে সীমান্ত পার হয়।[৬৫]

এছাড়াও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রান্তে পার্বত্য বান্দরবন জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে কক্সবাজার জেলার উখিয়া হয়ে টেকনাফ সেন্টমার্টিন দ্বীপ পর্যন্ত প্রায় ৪শ' কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তের সর্বত্র চোরাচালান বিরাজমান। পশ্চিম মিয়ানমারের আরাকান ও সিন প্রদেশের সঙ্গে বিস্তীর্ণ সীমান্তের মাঝে রয়েছে দুর্গম পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র এবং নাফ্ নদ। দুদেশের বিশেষকরে মিয়ানমারের চোরাচালানীরা শত শত যুবককে কাজে লাগিয়ে প্রতিদিন বিপুল পণ্য-সামগ্রী আনা নেয়া করে। এমনকি তারা সোনা, হীরা, অস্ত্রশস্ত্র এবং মাদকদ্রব্যও চোরাচালান করে। এরফলে একদিকে অপরাধ বাড়ে, অন্যদিকে বাংলাদেশ বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হয়। দীর্ঘ সামরিক শাসন, স্ব-আরোপিত বিচ্ছিন্নতা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে সামরিক জান্তারা তাদের রাজস্বের জন্য মিয়ানমারে প্রচুর পরিমাণে পপির চাষ করে এবং অবৈধ মাদক ব্যবসা করে। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্ত বার্মিজ ব্যবসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল হয়ে ওঠে। এরফলে সামরিক চাপে সান প্রদেশে (পূর্ব মিয়ানমার) হেরোইন উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং চীন প্রদেশে হেরোইন প্রক্রিয়াকরণ হয়, যা বাংলাদেশের সীমান্ত নিকটবর্তী। মিয়ানমারের হেরোইন ব্যাপক পরিমাণে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারের জন্য পাচার হয়। আজকের দিনে হেরোইন নিয়মিত ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং সেইসঙ্গে আফিম পপিও বাংলাদেশের সীমানার কাছে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। উপরন্তু, মিয়ানমার বিশ্বের দ্বিতীয় আফিম উৎপাদনকারী দেশ এবং বিখ্যাত গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলের কাছাকাছি অবস্থিত। অবৈধ মাদক ব্যবসার স্বর্গরাজ্যের জন্য বাংলাদেশ বিপদের মুখে এবং মিয়ানমারের পরিপূর্ণ সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশের পক্ষে এটার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

কাজেই মিয়ানমারে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনার দ্বার অবারিত করা গেলে তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে আরও সম্প্রসারণের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলবে। বাণিজ্য ভারসাম্য বজায় রেখে রফতানিযোগ্য পণ্যের মান বাড়িয়ে চাহিদা সম্পন্ন দেশে পাঠালে তা একটি সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। এটা সুষ্ঠু বাণিজ্য নিশ্চিত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল, ব্যবসায়িক কাজ পরিচালনার জন্য উভয় দেশের সরকার ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তা যেমন দরকার তেমনি দরকার উন্নতমানের থাকা-খাওয়ার জন্য নিরাপদ হোটেল, প্রবাসে টাকা ও ডলার ভাঙ্গানোর সহজ পথ ও ব্যাংকিং সুবিধা। যতক্ষণ না তা করা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও তার সাফল্য সম্ভাবনা ক্ষীণ। কাজেই সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি সফলতার জন্য সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে দুদেশের সদিচ্ছা, সমঝোতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক।[৬৬]

মিয়ানমারে চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ

মিয়ানমারের ভৌগোলিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে বাংলাদেশের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সম্ভাব্য বাজার ব্যবস্থা উভয় প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। আরাকান পর্বতশ্রেণী বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের রাখাইন ও চিন প্রদেশকে সমগ্র মিয়ানমার থেকে আলাদা করেছে। মিয়ানমার এই দুটি রাজ্যে চুনাপাথর (লক্ষ লক্ষ টন), কাঠ, বাঁশ

বাঁশ (৭০০ বর্গ কিলোমিটার- যা কর্ণফুলি পেপার মিলস অনেকবার চালানোর জন্য যথেষ্ট), সামুদ্রিক পণ্য এবং বিভিন্ন ধরণের মূল্যবান খনিজ সহ পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে।[৬৭]

তাছাড়া মিয়ানমার আয়তন বাংলাদেশের ৫ গুণ এবং জনসংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে ৪০% কম। মিয়ানমারে মাথাপিছু জমির পরিমাণ বাংলাদেশের তুলনায় ১২.৩ গুণ বেশি;[৬৮] সেখানে কৃষির উপযোগী বিপুল পরিমাণ জমি রয়েছে। মিয়ানমারে পর্যাপ্ত চাষযোগ্য জমি এবং বাংলাদেশ ঐ জমিতে চাষের জন্য জনশক্তির সমন্বয় করলে কৃষিখাতে সহযোগিতার মাধ্যমে উভয়ের অর্থনীতিই লাভবান হতে পারে। মিয়ানমার সরকারও বিদেশী বিনিয়োগকে গভীর আগ্রহ সহকারে স্বাগত জানাচ্ছে। এটা লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমানে মিয়ানমারের সঙ্গে চীন এবং থাইল্যান্ডের কৃষিচুক্তি রয়েছে। মিয়ানমার সরকার চট্টগ্রামে তথা বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদেরকে কৃষি ও খামার স্থাপনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদীতে জমি লীজ দিতে আগ্রহী।[৬৯]

মিয়ানমারের জমি ইজারা নীতি বেশ আকর্ষণীয় এবং বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীরা এই সুবিধা গ্রহণ করে মিয়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি ঘটাতে পারে কারণ বাংলাদেশে কৃষি ভিত্তিক শিল্প পণ্যের বাজার রয়েছে। ২০০৪ সালে উভয় দেশ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে।[৭০] উভয়পক্ষের সম্মতিতে প্রস্তাব যে, রাখাইনের রাজ্যের ৫০ হাজার একর জমি চুক্তিভিত্তিক খামারের জন্য দেওয়া হবে। প্রস্তাবটি ২০০৭ সালে একটি অতিরিক্ত প্রকল্পে উপস্থাপিত হয় যে, চট্টগ্রামের প্রায় ১০ হাজার কৃষক এই চুক্তিভিত্তিক কৃষিকাজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করতে পারবে। প্রস্তাবটির ফলে মিয়ানমারের চাষাবাদে বাংলাদেশি কৃষকরা উদ্ভাবনী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করবে। এছাড়াও মিয়ানমারে কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য জমি ইজারা প্রদান সংক্রান্ত একটি উদার নীতি রয়েছে। যেখানে বাংলাদেশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য মিয়ানমার সরকার পক্ষ থেকে ৩ বছর ধরে আয়কর মওকুফ এবং জমির জন্য ২-৮ বছরের ট্যাক্স অব্যাহতির প্রস্তাব রাখা হয়। বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদের সুযোগ বাংলাদেশের নিম্নগামী কৃষি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত লাভজনক। এছাড়াও মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা দ্রুত নগরায়ণের জন্য বাংলাদেশ তার চাষের জমি হারাচ্ছে।[৭১]

মিয়ানমার চা, তুলা, আখ, তামাক ইত্যাদি বাণিজ্যিক ফসল চাষের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ৫ হাজার একর জমি লীজ দেয়। অন্যান্য ফলের বাগান করার জন্য ৩ হাজার একর, মৌসুমী ফসল উৎপাদনের জন্য ১ হাজার একর, মৎস খামার করার জন্য ২ হাজার একর, মহিষ, গবাদি পশু এবং ঘোড়ার খামার করার জন্য ৫ হাজার একর, ভেড়া ও ছাগলের খামার করার জন্য ১ হাজার একর, হাঁস-মুরগীর খামারের জন্য ৫শ' একর জমি দীর্ঘমেয়াদে লীজ দেয়। মিয়ানমারের কৃষি মন্ত্রণালয় এই লীজ প্রদান করে। ২ বছর থেকে ৮ বছর পর্যন্ত জমির খাজনা দিতে হয় না। প্রকল্পের শ্রেণী বিচার করে জমির খাজনা মওকুফের সময় নির্ধারণ করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হওয়ার পর অন্তত তিন বছর কোনো আয়কর দিতে হয় না। আকিয়াব ও চিন প্রদেশ দুটি চট্টগ্রামের সন্নিকটে। এই দুটি প্রদেশে বিরাট চুনাপাথরের পাহাড় রয়েছে এবং ৭ হাজার বর্গমাইল জুড়ে বাঁশ উৎপাদন হয়। বিশেষজ্ঞদের হিসাবে, বার্ষিক ২৫ লাখ টন বাঁশ উৎপাদন হয়। এ থেকে বার্ষিক ৮ লাখ টন পাল্প

উৎপাদন হবে। মিয়ানমারের এই বাঁশ এমনি নষ্ট হয়ে যায়। অথচ বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা এগিয়ে এসে মিয়ানমারের বন, খনিজ এবং কৃষি সম্পদের ব্যবহার করে দুই দেশের সমৃদ্ধি আনয়ন করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম থেকে জাহাজ আকিয়াবের রাজধানী সিটুওয়ে যেতে মাত্র ১ দিন লাগে। আর সিটুওয়ে থেকে জাহাজযোগে ইয়াঙ্গুন অর্থাৎ রেঙ্গুন যেতে ৪ দিন লাগে। তাই আকিয়াব ও চিন প্রদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বাংলাদেশের পক্ষেও লাভজনক। ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামের লোকেরা বিশেষকরে বড়ুয়ারা (মগদের ফেলে যাওয়া বাঙালিপত্নী, শিশুদের 'বড়ুয়া বা Baruas' বলা হয়) আকিয়াব ও তৎকালীন বার্মার বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে বড় বড় যান্ত্রিক কৃষি খামার পরিকল্পনা করে লাখ লাখ টন চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করে অবাধে চট্টগ্রামে নিয়ে আসতেন।

কাজেই মিয়ানমারের জমি চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টি হলে বাংলাদেশের কৃষকগণ লিজ নেওয়া জমিতে পিঁয়াজ, ধান, সয়াবিন, ভুট্টা, চা ও আখ উৎপাদন করতে পারবে। এমনকি এসব জমিতে গবাদি পশু পালনও সম্ভব হবে। এতে মিয়ানমার পতিত জমির ইজারা বাবদ উল্লেখিত নগদ ডলার পাবে। আর বাংলাদেশ পাবে চাল-ডাল, শাক-সবজি ইত্যাদি উৎপাদন করে নিজ দেশের ঘাটতি দূর করার সুযোগ। ফলে দুই দেশের মধ্যকার শত বছরের প্রাচীন সম্পর্ক আরো জোরদার হবে এবং জনগণও একে অপরের আরো নৈকট্যে আসতে পারবে। এরপর পর্যায়ক্রমে ফলমূল উৎপাদন ও মৎস চাষের বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া লিজ গ্রহণের সময় জমি নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। সর্বোপরি লিজ নেওয়া জমি এ দেশের আগ্রহী ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে বরাদ্দ দেওয়া যাবে তার একটি সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা বাঞ্ছণীয়। বিশেষকরে এ ক্ষেত্রে মিয়ানমারে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের অগ্রাধিকার প্রদান করাই হবে সর্বোত্তম।[৭২]

অন্যান্য দেশের তুলনায় মিয়ানমারের চাল, ডাল, মসলা, স্বর্ণ, হীরা ও চিংড়ি মাছের দাম কম। বাংলাদেশের কয়েকজন ব্যবসায়ী আকিয়াব ও মংডু গিয়ে চিংড়ি খামার স্থাপন করে চিংড়ি উৎপাদন করে তা বাংলাদেশে রপ্তানি করে। টেকনাফ ও কক্সবাজারে এসব চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। আকিয়াব ও মংডু মিয়ানমারের অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রদেশ হলেও রাজধানী ইয়াঙ্গুন (পূর্বতন রেঙ্গুন) থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। কাজেই আকিয়াব ও মংডুর লোকেরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের চাষের জন্য মিয়ানমারের জমি ইজারা নেয়া বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সুযোগ। এটা খাদ্য নিরাপত্তা এবং চিংড়ি রপ্তানি বৃদ্ধির সাথে সাথে পোল্ট্রি ও দুগ্ধ, কৃষিকাজ সহ মিয়ানমারে কৃষিচাষ বিকাশের প্রত্যাশা তৈরি করে। কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগ বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অদক্ষতার কারণে হারিয়ে যেতে পারে। ভারত ইতোমধ্যে এই সুযোগ গ্রহণ করেছে।[৭৩] তাই বাংলাদেশও এই সুযোগ গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মিয়ানমারের প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জলবিদ্যুৎ খাতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ

মিয়ানমার বিশ্বের প্রাচীনতম তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে দেশটি প্রথমবারের মতো তেল রপ্তানি করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমে সর্বোচ্চ ও উন্নততর পর্যায়ে রয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে মিয়ানমারে বড় প্রক্রিয়ায় গ্যাসের কার্যক্রম শুরু এবং ১৯৯৮ সালে পাইপলাইনের সাহায্যে থাইল্যান্ডে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ হয়।[৭৪]

কয়েক বছর ধরে মিয়ানমারের শক্তির খাত প্রসার হওয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাস মিয়ানমারের আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। ২০০৪ সালে থাইল্যান্ডে প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করা হয়। মিয়ানমারে গ্যাস ও তেল খাতের এক তৃতীয়াংশেই বিদেশীদের সরাসরি বিনিয়োগ রয়েছে। শুধুমাত্র মিয়ানমারের শু গ্যাস ক্ষেত্র (Shwe gas field) থেকেই ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে যা থেকে প্রতি বছর ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত রাজস্ব প্রত্যাশা করা যায়। মনে করা হয় যে, ক-১ ব্লক-এর শু গ্যাস ক্ষেত্রের রিজার্ভ মূলত ভারতীয় বাজারের জন্য যা পাইপলাইনের সাহায্যে বাংলাদেশ হয়ে কলকাতা যাবে। এছাড়া ২০০৫ সালে মিয়ানমার পেট্রোচায়নার সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে যা পাইপলাইনের সাহায্যে মিয়ানমার থেকে চীনের কুনমিং যাবে। কাজেই চীনের সাথে মিয়ানমারের গ্যাস খাতে চুক্তি রয়েছে। মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট ইউ থেইন সেইন (U Thein Sein) আশ্বস্ত করে যে, ভবিষ্যতে নতুন আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বাংলাদেশে গ্যাস রপ্তানি করবে। মিয়ানমার বিশ্ববাজারে প্রবেশের পর থেকে মিয়ানমার দক্ষিণ-এশিয়ার মধ্যে অন্যতম শক্তির উৎস হিসেবে পরিচিত। যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য ভারত তার স্বার্থেই মিয়ানমারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে।[৭৫]

কেননা মিয়ানমারের বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি। ২০০৯ সালে এ খাতে আনুমানিক প্রায় ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এসেছে যা বছরের মোট রিজার্ভের দুই-তৃতীয়াংশ। মিয়ানমারের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি থেকে প্রায় ৭০ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। থাইল্যান্ড বিশেষ পরিমাণ গ্যাস আমদানি করে পাইপলাইনের মাধ্যমে এবং যার যোগান আনুমানিক ৮৫০-৯৫০ কোটি ঘনফুট। অন্যান্য শক্তি আমদানিকারক অঞ্চল হলো ভারত এবং চীন। উভয় দেশই ক্রমাগত তাদের শক্তি আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। উদাহরণ সরূপ, চীন ১৯৯০ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল রপ্তানিকারক হিসেবে পরিচিত। এই দেশগুলো প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করে তাদের সক্ষম করে তুলছে। তবে মিয়ানমারের সরকারি হিসাবে এই অর্থের সামান্য অংশই তুলে ধরে, কারণ জান্তা সরকারি বাজেটে প্রকৃত গ্যাসের আয় ৯৯ শতাংশেরও বেশি বাদ দিয়ে দেয়। ২০১০ সালের আগস্ট-এ মিয়ানমারের মাসিক মোট রপ্তানি আয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের হিসাব ৬৬.৫%। আইএমএফ (IMF-International Monetary Fund)-এর রিপোর্ট অনুসারে, মিয়ানমারের গ্যাস রপ্তানি থেকে ৭০ শতাংশ বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হয়। তবে স্বল্পমেয়াদী অন্যান্য দিক বাদ দিয়ে মিয়ানমারের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি আয়ের সার্বিক গতিপ্রকৃতি ক্রমাগতভাবে উর্ধ্বমুখী, যা নিম্নের টেবিল ৯-এ তুলে ধরা হলো-[৭৬]

টেবিল- ৯

মিয়ানমারের প্রতি অর্থবছরে (এপ্রিল-মার্চ) প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির হার এবং আয়

বছর	রপ্তানির হার (বিলিয়ন ঘনফুট)	মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা থেকে রপ্তানি আয় (ডলার মিলিয়ন)	থাই কাস্টমস থেকে রপ্তানি আয় (বাথ বিলিয়ন)
২০০৩-০৪	২০০.০৪	-	৩৭.৭২
২০০৪-০৫	৩৩৫.৫৩	-	৪৭.৭৩
২০০৫-০৬	৩২২.৭২	৯৫৯.১৮	৬৩.৫৮
২০০৬-০৭	৪৬০.০৯	১,৭৯৩.৫৮	৭৯.৬২
২০০৭-০৮	৫১৫.৬৯	২,১৪০.৮৬	৭৩.৪২
২০০৮-০৯	৩৭৬.৯৭	১,৯৯৬.২৬	১০১.২২
২০০৯-১০	২৯৭.৫৩	১,৫৯৬.৩১	১০৫.২৬

Source: Sean Turnell, "Burma's Economy 2011: Current Situation and Prospects for Reform", May 2011.

কাজেই মিয়ানমারের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। যা চীনা এবং কোরিয়ান কোম্পানির সাহায্যে উত্তোলনের প্রক্রিয়া চলছে। নতুন উত্তোলন উপকূল এবং স্থলভাগ উভয় জায়গায়ই চলছে। মিয়ানমারের গ্যাসের প্রধান ক্রেতা থাইল্যান্ড ও চীন। তাছাড়া শক্তির প্রধান উৎস জলবিদ্যুৎ। মিয়ানমারের পাহাড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সংরক্ষণাগার রয়েছে।[৭৭] কাজেই মিয়ানমারের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে বাংলাদেশেরও বিদ্যুৎ আমদানির সুয়োগ রয়েছে।

মিয়ানমারে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ সেঙ্গদী (Saingdin), লেম্রু (Lemro), অথবা মিচুয়াং (Mi Chaung) এরমধ্যে যে কোনো স্থানে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি স্থাপনের অনুমতির জন্য মিয়ানমারকে অনুরোধ জানায়। তবে ২০০৯ সালে মিয়ানমার অবগত করে যে, তারা সম্ভাব্য দুটি স্থান সেঙ্গদী এবং লেম্রু নদীর উপর স্থানীয় কোম্পানিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ইজারা দেন এবং রাখাইন রাজ্যের প্রয়োজন পূরণের পর তারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্বৃত্ত বাংলাদেশে রপ্তানির বিবেচনা করবে। শিউ তং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (Shwe Taung development co. Ltd) নামে একটি প্রাইভেট কোম্পানি রাখাইন রাজ্যে ৫শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ও বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানির আগ্রহ প্রকাশ করে।[৭৮]

মিয়ানমার একটি সমীক্ষায় ৫০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রকাশ করে। মিয়ানমারের এই সেক্টরে থাইল্যান্ড, চীন ও ভারত বিনিয়োগ করেছে। এ সময় বাংলাদেশ এই সুযোগটি গ্রহণে ব্যর্থ হয় যদিও এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে পারত। মিয়ানমারের ২০০ নদী থাকায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে এবং ১

লক্ষ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ (বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে) উৎপাদন করতে পারে যার প্রায় ১৫ শতাংশ মিয়ানমারের।[৭৯]

২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করা হয় আরাকান রাজ্যের লেম্রু (Lemro) এবং মিচুয়াং (Mi Chaung) এলাকায় দুটি বাঁধ নির্মাণের জন্য দু'দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। এই বাঁধ বাংলাদেশের কক্সবাজারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। বিদ্যুতের মোট পরিমাণ প্রায় ৫৭৫ মেগাওয়াট হতে পারে বলে আশা করা হয়, একটি বাঁধ ৫০০ মেগাওয়াট এবং অপরটি থেকে ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। তবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য কীভাবে অর্থায়ন করা হবে বা এর কোনো সময়সূচী প্রকাশ করা হয়নি।[৮০]

মিয়ানমার ভারতে তার প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির জন্য সচেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পাইপ লাইন সহযোগে তারা ভারতে গ্যাস সরবরাহ করতে চায়। ভারতও এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী। ত্রিদেশীয় গ্যাস পাইপ লাইনের বিষয়ে ইয়াঙ্গুনে ভারত, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মতৈক্য হয়। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সাগরবক্ষে অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস পরিবহনের জন্য মিয়ানমার-বাংলাদেশ-ভারত ত্রিদেশীয় পাইপলাইন প্রকল্প প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে দুইদিক থেকে বাংলাদেশের জন্য লাভজনক।

প্রথমত, এর মাধ্যমে গ্যাস সঞ্চালন চার্জ বাবদ বাংলাদেশ প্রতিবছর অর্থ অর্জনের সুবিধা লাভ করবে যা কিনা ডলারের বা সমমানের গ্রাস পাওয়ার মাধ্যমে হতে পারে।
দ্বিতীয়ত, এটা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে মিয়ানমার থেকে গ্যাস আমদানি করতে পারবে।

কাজেই বাংলাদেশ মিয়ানমারের মধ্যে যে কোনো সমস্যা শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার কথা ভাবা উচিত।[৮১]

মিয়ানমার থেকে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে সার উৎপাদন করে মিয়ানমারে রপ্তানির বিষয়টি বাংলাদেশ-মিয়ানমারের যৌথ বাণিজ্য কমিশনের দ্বিতীয় বৈঠকে আলোচনা হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার কোনো অগ্রগতি হয়নি। তবুও চট্টগ্রামের গ্যাস সংকট সমাধানে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশ অতিরিক্ত গ্যাস পাওয়ার সুযোগ থাকায় এই ইস্যু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উভয় দেশের বেশিরভাগ প্রাকৃতিক সম্পদই অব্যহৃত অথবা অনাবিষ্কৃত। তাই বাংলাদেশ-মিয়ানমার উভয়েরই বিনিয়োগ এবং ব্যবসার জন্য উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু উভয়েরই এখন পর্যন্ত খুবই সামান্য পরিমাণে বিনিয়োগ রয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের প্রচুর পরিমাণে সুয়োগ রয়েছে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ করার যা এখনও উন্মোচিত হয়নি। সম্প্রতি উভয় দেশের ব্যবসায়ীরা ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অন্য প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলেছে। পরে দ্যা ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (FBCCI- The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry) এবং দ্যা ইউনিয়ন অব মিয়ানমার চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (UMCCI- The Union of Myanmar Chambers of Commerce and Industry)-এর যৌথ উদ্যোগে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য এগিয়ে নিতে যৌথ বাণিজ্য কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বক্ষরিত হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারের জলবিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ, শক্তির জন্য গ্যাস আমদানি, সার

উৎপাদন এবং শিল্পজাত প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই বিষয়টি বাংলাদেশ-মিয়ানমারের যৌথ বাণিজ্য কমিশন (JTC- Joint Trade Commission) এর মাধ্যমে চূড়ান্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। যদি মন্ত্রণালয় এ কাজ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে এ ব্যাপারে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ- চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ও কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিকে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতিতে ভুগছে কিন্তু মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পাহাড়ী অঞ্চলে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিকল্প রয়েছে। এই বিষয় বাংলাদেশ-মিয়ানমারের যৌথ বাণিজ্য কমিশনের অধিবেশনেও উত্থাপিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের আলোচনার ধীরগতির কারণে একই কাজ মালয়েশিয়া কর্তৃক গৃহীত হয়। যদিও বাংলাদেশের তা করার সুযোগ ছিল; তাই সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে বাংলাদেশ চিরকালের জন্য এই সুযোগ হারাতে পারে।[৮২]

কাজেই সবদিক বিবেচনা করে কৌশলগতভাবেও উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপযোগী এবং উভয় দেশের জন্যই সুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে এবং বিপুল বাণিজ্য সম্ভাবনা বয়ে আনবে। এটা নিঃসন্দেহ যে, দুই দেশেরই নতুন চাহিদা থাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে পারস্পরিক বিনিয়োগ ও দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। যদিও রোহিঙ্গা সংঘাত ও অন্যান্য সীমান্ত সমস্যার কারণে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তবুও উভয় দেশরই একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করা উচিত।[৮৩]

বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা

উৎপাদনের অবকাঠামো এবং উৎপাদিত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকারের চলমান বিষয়গুলির সঙ্গে আঞ্চলিক যোগাযোগ জনসাধারণের জন্য হিতকর বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের কোনও সড়ক বা রেলওয়ে সংযোগ নেই। যদিও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ সর্বদা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সামান্যতম অবকাশও নেই। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত গতিশীলতা টেকসই যোগাযোগ অবকাঠামো ব্যতীত অর্জন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ যেমন প্রয়োজন, তেমনি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক দরকার। বিশ্বায়নের এই যুগে যোগাযোগের বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুপেক্ষণীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ সবদিক দিয়ে সহজ যোগাযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।[৮৪]

মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের আকাশ পথে বা সমুদ্র পথে কোনো সংযোগ নেই, কিন্তু বাণিজ্য উন্নত করতে এর সংযুক্তি আবশ্যক। ভারতের সঙ্গে মিয়ানমারের বিমান সংযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের বিমান সংযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে বিমান আসা-

যাওয়ার পথে সপ্তাহে অন্তত দুবার আধা ঘন্টার জন্য মিয়ানমারের রুটে থামতে পারে।[৮৫] বাংলাদেশ মিয়ানমার সরকারের অনুরোধে টেকনাফ ও সিটুওয়ের মধ্যে ২৫টি ছোট-ছোট অ-প্রচলিত জাহাজ চালানোর অনুমতি দেয়। এছাড়া বাংলাদেশ চট্টগ্রাম ও সিটুওয়ের মধ্যে দুটি সমুদ্র বন্দর সংযোগ স্থাপনেরও প্রস্তাব দেয়।[৮৬] এছাড়াও বাংলাদেশ সোনাদিয়াতে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ পরিকল্পনা করেছে যা আঞ্চলিককেন্দ্র হিসেবে এবং মিয়ানমার ও অন্যান্য এশীয় জাতিসমূহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরফলে উভয় দেশই অর্থনৈতিকের পাশাপাশি কৌশলগতভাবেও উপকৃত হবে।

ফলে দুদেশের মধ্যে নৌ, সড়ক ও আকাশ পথে যাতায়াত ও আমদানি-রপ্তানির পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থারও তথা অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম ও সিটুওয়ের মধ্যে বিমান সার্ভিস চালু এবং সিটুওয়ে-মংডু-কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের মধ্যে জাহাজ ও অন্যান্য নৌযান চলাচল সুবিধা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। দুদেশের যৌথ উদ্যোগে নাফ নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। যাতে বাংলাদেশের গুনদুম থেকে মিয়ানমারের তমব্রু পর্যন্ত সড়কপথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন সহজে সম্ভব হয়। সম্মত কার্যবিবরণীতে এসব বিষয়ে পৃথক কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরের কথা উল্লেখ করা হয়।[৮৭]

তাছাড়া ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে এবং হাইওয়ে নির্মিত হলে এশিয়ার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা যে ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে, ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (এসকাপ)-এর সদস্য এবং সহযোগী দেশ সমূহের সম্মতিতে এশিয়ান হাইওয়ে নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। এর দুবছর পর ১৯৬১ সালে এসকাপ ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। উভয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার স্থলভাগের দেশগুলির মধ্যে সহজ যোগাযোগের সুবিধা সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। উপরন্তু ইউরোপের সাথে স্থলপথে যোগাযোগ স্থাপন, যার মাধ্যমে এশিয়া ইউরোপের মধ্যে ব্যবসার প্রসার সহজ হবে। মূল পরিকল্পনায় ২৭টি দেশ এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক নানা কারণে বিশেষকরে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং আস্থার সংকট তীব্র হয়ে এসকাপের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হয়নি।

১৯৯২ সালে পুনরায় নতুন করে এসকাপ-এর পরিবহন ও পর্যটন বিভাগ প্রকল্পটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জোর তৎপরতা চালায়। এরমধ্যে ভারত, মিয়ানমার ও চীনসহ ১৮টি দেশ ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশেও এ সংক্রান্ত কর্ম প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা নিঃসন্দেহে আশার কথা।[৮৮]

এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমার হয়ে ইউনান প্রদেশের কুনমিং শহর ও চট্টগ্রামের মধ্যে একটি রেলওয়ে নেটওয়ার্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়। উপরন্তু, বাংলাদেশ প্রস্তাবিত ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে (TAR - Trans-Asian Railway) ইউনেসকেপ (UNESCAP- UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC) এর একটি প্রকল্পে তার পুনঃসংযুক্তির আগ্রহ প্রকাশ করে। এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৬টি দেশ যেমন মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের পাশাপাশি বাংলাদেশ সংযুক্ত হয়ে তুরস্কের মধ্য দিয়ে

ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংযুক্ত হবে।[৮৯] নিম্নে কুনমিং শহর ও চট্টগ্রামের মধ্যে একটি রেলওয়ে নেটওয়ার্ক চিত্র তুলে ধরা হলো-[৯০]

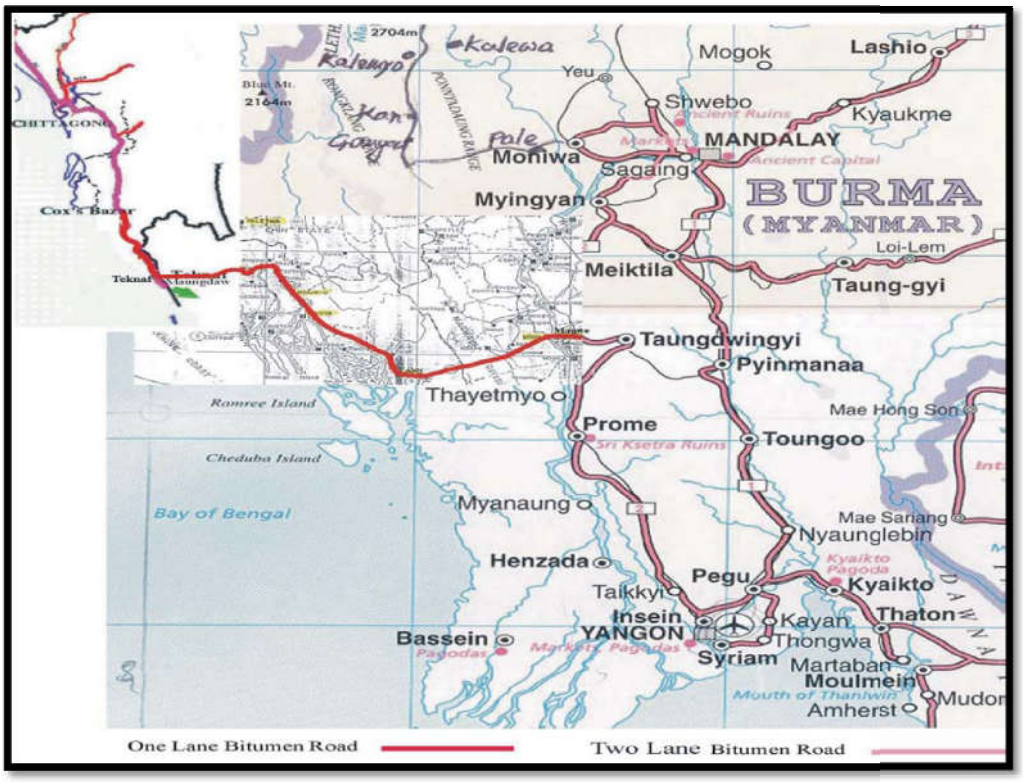

চিত্র- Kunming-Chittagong Road Link

উৎস- http://www.freit.org/WorkingPapers/Papers/TradePolicyRegional/FREIT575.pdf; *CENTRE FOR POLICY DIALOGUE* (CPD).

ইউরোপের তুরস্ক থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৬টি দেশ হয়ে এই রেললাইন মিয়ানমার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। এরপর এটি ভারত ও পাকিস্তানের দিকে চলে যাবে। ২০০১ সালে এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়। মিয়ানমার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের পর দেশের যশোর, রাজশাহী ও দর্শনা সীমান্ত দিয়ে এই রেললাইন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে। ২০০১ সালে কানাডা ও ফ্রান্সের দুইটি প্রতিষ্ঠান এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে লাভজনক খাত হিসাবে রিপোর্ট দেয়। ১৯৯৯ সালে বিদেশি দুইটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই ট্রান্স এশিয়া রেললাইন স্থাপনের সম্ভাব্যতা জরিপ কাজ শুরু হয়। পরে বাংলাদেশ ২০০১ সালে এ জরিপ কাজ শেষ করেন।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড ও মিয়ানমার হয়ে টেকনাফ এবং উখিয়া সীমান্ত দিয়ে লাইনটি বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। এরপর এটি চট্টগ্রামের উপর দিয়ে রাজশাহী ও যশোর সীমান্ত দিয়ে ভারত চলে যাবে। আর সেখান থেকে পাকিস্তান হয়ে আরো কয়েকটি দেশ ঘুরে ইউরোপের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। উখিয়ার গুনদুম থেকে ট্রান্স এশিয়ার মূল

রেললাইন রামু এলাকায় চলে আসলেও পর্যটকদের সুবিধার্থে সেখান থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত একটি শাখা লাইন দেয়া হবে। ২০০১ সালে দেয়া প্রতিবেদনে নতুন এই রেললাইন স্থাপনের জন্য ১ হাজার ৪শ' কোটি টাকা এবং ২ হাজার ৩শ' একর জমি অধিগ্রহণের উল্লেখ করা হয়।

এই রেললাইন স্থাপনের মাধ্যমে কক্সবাজারের উখিয়ায় অসংখ্য সিমেন্ট ও চুনাভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এছাড়া পূর্ব ইউরোপের ৬টি দেশে বর্তমানে মিটার গেজ রেললাইন চালু রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামে ডুয়েল রেললাইন চালু হলে মূল প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে চট্টগ্রাম।[৯১]

১০ই নভেম্বর ২০০৬ সালে জাতিসংঘ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (এসকাপ)-এর উদ্যোগে ইউরোপ ও এশীয় প্যাসিফিক বন্দরের মধ্যে আন্তঃমহাদেশীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্ক নির্মাণের জন্য ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।[৯২] ঐতিহাসিক সিল্ক ট্রেড রোডের উল্লেখ করে এই পরিকল্পনাটিকে "আয়রন সিল্ক রোড (The Iron Silk Road)" বলা হয়।[৯৩] ২০০৭ সালের ১০ই নভেম্বর বাংলাদেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে[৯৪] এবং ২০০৯ সালের ১১ই জুন চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়।[৯৫]

আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ১১৪,০০০ কিলোমিটার রেলওয়ে নিয়ে ৬০-এর দশকে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গঠনের উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল মালামাল এবং যাত্রীদের এসকাপ অঞ্চল এবং এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে দক্ষ সেবা প্রদান করা। ৬০, ৭০ এবং ৮০-এর দশকে আন্তর্জাতিকভাবে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক এর ধারণা বিকাশ লাভ করে। কিন্তু ৮০ এবং ৯০-এর দশকের শুরুতে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল যা উন্নয়নের ধারণাকে পুনর্জীবিত করে। ৩০টি স্থলবেষ্টিত দেশের ১২টি এশিয়ার এবং এসব দেশের সবচেয়ে কাছের বন্দরগুলোও প্রায় কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নেটওয়ার্কগুলি দেশের জন্য প্রধান বন্দরগুলিতে উন্নততর সুযোগ সৃষ্টি করবে। এশিয়া জুড়ে অর্থাৎ এ অঞ্চলের ২৮টি দেশকে সংযুক্ত করে আন্তর্জাতিক রেল রুটগুলির উন্নয়ন ও সহযোগিতা সমন্বয় সাধন করবে। এসকাপের আওতায় এশিয়ার মধ্যে এটি দ্বিতীয় চুক্তি; অন্যটি এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক-এ আন্তঃরাষ্ট্র চুক্তি হয় যা জুলাই ২০০৫ সালে কার্যকর হয়। এই নেটওয়ার্কটির চারটি মূখ্য উপাদান রয়েছে, নিম্নে তা তুলে ধরা হলো-

১. কোরিয়ার সাথে চীন, মঙ্গোলিয়া, কাজাকিস্তান এবং রাশিয়ান ফেডারেশন হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উত্তর করিডোর।

২. থাইল্যান্ড এবং চীনের দক্ষিণ প্রদেশ ইউনান হয়ে মিয়ানমার, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, এবং শ্রীলংকার মধ্যদিয়ে তুরস্ক হয়ে ইউরোপের সাথে সংযোগের মাধ্যমে দক্ষিণ করিডোর এবং

৩. আসিয়ান এবং ইন্দো-চায়না উপ-অঞ্চলসমূহ উপ-আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে সংযোগ এবং

৪. উত্তর ইউরোপ থেকে পারস্য উপসাগর হয়ে রাশিয়ান ফেডারেশন, মধ্য এশিয়া এবং ককেশাস অঞ্চলের সাথে উত্তর-দক্ষিণ করিডোর সংযোগ স্থাপন।

প্রস্তাবিত তিনটি রাস্তাই বাংলাদেশের মধ্য দিয়েই অতিক্রম করবে:

রুট ১- গেদে (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)-দর্শনা (চুয়াডাঙ্গা, বাংলাদেশ)-ঈশ্বরদী-যমুনা ব্রিজ-জয়দেবপুর-আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারি- গুনদুম-মিয়ানমার

রুট ২- সিঙ্গাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)-রাজশাহী (বাংলাদেশ)-ঈশ্বরদী-যমুনা ব্রিজ-জয়দেবপুর-আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারি- গুনদুম-মিয়ানমার এবং

রুট ৩- রাধিকাপুর (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)-দিনাজপুর-ঈশ্বরদী-যমুনা ব্রিজ-জয়দেবপুর-আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারি- গুনদুম-মিয়ানমার।

উপরের রাষ্ট্রগুলোর ট্রান্সপোর্ট সংযোগ এবং সহযোগিতা সদস্য দেশগুলোর জন্য আঞ্চলিকায়নের বিশ্বায়নে একধাপ এগিয়ে আসা। যেকোনো দেশেই এই উন্নয়নে রাজনৈতিক বাধার সম্মুখিন হতে পারে। এ ধারণা থেকে সচেতন হয়ে দেশগুলো উপ-আঞ্চলিকতার দ্বারা অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে লাভবান হতে পারে। কাজেই এশিয়ান হাইওয়ের পাশাপাশি এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দিকেও দৃষ্টি দেয়া উচিত।[৯৬] কারণ একটি সমন্বিত অবাধ ট্রান্সপোর্টেশন নেটওয়ার্ক খুব সহজেই এশিয়ার এই বিশাল অঞ্চলকে অর্থনৈতিকভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে।

ইউরোপে এ ধরনের সহজ যোগাযোগের চমৎকার সুযোগ রয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ের কাজ সম্পন্ন হলে এই সড়ক দিয়ে থাইল্যান্ড ও চীনের কুনমিং পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। একই সঙ্গে এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পর্যটন বৃদ্ধি পাবে। ট্রান্স-এশিয়ান হাইওয়ে এবং রেলওয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে অর্থনৈতিকভাবে এশিয়ান জাতিসমূহ যেমন লাভবান হবে, তেমনি এ অঞ্চলে আন্ত:মহাদেশীয় যোগাযোগের নবদিগন্তের সূচনা করবে। স্বতঃস্ফুর্ত সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ধারা প্রবাহিত হবে যা বৃহত্তর সহযোগিতার পথ প্রসারিত করবে। এ অবস্থায় ট্রান্স-এশিয়ান যোগাযোগ নেটওয়ার্কের বিষয়টিকে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ হতে দেখার সামান্য সুযোগও নেই। বরঞ্চ বৃহত্তর স্বার্থে সংশিষ্ট প্রতিটি দেশেরই এই যোগাযোগের নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়া উচিত।[৯৭]

দেশের মধ্যে সড়ক সংযোগ এবং যাত্রী শিপিং লিঙ্কগুলি যোগাযোগের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। ঐতিহাসিকভাবেই বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সহজতর করার জন্য সড়ক সংযোগ শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন।[৯৮] কেননা বাংলাদেশ-মিয়নমারের মধ্যে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উভয় দেশের জন্যই মঙ্গলজনক। ২০০৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইউ নান উইন (U Nyan Win) তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। এ সময় বাণিজ্য ও অন্যান্য ব্যবসায়িক বিষয়গুলির পাশাপাশি উভয় দেশের প্রস্তাবিত মহাসড়ক নির্মাণের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। দুই দেশের সরকার বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার রামুর সঙ্গে রাখাইন প্রদেশের বুথিডংকে সংযুক্ত করে (বাংলাদেশের রামু-উখিয়া-গুনদুম থেকে মিয়ানমারের তুমব্রু-বলিবাজার-ক্যাকটাও পর্যন্ত) ১৩৩ কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মাণে সম্মত হয়।[৯৯]

দুই বছর আলোচনার পর, ২০০৭ সালের জুলাই-এ বাণিজ্য, পর্যটন এবং জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়াবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান যোগাযোগ উপদেষ্টা এম এ মাতিন (M A Matin) এবং মিয়ানমারের

নির্মাণমন্ত্রী মেজর জেনারেল সও তুন (Saw Tun) তাদের নিজ নিজ সরকারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লি জহো জিং (Li Zhao Xing) চীনকে মিয়ানমারের সীমান্ত সংযোগের জন্য বেইজিংয়ের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রস্তাবিত ঢাকা-ইয়াঙ্গুন-কুনমিং সরাসরি সড়ক সংযোগ হলে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে জাহাজে করে চীনের পূর্বাঞ্চলে অশোধিত তেল আনতে সাহায্য করবে। কক্সবাজারের গুনদুম এবং রাখাইনের বলিবাজার পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের কাজ বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সড়ক সংযোগ চুক্তি বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সাম্প্রতিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সুস্পষ্ট উষ্ণতা প্রদর্শন করে।[১০০]

এই সংযোগটির মাধ্যমে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং চীনের শহর কুনমিংসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের সংযুক্ত হবার সুযোগ তৈরি হয়। চুক্তির আওতায় ২৫ কিলোমিটার রাস্তা যা বাংলাদেশের ভিতরে ২ কিলোমিটার এবং মিয়ানমারের ভিতরে ২৩ কিলোমিটারের জন্য বাংলাদেশ ২০ মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করবে। উভয় দেশের সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর যৌথভাবে নির্মাণ বাস্তবায়ন করবে। কৌশলগত এবং অর্থনৈতিকভাবে সড়ক সংযোগটি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে চীন সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্রমশ উন্নতি ঘটবে। এছাড়াও নাফ্ নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব ছিল। ওভারল্যান্ড রাস্তা নির্মাণ চুক্তি সত্ত্বেও নাফ্ নদীর উপর সেতু এখনও অনুসরণ করা যেতে পারে। এটি দেশের মধ্যে সংযোগকে আরো শক্তিশালী করবে।[১০১]

এটা লক্ষ্যণীয় যে, রুক্ষ পাহাড়ী ভূ-খণ্ডের মধ্য দিয়ে সেতু এবং বহুসংখ্যক সুড়ঙ্গ জড়িত থাকায় সড়ক নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে। উপরন্তু, বঙ্গোপসাগরের উপকূল জুড়ে সমতলভূমি বরাবর টেকনাফ-মংডু-সিটুওয়ে সংযোগ রাস্তার বিকল্প রুট হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীন তিন দেশের মধ্যে সরাসরি সড়ক সংযোগ কক্সবাজার, বলিবাজার থেকে বর্ধিত হয়ে চীনের কুনমিং পর্যন্ত মহাসড়কের প্রস্তাব পেশ করে। যা তিন দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাড়াতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

এছাড়াও ২০০৭ সালের ১০ই নভেম্বর বাংলাদেশ প্রস্তাবিত ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে চুক্তির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের দোহাজারী থেকে কক্সবাজারের রামু হয়ে মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের গুনদুম পর্যন্ত ১৩০ কিলোমিটার রেলওয়ের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে এবং পূর্ব-পশ্চিম অর্থনৈতিক করিডোর (EWEC- East-West Economic Corridor) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থকে আসিয়ানের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।[১০২]

আসলে এই দুই দেশের মধ্যে সরাসরি সড়ক পরিবহন সংযোগ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের সুবিধাই প্রদান করবে না বরং বাংলাদেশের জন্য চীন ও আসিয়ান, পাশাপাশি মিয়ানমারের জন্য সার্কে প্রবেশের গেইটওয়ে হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মৈত্রী সড়ক শুধু এই দুই দেশের মধ্যেই সড়ক যোগাযোগ বিস্তৃত করবে না। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গেই বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ সম্প্রসারিত করবে। ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং এই অঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের পথও সহজ হয়ে উঠবে। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক লেনদেন ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নয়া দিগন্তের শুরু হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অবস্থানে রয়েছে সেই বিচারে পূর্বসীমান্তের দেশগুলির সঙ্গে লেনদেন বৃদ্ধি করা আবশ্যক। বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক শুধুমাত্র কতিপয় দেশের সঙ্গে সীমাবদ্ধ রাখার সময় আর নেই। পশ্চিমের দিকে বাংলাদেশের সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই বাংলাদেশ সরকারের পূর্বমুখী নীতির অনুসরণে পূর্বের দেশসমূহের সঙ্গেও লেনদেন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সড়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই সড়ক চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপরও চাপ হ্রাস পাবে। এই কথাও স্মরণে রাখা উচিত মৈত্রী সড়কের কাজ সমাপ্ত হলে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের দিকেও স্থলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হবে বলে আশা করা যায়।[১০৩] অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টির প্রথম শর্তই হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। মৈত্রী সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ বিস্তীর্ণ এশীয় প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক চালচিত্রের আমূল পরিবর্তন আনয়নে সহায়ক হবে।

আগামীর বিশ্ব ব্যবস্থার নিরিখে অর্থনীতি ও রাজনীতির সুষ্ঠু প্রসারের লক্ষ্যে শুধু মিয়ানমারই নয়, বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির প্রতি নতুন করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল বিশ্ব অর্থনীতিতে দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এসব অঞ্চলে বিশ্ব মানব জাতির প্রায় এক তৃতীয়াংশ বাস করে। যাদের সামষ্টিক উৎপাদন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় এক চতুর্থাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব অঞ্চলে ২০৪০ সাল নাগাদ মহাচীনকে কেন্দ্র করে অন্তত ৫টি পৃথক চরিত্রের শক্তিশালী অর্থনৈতিক বলয় গড়ে উঠবে; যার মধ্যে তিনটিই হবে ইউরোপের সমকক্ষ। অতএব বাংলাদেশের পূর্বমুখী কূটনীতি জোরদার করা প্রয়োজন। অর্থাৎ মিয়ানমার, চীন, লাওস, থাইল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সর্বাধিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। এই নীতি বাস্তবায়নে কেবল নেতৃত্ব ও অন্যান্য স্তরের সফর বিনিময় নয় বরং এইসব দেশের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তব অগ্রগতির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। লক্ষ্য করা হয় যে, পূর্বের দেশগুলির অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশেষকরে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগই তাদের সাফল্যের মূলমন্ত্র।[১০৪] কাজেই আশা করা যায় প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনরায় নতুন রূপ লাভ করবে।

তথ্য নির্দেশ-

১. Ashfaqur Rahman. "Bangladesh-Myanmar Relations-The Economic Dimension." *Centre for Foreign Affairs Studies (CFAS)*, 2013, pp, 1-5.

২. মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ, প্রতিবেশী মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ, *দৈনিক ইত্তেফাক* - ৯ অক্টোবর, ২০০৫।

৩. Sultana Yesmin, Bangladesh-Myanmar Economic Relations: Searching for New Opportunities, *Journal of International Affairs*, Vol. 19, No. 1 & 2, June & December 2015, p. 61; Sultana Yesmin, Transition in Bangladesh-Myanmar economic relations: A door of new opportunities, *The News Today*, 30 june 2013.

৪. এখানে 'বাংলাদেশ' বলতে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডকে বোঝাচ্ছে না। এখানে 'বাংলাদেশ' বলতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিকৃত 'বৃহৎ বঙ্গকে' বোঝানো হলো।

৫. এই অংশের বার্মা বলতে বর্তমান মিয়ানমারকে বোঝানো হলো। মিয়ানমারের প্রাক্তন নাম বর্মা বা বার্মা, প্রাচীন নাম বহ্মদেশ। মিয়ানমারের আনুষ্ঠানিক নাম মিয়ানমার প্রজাতন্ত্র (বর্মী: প্যিদাউঞ্জু থান্মাদা ম্যামা নাইঙ্গান্দাউ)। তৎকালীন বার্মার গণতান্ত্রিক সরকারের উৎখাতের পর সেখানকার সামরিক সরকার বার্মার নতুন নামকরণ করে 'মিয়ানমার', bn.wikipedia.org/wiki/মিয়ানমার ।

৬. Mathew Louis to the Collector of Chittagong, 10 June, 1788, *Bangladesh Secretatiat Records (B.S.R.), (Chittagong District (C.D.),* Vol. 443, pp. 34.

৭. A. Aspinal, English Relations with Burma in the time of Cornwallis and Shore (1786-1798), *Bengal Past and Present (B.P.P.),* Vol. XL, 1930, P. 123.

৮. For Details, see Ratan Lal Chakraborty, Some Aspects of the Anglo-Arakanese Relations, 1760-1784, *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XX, (December, 1975), No. 3, pp. 41-50.

৯. Michmael Symes, *Journal of his Second Embassy to the Court of Ava in 1802*, Daniel George Edward Hall (D.G.E.Hall ed.), (George Allen & Unwin Ltd., London, 1955), p. XXXV.

১০. A. Aspinal, *Op.cit.,* p.123.

১১. *Ibid.,* pp. 123-124.

১২. Bengal Political Consultations, 1 October, 1799, quoted in A. Aspinal, *Op.cit.,* p.125.

১৩. Michmael Symes, *Op.cit.,* p. XLII.

১৪. Envoy to the court of Ava to the Governor General, *Political Consultations (P.C.),* 21 October, 1795, No.35, *Muhammad Siddiq Khan Collections (M.S.K.C.), Political Procedings (P.P.),* Vol.2, pp. 361-83.

১৫. *Governor General's Minute*, 10 November, 1794, *Muhammad Siddiq Khan Collections (M.S.K.C.), Political Procedings (P.P.),* Vol. 1, p. 249.

১৬. *Raja of Arakan to the Lieutenant Colonel*, *Political Consultations (P.C.),* 10 November, 1794, No. 46, *Muhammad Siddiq Khan Collections (M.S.K.C.), Political Procedings (P.P.),* Vol. 1, pp.239-40.

১৭. Envoy to the court of Ava to the Governor General, *Political Consultations (P.C.),* 21 October, 1795, No.2, *Muhammad Siddiq Khan Collections (M.S.K.C.), Political Procedings (P.P.),* Vol.2, PP. 361-83.

১৮. *Ibid.,* 2 March, 1798, No.4, *M.S.K.C., P.P.,* Vol.3, p. 636.

১৯. A. Aspinal, *Op.cit.,*p. 125.

২০. *Ibid.,* pp. 125-126.

২১. Magistrate of Dacca to the Secretary to Government, *Secret Consultations (S.C.)* 11 February, 1813. No. 17, *Muhammad Siddiq Khan Collections (M.S.K.C.), Secret Procedings (S.P.),* Vol. 5, pp. 1451-53.

২২. এখানে ত্রিপুরা বলতে বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলা এবং বাখরগঞ্জ বলতে বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলাকে বোঝানো হলো।

২৩. Magistrate of Dacca to the Secretary to Government, *Op.cit.,* p. 1514.

২৪. H. Beveridge, *The District of Bakargan,* (London, 1876, Reprinted by Bakerganj District Council, 1970), p. 253.

২৫. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক (১৭৮৫-১৮২৪)*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৮৪, এশিয়াটিক প্রেস), পৃ.পৃ. ১৯২-১৯৩।

২৬. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, বাংলাদেশ ও বার্মায় জন-অভিবাসন: প্রকৃতি ও তাৎপর্য (১৭৮৫-১৯৪৮), *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্দশ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৌষ ১৪০৩, পৃ. ৪২।

২৭. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

২৮. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮; *Census of India, 1898-1931*, (Bengal and Burma Volumes).

২৯. রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৫।

৩০. Udai Bhanu Singh, Myanmar's Relations with Bangladesh since 1988, *Institute for Defence Studies and Analyses*, New Delhi, May 15, 2009.

৩১. Ashfaqur Rahman, *Op.cit.,* pp.1-5.

৩২. Sultana Yesmin, *Op.cit.,* p. 62.

৩৩. A.K.M. Hedayetul Huq, "Bangladesh-Barma Trade", *Asian Affairs* (Dhaka), Vol. 1, No. 1, Jan-June 1980, pp. 142-143.

৩৪. Sultana Yesmin, *Op.cit.,* p. 62.

৩৫. Myint Maung Tun, *Myanmar-Bangladesh Relations: Challenges and Opportunities*, 2016, https://myanmarisis.org/publication_pdf/final-version-myanmar-bangladesh-relations-mmedits-ah2-1wpFhW.pdf; Bangladesh-Myanmar Relations, http://www.globalsecurity.org/military/world/bangladesh/forrel-mm.htm.

৩৬. Udai Bhanu Singh, Myanmar's Relations with Bangladesh since 1988, *Institute for Defence Studies and Analyses*, New Delhi, May 15, 2009.

৩৭. Kamal Uddin Ahmed, Bangladesh and Its Neighbours, *Asiatic Society of Bangladesh*, Dhaka, 2008, p. 107.

৩৮. Government of Bangladesh, *Brief on Trade Matters*, Ministry of Commerce, 1996.

৩৯. Sultana Yesmin, *Op.cit.,* p. 62.

৪০. Sonia Farhana Rahman, *Bangladesh-Myanmar Bilateral Relations and Regional Implications,* M. Phil. thesis in International Relations, University of Dhaka, (Dhaka University Institutional Repository, July 2014), p.29; *দৈনিক ইনকিলাব*- ৭ অক্টোবর, ১৯৯৫।

৪১. Md. Shayeed Hossain, *Bangladesh-Myanmar Relations, 1972-2010,* Unpublished Ph.D thesis, Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi, August 2014, p.60; *দৈনিক ইনকিলাব*- ৯ ও ২৩ অক্টোবর, ১৯৯৫।

৪২. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.61; Sultana Yesmin, *Op.cit.,* p. 62.

৪৩. Udai Bhanu Singh, Myanmar's Relations with Bangladesh since 1988, *Institute for Defence Studies and Analyses*, New Delhi, May 15, 2009; *দৈনিক ইনকিলাব*-১০ অক্টোবর, ১৯৯৯।

৪৪. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.79.

৪৫. Government of Bangladesh, *Minutes of Bangladesh-Myanmar Border Trade,* Review Meeting on 26 June 1997, Ministry of Commerce.

৪৬. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.79.

৪৭. Kamal Uddin Ahmed, *Op.cit.,* p. 105; Udai Bhanu Singh, Myanmar's Relations with Bangladesh since 1988, *Institute for Defence Studies and Analyses*, New Delhi, May 15, 2009.

৪৮. Kamal Uddin Ahmed, *Op.cit.,* p. 106-107; Md. Joynal Abdin, *Status of Bangladesh-Myanmar trade negotiations,* https://joynal.wordpress.com/2009/03/29/status-of-bangladesh-myanmar-trade-negotiations/.

৪৯. Sonia Farhana Rahman, *Op.cit.,* P.29.

৫০. Sultana Yesmin, *Op.cit.,* p. 62; *দৈনিক ইত্তেফাক*- ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৫।

৫১. Kamal Uddin Ahmed, *Op.cit.,* p. 109.

৫২. A.K.M. Hedayetul Huq, *Op.cit.,* p. 146.

৫৩. Kamal Uddin Ahmed, *Op.cit.,* p. 112.

৫৪. Udai Bhanu Singh, Myanmar's Relations with Bangladesh since 1988, *Institute for Defence Studies and Analyses*, New Delhi, May 15, 2009; *দৈনিক ইত্তেফাক* - ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫।

৫৫. Yunus Ali Sheik, 'Bangladesh-Myanmar Relations: Making the Best of Proximity", *BISS Journal,* Vol. 19, Aprill 1998, p. 484.

৫৬. *Ibid.,* pp.484-87.

৫৭. *Ibid.,* pp.487.

৫৮. *Import Payment, Bangladesh Bank & Export Statistics*, *Export Promotion Bureau (EPB) & Bangladesh Bank*; *আজকের কাগজ*- ৫ এপ্রিল, ২০০৪; Kamal Uddin Ahmed, *Op.cit.,* p. 109.

৫৯. *Export Promotion Bureau (EPB) & Bangladesh Bank*; Kamal Uddin Ahmed, *Ibid.,* p. 107.

৬০. Import Payment, Bangladesh Bank & Export Statistics, *Export Promotion Bureau & Bangladesh Bank, 2010*; Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.65.

৬১. *Export Promotion Bureau (EPB)* Data, 2011; Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* pp.63-64; Debapriya Bhattacharya & Mashfique Ibne Akbar, Recent Development in Myanmar and New Opportunities for Sub-regional Cooperation: A Bangladesh Perspective, *Centre for Policy Dialogue (CPD)*, Dhaka, September, 2012, pp.13-14.

৬২. Kamal Uddin Ahmed, *Op.cit.,* p. 109.

৬৩. Sonia Farhana Rahman, *Op.cit.,* p. 31.

৬৪. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* pp.74-75.

৬৫. Md. Shayeed Hossain, *Ibid.,* p.61; *দৈনিক প্রথম আলো*- ২৫ নভেম্বর, ২০০৯।

৬৬. Md. Shayeed Hossain, *Ibid.,* pp.185-186; *দৈনিক ইনকিলাব*- ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯; *দৈনিক ইনকিলাব*- ৭ অক্টোবর, ১৯৯৫।

৬৭. Abu Salah Muhammad Yousuf & Md. Muhibbur Rahman, "Bangladesh-Myanmar Relations: The context of Political and Economic Reforms in Myanmar", *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS)*, Seminar, 22 may 2013, Dhaka, Bangladesh.

৬৮. Ashfaqur Rahman, *Op.cit.,* pp. 1-5.

৬৯. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.193.

৭০. Abu Salah Muhammad Yousuf & Md. Muhibbur Rahman, "Bangladesh-Myanmar Relations: The context of Political and Economic Reforms in Myanmar", *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS),* Seminar, 22 may 2013, Dhaka, Bangladesh.

৭১. Debapriya Bhattacharya & Mashfique Ibne Akbar, *Op.cit.,* p.14; Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.194.

৭২. *দৈনিক ইনকিলাব*- ১৩ অক্টোবর, ১৯৯৯; *দৈনিক ইত্তেফাক*- ৬ আগষ্ট ২০০৭।

৭৩. *দৈনিক ইনকিলাব*- ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০০; Md. Joynal Abdin, Status of Bangladesh-Myanmar trade negotiations, https://joynal.wordpress.com/2009/03/29/status-of-bangladesh-myanmar-trade-negotiations/.

৭৪. Sonia Farhana Rahman, *Op.cit.,* pp. 41-42.

৭৫. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* pp.194-195.

৭৬. Md. Shayeed Hossain, *Ibid.,* pp.114-115.

৭৭. Ashfaqur Rahman. *Op.cit.,* pp. 1-5.

৭৮. Bangladesh-Myanmar Relations, http://www.globalsecurity.org/military/world/bangladesh/forrel-mm.htm .

৭৯. Abu Salah Muhammad Yousuf & Md. Muhibbur Rahman, "Bangladesh-Myanmar Relations: The context of Political and Economic Reforms in Myanmar", *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS),* Seminar, 22 may 2013, Dhaka, Bangladesh.

৮০. M. Jashim Uddin, Prospects for Attaining a New Height in Bangladesh-Myanmar Relations: Bangladesh Perspective, *BIISS Journal,* Vol. 35, No. 1, January 2014, p.15.

৮১. মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ, প্রতিবেশী মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ, *দৈনিক ইত্তেফাক*- ৯ অক্টোবর, ২০০৫; *দৈনিক ইনকিলাব*- ১ জানুয়ারী, ১৯৯৩।

৮২. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.193; Md. Joynal Abdin, Status of Bangladesh-Myanmar trade negotiations, https://joynal.wordpress.com/2009/03/29/status-of-bangladesh-myanmar-trade-negotiations/.

৮৩. Sultana Yesmin, Transition in Bangladesh-Myanmar economic relations: A door of new opportunities, *The News Today*, 30 june 2013.

৮৪ Nizam Ahmed, "Bangladesh eyes boosting trade with Myanmar", *TheFinancial Express*, 22 March 2013; *দৈনিক ইত্তেফাক* - ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯।

৮৫. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.195.

৮৬. Karar Mahmudul Hassan, "The prospects of strengthening cooperation with Myanmar", *The Financial Express*, 25 February, 2012.

৮৭. Abu Salah Muhammad Yousuf & Md. Muhibbur Rahman, "Bangladesh-Myanmar Relations: The context of Political and Economic Reforms in Myanmar", *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS),* Seminar, 22 may 2013, Dhaka, Bangladesh; *দৈনিক ইনকিলাব*- ১০ অক্টোবর, ১৯৯৯।

৮৮. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.195; Chartier, Pierre, UNESCAP (1 November 2005), "Trans-Asian Railway network nears agreement", *Railway Gazette International,* 15 November 2006*; দৈনিক ইত্তেফাক*- ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯।

৮৯. Bangladesh-Myanmar Relations, http://www.globalsecurity.org/military/world/bangladesh/forrel-mm.htm .

৯০. Debapriya Bhattacharya & Mashfique Ibne Akbar, *Op.cit.,* p.19.

৯১. *দৈনিক ইত্তেফাক*- ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯।

৯২. "Countries sign agreement on Trans-Asian railway plan", *VietNamNet.,* 11 November 2006.

৯৩. "Iron Silk Road' UN Treaty" (Press release), UNESCAP (reprinted by National Union of Rail, Maritime & Transport Workers [RMT] Bristol Rail Branch), 6 October 2006.

৯৪. *"Bangladesh joins Trans-Asian Railway Network Agreement"* 10 November 2007.

৯৫. "Trans-Asian Railway Network Agreement comes into force", *Railway Gazette International*, 11 June 2009.

৯৬. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* pp.208-210.

৯৭. http://www.dailyjanakantha.us/details/article/151322/দেশের-৬শ'-কিমি-মহাসড়ক-যুক্ত-হচ্ছে-এশিয়ান; *দৈনিক ইত্তেফাক*- ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯।

৯৮. Nizam Ahmed, "Bangladesh eyes boosting trade with Myanmar", *The Financial Express*, 22 March 2013.

৯৯. Kamal Uddin Ahmed, *Op.cit.,* p. 106.

১০০. Kamal Uddin Ahmed, *Ibid.*, p. 110.

১০১. Kamal Uddin Ahmed, *Ibid.*, pp. 110-111; Karar Mahmudul Hassan, "The prospects of strengthening cooperation With Myanmar", *The Financial Express*, 25 February, 2012.

১০২. Bangladesh-Myanmar Relations, http://www.globalsecurity.org/military/world/bangladesh/forrel-mm.htm.

১০৩. Md. Shayeed Hossain, *Op.cit.,* p.195; *দৈনিক ইত্তেফাক*- ১৬ জুন, ২০০৫।

১০৪. Sudhanshu Ranjan Ray, *Bangladesh-Malaysia Relations, 1772-2006: A Historical Analysis,* Unpublished Ph.D. Thesis, IBS, University of Rajshahi, 2008, p.59. *দৈনিক ইত্তেফাক*- ১০ অক্টোবর, ২০০৮।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক খুব কম সময়ই লক্ষ্য করা যায়। উভয় সরকারের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক এবং কতকাংশে অর্থনৈতিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট।[১] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে নতুন রাষ্ট্রের প্রতি মিয়ানমারের মনোভাব আনুষ্ঠানিক এবং সঠিক ছিল। ১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারী মিয়ানমার স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় যা পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিগুলো থেকে এগিয়ে ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় মিয়ানমার পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের বিমান রেঙ্গুন হয়ে কুনমিং (চীন) যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। এছাড়া ভারত ও বাংলাদেশের বাহিনীর নজর এড়ানোর জন্য পাকিস্তানের বেসামরিক ও সামরিক বিমান রেঙ্গুনের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার জন্য অনুমোদিত ছিল।

তাছাড়াও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কিছু অংশ বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে ঘন জঙ্গল ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের নিয়ে বাংলাদেশের নতুন সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। এই যুদ্ধের তীব্রতা কম থাকায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত থাকে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সম্পর্ক ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়।

বাংলাদেশের কূটনীতিক কে এম কায়সার প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসেবে মিয়ানমার সফর করেন যা দুদেশের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৭৩ এর শেষের দিকে তিনি দুই দেশের মধ্যে সমুদ্রসীমা নিয়ে আলোচনায় বসাতে সক্ষম হন। এরফলে ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝিতে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয় এবং নে উইন বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে উন্নয়নশীল সমীকরণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সফর মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্কের প্রতিশ্রুতিশীল পরিণিতির সাফল্য বয়ে আনে। ১৯৭৪ সালে প্রথমবারের মতো বেসামরিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নে উইনের সফর গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[২] কারণ এরপর থেকে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হতে থাকে-

- ১৯৭৩ সালে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৯৭৯ সালে স্থল সীমানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৯৮৯ সালে সীমান্ত বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৯৯৪ সালে উভয় দেশের সীমান্ত বাণিজ্য প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।
- ২০০৭ সালে বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সড়ক সংযোগ হয়।
- ২০১১ সালে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার জন্য একটি যৌথ কমিশন এবং সমঝোতা স্মারকের জন্য একটি যৌথ বাণিজ্য কাউন্সিল (JBC-Joint Business Council) প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৩]

কাজেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত, সমুদ্রসীমা, নদী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য অনেক বিষয় (যেমন সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি) ভাগাভাগি করে নিয়েছে। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের ভূ-কৌশলগত অবস্থান বুঝিয়ে দেয় যে, শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ছাড়া উভয় দেশই ক্ষতিগ্রস্ত এবং জাতীয় স্বার্থ বাধাগ্রস্থ হয়। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যু, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, অবৈধ বাণিজ্য ও পাচার, ক্ষুদ্র অস্ত্র ও মাদক সরবরাহ ইত্যাদি দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। মিয়ানমার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত হওয়ায় পূর্ব ও পশ্চিমা দেশগুলো মিয়ানমারের প্রতি তাদের আগ্রহ দেখায়। এটা মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির জন্য সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। বাংলাদেশের এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। পররাষ্ট্রনীতি জাতীয় স্বার্থের মূল বিষয় যা লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। আর এভাবেই নিরাপত্তা সমস্যা যেমন ভূমি সীমান্ত নিরাপত্তা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ইত্যাদি পররাষ্ট্রনীতিতে উচ্চ মাত্রা পায়। কাজেই জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কে দৃষ্টি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

১৯৮৮ সালের অভ্যুত্থান দমনের পর মিয়ানমারের জান্তা সরকার ও চীনের মধ্যে সামরিক সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত দ্রুত উন্নত হয়। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি জঙ্গি বিমান ও টহল বোট, সাঁজোয়া পেট্রোল কার, ফিল্ড ও এন্টি এয়ার ক্রাফট আর্টিলারি, ক্ষুদ্র অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের জন্য ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তি সই করা হয়। ১৯৯৪ সালের নভেম্বর-এ হেলিকপ্টার, সাঁজোয়া যান, নৌ গানবোট, সামরিক প্যারাশুট এবং ছোট অস্ত্র সরবরাহের জন্য ৪শ' মিলিয়ন মার্কিন ডলারের দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের সঙ্গে সংখ্যারও দ্রুত বৃদ্ধি করে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর দ্রুত বর্ধনশীল শক্তি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে পড়ে। চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের সামরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্যও বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের জন্য এই সম্পর্কের মূল তাৎপর্য হলো মিয়ানমারের ওপর চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পশ্চিমা শক্তি ও জাপানের গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে পড়ে।

এটা লক্ষ্যণীয় যে, সেপ্টেম্বর '৮৮ এর অভ্যুত্থানে মিয়ানমারের প্রতি ভারতের প্রতিক্রিয়া স্পষ্টত নেতিবাচক ছিল। কাজেই কূটনৈতিক সম্পর্কও শীতল ও দূরবর্তী হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী প্রকাশ্যে স্লর্ক (SLORC- State Law and Order Restoration Council) এর সমালোচক ছিলেন। কিন্তু ১৯৯১ সালে মিয়ানমার এবং চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামরিক বন্ধনের কারণে ভারত সচেতন হয়ে ওঠে। মে '৯৪ মিয়ানমার নেতৃত্বের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টায় ভারতের সেনাপ্রধান মিয়ানমারে শুভেচ্ছা সফর করেন। মে '৯৭ ভারতীয় সেনাপ্রধান ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা তৈরিতে মিয়ানমার সফর করেন।

১৯৯৮ সালে ভারতের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ প্রকাশ্যে বলেন, বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমারের হাইগী (Hainggyi) দ্বীপে চীনের সুরক্ষিত নৌ-ঘাঁটি, যা ভারতের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সরূপ। এই বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এ কারণে যে, এরপর মে '৯৮ চীনের সঙ্গে ভারতও নতুন পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ করে। জর্জ ফার্নান্ডেজ এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণকে পূর্ব চীন থেকে পারমাণবিক হুমকির প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারতের নতুন পরমাণু অস্ত্র নীতি

হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারত মহাসাগরীয় দেশসমূহের নতুন যৌথ এসোসিয়েশন গড়ে ওঠে, পরবর্তীতে বাংলাদেশ এতে যোগদান করে। এদিকে চীনকে বাদ দিয়ে মিয়ানমার বিকল্প পন্থা হিসেবে ভারত মহাসাগরীয় দেশসমূহের প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, ভারতীয় এবং দাতা দেশগুলোর নীতি ক্রমান্বয়ে মিয়ানমারমুখী হয়ে উঠছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর '৮৮ এর অভ্যুত্থানে মিয়ানমারের বেসামরিক বিক্ষোভকারীদের ওপর ব্যাপক নিপীড়ন ও হত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের প্রতি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শক্তির সহানুভূতিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যখন স্লর্ক আয়োজিত মে '৯০ এর নির্বাচন বাতিল করে এবং এনএলডি নেত্রী অং সান সুচিকে গ্রেফতার করে এবং ব্যাপক দমন-নিপীড়ন চালানো হয়, সেখানে মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য বিশেষত আওয়ামী লীগের শক্তিশালী সহানুভূতিশীল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যাহোক বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ দুটি কারণে নিঃশব্দ প্রতিক্রিয়া করে। প্রথমত, মিয়ানমারের প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উ অং সান (U Aung San) এবং থাকিন এনইউ (Thakin Nu) স্বাধীনতার নেতাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক যোগাযোগ কম ছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার নাগরিক আন্দোলনে জড়িত ছিল। তাছাড়া ১৮ই সেপ্টেম্বর '৮৮ অভ্যুত্থানের আগে পরে ভারতের স্পষ্ট এবং তিক্ত প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দেখা দেয়। কারণ গণতন্ত্র ব্যবস্থা আজও বাংলাদেশের সমসাময়িক উন্নতির পথে সংবেদনশীল ইস্যু।[৪]

মিয়ানমারে শান্তি স্থাপনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নানা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সদ্ভাব।[৫] কাজেই মিয়ানমারের সামরিক শাসকেরা জাতীয় সম্প্রীতি সংহত করতে সে দেশের ১৩৫টি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান প্রণয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। ১৯৯৩ সালে মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় শান্তি ও উন্নয়ন পর্ষদের পছন্দমত ৭০২ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় কনভেনশন সংবিধান প্রণয়নের কাজ শুরু করে।

ইতোমধ্যে মিয়ানমার আসিয়ানের সদস্য পদ লাভ করেছে। আসিয়ানের সদস্যপদ গ্রহণের সময় মিয়ানমারের শাসকদের ধারণা ছিল এতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তাদের অচ্ছুত অবস্থার অবসান হবে এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। অন্তত সহ-সদস্যদেশগুলি গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রশ্নে তাদের বিব্রত করবে না। কিন্তু কার্যত তেমনটি হয়নি। আসিয়ানের প্রতিটি বৈঠকে মিয়ানমারের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।[৬]

অপরদিকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ১৯৯৭ সাল থেকে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে বাংলাদেশের বিপরীতে মিয়ানমারের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মিয়ানমারের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অবস্থা, সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি, দেশের মধ্যে প্রধান বিদ্রোহী দলগুলোর বিপক্ষে আপেক্ষিক সাফল্য, চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, আসিয়ানের সদস্যপদ লাভ সব মিলিয়ে মিয়ানমার নতুন শক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে।[৭]

২০০৫ সালের ৭ই নভেম্বর মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় শান্তি ও উন্নয়ন পর্ষদের নির্দেশক্রমে ১১টি মন্ত্রণালয় নিয়ে ইয়াঙ্গুন (Yangon) থেকে পিইন্মানায় (Pyanmana) রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ইয়াঙ্গুনের ৩২০

কিলোমিটার উত্তরে মান্দালয় বিভাগের একটি নাতিবর্ধিষ্ণু শহর পিইন্মানা। মিয়ানমারের নতুন রাজধানী পিইন্মানার নতুন নাম হয় ইয়ানলন (Yanlon)। যে কয়টি মন্ত্রণালয় প্রাথমিক পর্যায়ে পিইন্মানায় স্থানান্তরিত হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরমধ্যে অন্যতম। তাঁদের মতে, দেশের মোটামুটি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়াই ভূ-সামরিক বিবেচনায় রাজধানী হিসেবে ইয়াঙ্গুনের চেয়ে পিইন্মানা অধিকতর উপযোগী। ১৯৮৮ সালে তাঁরা দেখেছেন সরকার বিরোধী বিক্ষোভের সময় ইয়াঙ্গুনের অনেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী বিক্ষেভে সামিল হয়েছিল। পিইন্মানায় এমনটি হবার সম্ভাবনা নেই।[৮]

গণতন্ত্রায়নের জন্য মিয়ানমারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের প্রকৃতি নতুন মাত্রা খুঁজে পায়। রাষ্ট্র, সরকার, সড়ক, বিমান ও রেলপথ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যোগাযোগের অভাব, ভুল বোঝাবুঝি ও অবিশ্বাস, তথ্য ফাঁক, দীর্ঘ সময় সামরিক শাসন এবং মিয়ানমারে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে যৌথ এবং শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান বাধা। কাজেই বাংলাদেশকে মিয়ানমারের সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। অতএব বাংলাদেশের জাতীয়, কৌশলগত কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবেচনার ওপর মিয়ানমারের সঙ্গে শক্তিশালী বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ প্রয়োজন।[৯]

নে উইনের সামরিক সরকার এবং স্লর্ক (SLORC- State Law and Order Restoration Council) /এসপিডিসি'র (SPDC- State Peace and Development Council) অধীন বর্মি সেনাবাহিনীর দ্বারা নিপীড়িত হয়ে যে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট উদ্ভব হয় তা বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কে প্রাধান্য পায়। এই সংকট বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অসহনীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ উৎপন্ন করে যা উন্নয়নশীল উদ্যোগের জন্য বাধাগ্রস্থ হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্যভাবে শরণার্থীদের অব্যাহত উপস্থিতির সংকট মোচনে বাংলাদেশের বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। এই নির্ভরতার কারণে শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বাধীন দাতা দেশগুলো প্রকাশ্যে মিয়ানমারের প্রতি বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।[১০]

পূর্ব প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অস্থির এবং সম্পর্কের অগ্রগতিও বিশেষভাবে আতঙ্কজনক। কাজেই বাংলাদেশকে মিয়ানমারের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকদের মনে রাখা উচিত যে কূটনীতি একটি অসহায় নীতি, যদি না তা শক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। কাজেই মিয়ানমারের প্রতি বাংলাদেশের নীতির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে কার্যকর কূটনীতির সমন্বয় প্রয়োজন যা নিজস্ব নিরাপত্তা স্বার্থ রক্ষা করে। বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকেরা কখনোই মিয়ানমারকে একটি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে বিবেচিত করে না। বরং তারা একটি দূরবর্তী দেশ হিসেবে মিয়ানমারকে বিবেচনা করে। কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মিয়ানমারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া আবশ্যক।[১১]

এটা সত্য যে, মিয়ানমারে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে আরাকানে রোহিঙ্গাদের অবস্থার উন্নতি হবে এবং শেষ পর্যন্ত শরণার্থী সঙ্কট সমাধানে ভূমিকা রাখবে। কিন্তু ব্যাপকভাবে সীমান্তে মিয়ানমারের সামরিক উপস্থিতি জোরদারকরণ এবং প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ

করার কোনো উদ্যোগ বাংলাদেশের জন্য বাধা সরূপ। এটা প্রতীয়মান যে, শরণার্থী সমস্যা সমাধান এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য মিয়ানমারের রাজনীতিতে অবস্থান তৈরি করতে বাংলাদেশের জন্য দ্ব্যর্থহীন আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় প্রয়োজন।[১২]

যদিও মিয়ানমার একটি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী রাষ্ট্র তবু দীর্ঘমেয়াদী সামরিক শাসনের কারণে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ অং সান সুচিকে '৯০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ের পরও সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি এবং শুধু বাংলাদেশ নয় মিয়ানমার বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশের শাসন থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে।

যদিও ১৯৭২ সালে এই দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের শুরু হয়। তথাপি মিয়ানমার সরকার একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার চার দশকেও বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর অন্যতম কারণ চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক থাকায় মিয়ানমার সরকার তার ছোট প্রতিবেশীর দিকে নজর দেয়নি। বছরের পর বছর ধরে তারা বাংলাদেশের ভৌগোলিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে বিদ্যমান বিরোধ সমাধান করতে অস্বীকার করেছেন।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অন্তঃপ্রবাহ, ভূমি এবং সমুদ্রসীমা, অবৈধ পাচার এবং বিদ্রোহীদের কথিত আন্তঃসীমান্ত আন্দোলন ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কার্যকর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে।

১৯৭৮ সালে মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। এসময় রোহিঙ্গা মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনী 'নাগামিন ড্রাগন অপারেশন' চালায় । পরবর্তীতে ১৯৯১-৯২ সালের মধ্যে নিপীড়ন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। যা রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা হিসেবে পরিচিতি পায়।

এছাড়াও মিয়ানমারের সঙ্গে ভূমি এবং সামুদ্রিক সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে সংঘাত রয়েছে যা ২০১২ সালে সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের এক রায়ের মাধ্যমে সমাধান হয়। বঙ্গোপসাগরে এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন জলের ১১১.০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপে প্রায় স্থানিক সমুদ্রের ১২ নটিক্যাল মাইল বাংলাদেশের অংশ হয়। এই রায় যা দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিতর্কের সমাধানে সহায়তা করে তা বাস্তবায়নে মিয়ানমার সরকারের পূর্ণ সহায়তা সকলের কাম্য।

অবৈধ পাচার ও জনগণের আন্তঃসীমান্ত আন্দোলনসহ অন্যান্য বিষয় উভয় দেশের মধ্যে একটানা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। অসন্তোষ ও বিবাদের এই সূত্র সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও মিয়ানমার কার্যকর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।[১৩]

এর প্রমাণ বেসরকারি বাণিজ্য চিত্র উন্নত হয়েছে। মিয়ানমারে বাংলাদেশের কৃষি ও খামারে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক মূলত চাল ব্যবসার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন

আইন অনুসারে ব্রিটিশ ভারত থেকে বার্মা আলাদা হলে মূলত এই বাণিজ্যের শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমুদ্র পথে বার্মার রেঙ্গুন ও কলকাতার মধ্যে চাল ব্যবসায় বিঘ্ন ঘটে।

পরে ১৯৬২ সালে নে উইন ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং মিয়ানমার বিশ্বের সর্ববৃহৎ চাল রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে তার অবস্থান হারিয়ে 'সমাজতন্ত্রের পথে বার্মা' চালু করেন। ৭০ এবং ৮০-এর দশকে দুটি কারণে মিয়ানমারের চাল রপ্তানি কমে যায়। প্রথমত, চাল ব্যবসা 'জাতীয়করণ' এবং দ্বিতীয়ত, 'সমাজতান্ত্রিক' অনুশীলন গ্রামাঞ্চলে চালু হলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। জেনারেল নে উইন বাণিজ্য জাতীয়করণ করে ভারতীয় বা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী এবং কার্যত শক্তিশালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যারা ব্রিটিশদের অধীনে ছিল তাদেরকে বিতাড়িত করে দেয়। ১৯৬৭ সালে বর্মী মুদ্রার মূল্যরহিতকরণ ছিল শেষ প্রক্রিয়া যা বণিক ও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ীদের নির্মূল করে দেয়। নে উইন সরকার সে সময় রেঙ্গুনে ভারতীয় দূতাবাসের কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সোনা, হীরা, জহরত বাইরে পাচার করছে বলে ভারত সরকারকে অভিযুক্ত করে। ব্যবসায়ী ও রেঙ্গুনের দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের মধ্যে বাংলাদেশের শুধুমাত্র একটি বা দুটি ছিল। তারমধ্যে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি এ. কে. খান (Abul Kashem Khan- Founder Chairman of A. K. Khan & Co. Ltd.) একজন ছিলেন। নে উইনের কঠোর ব্যবস্থায় ভারতের সঙ্গে তিক্ততার কারণে এই সময়ে বাংলাদেশ চাল আমদানির জন্য জাপান, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়াসহ অন্যান্য দেশের দিকে দৃষ্টি দেয়।

১৯৭০ এবং ১৯৮০ এর দিকে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত দিয়ে সনাতন পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য ছিল। বাংলাদেশ মসলা, ডাল, চাল ও মাছ সহ কৃষি পণ্য আমদানি করেছে। বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য, ঔষধ, বাংলাদেশে উৎপাদিত প্রসাধনী এবং অল্প পরিমাণে রেডিমেড গার্মেন্টস রপ্তানি করত, যা মিয়ানমারে জনপ্রিয় ছিল।

নে উইনের পদত্যাগ এবং 'সমাজতন্ত্রের পথে বর্মি' নীতি বিসর্জনের পর দুদেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নত হতে শুরু করে। বিদেশী বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আদমজী, ইস্পাহানী এবং দাউদ যারা মিয়ানমারের অন্যতম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল তাদের জন্য উন্মুক্ত হতে শুরু করে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী এবং ব্যাংক মিয়ানমারে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক রেঙ্গুনে একটি প্রতিনিধি কার্যালয় স্থাপন করে। স্কয়ার এবং বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি রেঙ্গুনে একটি কার্যালয় স্থাপন করে। দুদেশের মধ্যে সরকারি সফর বিনিময় হয়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, মিয়ানমার সিটুওয়েতে (Sittwe) একটি সিমেন্ট কারখানা সেইসঙ্গে মন্ড ও কাগজ কল এবং চিংড়ি খামার স্থাপনে বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও সহযোগিতাকে আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহী।

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি মিয়ানমার জাতিসংঘে স্বল্পোন্নত দেশ (LDC- Least Developed Country)- এর মর্যাদা লাভ করে। স্বল্পোন্নত দেশের পদমর্যাদার মধ্যে মিয়ানমারের অন্তর্ভুক্তি জাতিসংঘ ও অন্যান্য বহুপাক্ষিক ফোরামে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে সর্ববৃহৎ স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ায় বিভিন্ন বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আলোচনায় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে তিন ধরনের বাণিজ্য রয়েছে (ক) সরকারি বাণিজ্য, (খ) সীমান্ত বাণিজ্য, এবং (গ) অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য। ১৯৯৬ সালে দুই দেশের সরকারের মধ্যে একটি সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যেখানে ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন ৫ হাজার মার্কিন ডলারের সমমান বাণিজ্যের চালান ক্রয় করার অনুমোদন লাভ করে।

কিন্তু বাণিজ্য উন্নয়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো- (ক) মিয়ানমারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা কার্যক্রমের ওপর অনীহা (খ) বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের ভিসা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা এবং (গ) ডলারের বিনিময় হারের জটিলতা। উপরন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের নীতি ওপর নির্ভরশীল। রেঙ্গুন ও সিটুওয়ের বাণিজ্যের মূল প্রবেশাধিকার নীতি সামরিক ব্যক্তিদের ওপর নির্ভরশীল এবং রাতারাতি তারা তা পরিবর্তন করতে পারেন এবং সেখানে কোনো আইনি প্রতিকার বা বাণিজ্যিক সালিশির বিধান নেই।[১৪]

তাই এমন কৌশল উদ্ভাবন করা উচিত যাতে মিয়ানমার অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। রোহিঙ্গাদের বা অন্য কোনো সমস্যা এই সম্পর্কে একটি অন্তরায় বলে মনে না হয় সেজন্য মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের আচরণ সাবলীল হওয়া উচিত। মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত শান্তিপূর্ণ ও অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল হওয়া উচিত। যেখানে উভয় দেশের স্বার্থই রক্ষিত হয়।

মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য বিনিয়োগ করা এবং বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত। মিয়ানমারের পর্যটন, সেগুন কাঠ, বেত, সামুদ্রিক মাছ ধরা, চিংড়ি চাষ, পশু পালন, গ্রাম নির্মাণ, মোটেল, সিরামিক মৃৎশিল্প, উৎপাদন, অমূল্য রত্ন হীরা মণিমুক্তো ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে ।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সহজতর করার জন্য ব্যাংক ক্রেডিট লাইন তৈরি এবং যথাযথ আইন প্রয়োগ করে বাহিরে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারে। মিয়ানমারের সঙ্গে যৌথভাবে বিনিয়োগের দুটি চমৎকার খাত রয়েছে। প্রথমত, রাখাইন রাজ্যে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। দ্বিতীয় প্রকল্প হলো, যৌথ উদ্যোগে একটি সার কারখানা স্থাপন করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমি, দক্ষতা প্রদান এবং মিয়ানমারের প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করে উভয়ই উপকৃত হতে পারে।[১৫]

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সহযোগিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হলো- প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামীণ ট্রাস্টের প্রতিলিপি ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প বার্মার ডেল্টা জোন। বিশ্বখ্যাত গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখা গ্রামীণ ট্রাস্ট যার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস, যিনি দরিদ্র পরিবারগুলোকে একটি ব্যাংকিং সিস্টেমের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকেন। মিয়ানমারে গ্রামীণ প্রতিরূপন প্রকল্প অসামান্য সাফল্য পায়। ১৩ হাজার পরিবারকে একসাথে ঋণ প্রকল্পের আওতায় নিয়ে এসে দারিদ্র মোচনের চমৎকার নজির তৈরি হয়। এ থেকে ধারণা হয় যে, প্রকল্পের সাফল্য বর্মি সমাজের মাতৃতান্ত্রিক প্যাটার্নের প্রতিও যথেষ্ঠ ঋণী, যেহেতু শুরু থেকেই গ্রামীণ ব্যাংক নিজেই নারীদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করে। এই প্রকল্প গ্রামীণের ৬ জন বাংলাদেশী কর্মীদের দ্বারা ইউএনডিপি'র (UNDP- United Nations Development Programme) অর্থায়নে পরিচালিত হয়।

এছাড়াও ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর-এ একটি নতুন আঞ্চলিক সহযোগিতার সংস্থা হিসেবে বিমসটেক (BIMSTEC- Bangladesh India Myanmar Sri Lanka Thailand Economic Cooperation)-এর ব্যাংককে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিমসটেক গঠনের পাশাপাশি ১৯৯৭ সালের জুলাই-এ মিয়ানমার আসিয়ানের সদস্যপদ লাভ করে। যেখানে মিয়ানমারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। মিয়ানমারের কূটনীতিক এবং ব্যবসায়ীরা দ্রুত আঞ্চলিক সহযোগিতার ভাষা এবং নীতি গ্রহণ করেছে। ধীরে ধীরে হলেও মিয়ানমারে পুরাতন আবদ্ধ শৈলী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, নে উইনের সমাজতান্ত্রিকতার দ্বার রুদ্ধ হচ্ছে। বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে এই নতুন গোষ্ঠী গঠনকে মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখা হয়।

বিমসটেকের গঠনে ভারত, মিয়ানমার ও বাংলাদেশ একসঙ্গে 'ত্রিমুখী ধারণা'র জন্ম দেয়। এই ধারণা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB- Asian Development Bank) ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP- United Nations Development Programme) দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল, মণিপুর ও আসামে মিয়ানমার থেকে গ্যাস সরবরাহ নিয়ে উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতে গ্যাস রপ্তানির অনুমতি দিতে বাংলাদেশের ওপর মার্কিন সরকারের চাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেখানে মার্কিন সরকার চট্টগ্রামে একটি নতুন কন্টেইনার বন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানান। মিয়ানমারও রাখাইন উপকূলে এমন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনিয়োগ করে। এ থেকে বিশেষত জ্বালানি ও অবকাঠামো এলাকায় বাংলাদেশ-মিয়ানমারের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক আগ্রহ প্রকাশ পায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, কয়েক দশক ধরে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৬]

বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পর্ক অবশ্যই নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা করে বজায় রাখতে হবে। মিয়ানমারের অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান কাজেই বাংলাদেশকে আন্তঃসীমান্ত ব্যবসার মাধ্যমে লাভজনক খাতে নিযুক্ত হওয়া উচিত। চীন থেকে আন্তঃসীমান্ত ট্রানজিটে মিয়ানমারের সংযুক্ত হওয়া বাংলাদেশের এজেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া উচিত।[১৭]

এশিয়ান হাইওয়ে পাকিস্তান থেকে ভারত, বাংলাদেশ হয়ে মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মংডু থেকে সিটুওয়ে এবং সিটুওয়ে থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত সড়ক ও জল সংযোগগুলি উন্নত করতে মিয়ানমারকে প্রস্তাব করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ মিয়ানমারকে সিটুওয়েতে বাণিজ্যিকভাবে বিমান চলাচল এবং উপকূলীয় জাহাজ ব্যবহার করার জন্য প্রস্তাব দেয়। চট্টগ্রাম থেকে কন্টেইনার ট্রান্সশিপমেন্টের জন্য বাংলাদেশকে মিয়ানমার কাইউকপায় (Kyaukpuy)- এর গভীর সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করতে প্রস্তাব দেয় যা সিটুওয়ের ৫০ মাইল দক্ষিণে চীনা এর দ্বারা নির্মাণাধীন।[১৮]

ভারত ছাড়া শুধুমাত্র মিয়ানমারই একমাত্র প্রতিবেশী যার সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে। এটা বাংলাদেশকে নির্দিষ্ট কৌশলগত সুবিধা প্রদান করে। এটি সমুদ্রের বিকল্প রাস্তা হিসেবে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্ভাব্য প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের সড়ক সংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তর

যোগাযোগের নেটওয়ার্ক তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় মিয়ানমারের সম্ভাব্য সম্ভাবনাও অধিক। মিয়ানমারের বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস, তেল, পাথর প্রচুর যা থেকে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে লাভবান হতে পারে। এ কারণে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মিয়ানমারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। মিয়ানমারের সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র বিদ্রোহী দলগুলির সুবিধা, যা ঐ অঞ্চলে অস্থিরতার কারণ হতে পারে এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত হুমকি সরূপ।[১৯]

সাম্প্রতিককালে মিয়ানমার ইউনিয়নের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মিয়ানমার ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার পর থেকে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত সামরিক শাসনের অধীনে ছিল কিন্তু সেখানে এখন নতুন আধা-বেসামরিক নির্বাচিত সরকারের উত্থান হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে মিয়ানমার দুর্নীতিবিরোধী আইন, মুদ্রা বিনিময় হার, বৈদেশিক বিনিয়োগ আইন এবং করারোপণ সংস্কারের নীতি চালু করেছে।[২০]

কাজেই মিয়ানমারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ বিবেচনায় মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক আরো জোরদার করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সহযোগিতা বহুস্তর এবং বহুমুখী হতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক কূটনীতি এই তিন ধারার কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। কেননা মিয়ানমারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে। এক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ইস্যুর বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান এবং উভয় দেশই প্রবাহমান সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে পারে। বহুমুখী কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে বিভিন্ন খাতে আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশই সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।[২১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মিয়ানমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উজ্জ্বল অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দেশ থেকে বিচ্ছিন্নতার নীতির ফলে আজ প্রায় সব আর্থ-সামাজিক সূচক দ্বারা বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বারা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার দ্ব্যর্থক ফলাফল হলো মিয়ানমারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। বিশ্বায়নের যুগে পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞার পরেও ধাপে ধাপে এশিয়ার দেশগুলো মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন মাধ্যমে বাণিজ্য চুক্তিতে প্রবেশ করছে। এদের মধ্যে চীন, ভারত ও থাইল্যান্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

কারণ মিয়ানমার আবাদি জমি, বন, খনিজ (গ্যাস ও তেল সহ), বিশুদ্ধ পানি ও সামুদ্রিক সম্পদ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং এর সঙ্গে পাঁচটি দেশের সীমানা রয়েছে। মিয়ানমারের সঙ্গে চীনের মোট সীমান্ত ২১৮৫ কিলোমিটার, ভারতের ১৪৬৩ কিলোমিটার, থাইল্যান্ড ১৮০০ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ১৯৩ কিলোমিটার। মিয়ানমারের ভূ-কৌশলগত অবস্থানের ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা আসিয়ান (ASEAN-Association of Southeast Asian Nations), বিমসটেক (BIMSTEC- Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), বিসিআইএম (BCIM- Bangladesh, China, India and Myanmar) ফোরাম সহ ছয়টি আঞ্চলিক ও উপ-

আঞ্চলিক অংশ তৈরি হয়েছে। মিয়ানমার গঙ্গা-মেকং কোঅপারেশন (Ganga-Mekong Cooperation) এর সদস্য এবং সার্কভুক্ত কিছু দেশ ও এর সদস্য দেশগুলো একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য এই সব সংস্থা সম্পর্কিত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে থাকে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটা স্বীকৃত যে, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক মজবুত হওয়ার জন্য প্রথমত, দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ পদ্ধতি প্রয়োজনীয় শর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, সুশীল সমাজের সঙ্গে জড়িত শক্তিশালী পদ্ধতির মাধ্যমে আরো জোর দিয়ে এই সম্পর্ক মোকাবিলা করা উচিত। তৃতীয়ত, উভয় দেশের বেসামরিক নাগরিকদের জড়িত করে সহযোগিতা, সংহতির সর্বোচ্চ স্তর প্রদান এবং উভয় অর্থনীতির জন্য হিতকর সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উভয় দেশরই সাহায্যের হাত প্রসারিত করা উচিত।

এরই প্রেক্ষাপটে সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে বিএমসিসিআই (BMCCI- Bangladesh-Myanmar Chamber of Commerce and Industry) এবং আরএসসিসিআই (RSCCI- Rakhaine State Chamber of Commerce and Industry) বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার লক্ষ্যে আঞ্চলিক আইন এবং বিধি-বিধান যৌথভাবে সমন্বয়ে একমত হয়ে বাণিজ্যে বিনিয়োগ ও ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারকে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরা উভয়ই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বাণিজ্য ও ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক আইন এবং বিধি-বিধান সংশোধনের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সরকারকে অনুরোধ করে। সরকারি পর্যায়ে ধীরগতির পরিপ্রেক্ষিতে বিএমসিসিআই এবং আরএসসিসিআই নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করে উভয়ই ঘনিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের ধারণাগুলি সঙ্গে শক্তি উৎপাদনের (নদী জলপ্রপাত ইত্যাদি) দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করতে পারে।[২২]

তাই রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক অর্জন করা প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশ সরকারকে আঞ্চলিক শান্তি ও অর্থনৈতিক সংহতি নিশ্চিত করার জন্য বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলে উত্থাপনের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত।[২৩] কেননা মিয়ানমারের কৌশলগত এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানই মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সহযোগিতার সম্পর্কে অপরিমেয় সুবিধা বয়ে আনবে। তাই বাংলাদেশ-মিয়ানমার উভয়েরই নিজেদেরকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে বরং এই প্রেক্ষাপটে প্রচলিত স্থিতাবস্থার সঙ্গে মানিয়ে বিচ্ছিন্নতা নীতি পরিহার করে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করা উচিত।[২৪]

তথ্যনির্দেশ-

১. রতন লাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক (১৭৮৫-১৮২৪)*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৮৪, এশিয়াটিক প্রেস), পৃ. ২০৪।

২. Kaiser Morshed, *Bangladesh–Burma relations,* http://www.idea.int/asia_pacific/myanmar/upload/chap2.pdf.

৩. Abu Salah Md.Yousuf & Md. Muhibbur Rahman, Bangladesh-Myanmar Relations: The Context of Political and Economic Reforms in Myanmar, *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS),* Dhaka, Bangladesh.

৪. Kaiser Morshed*, Bangladesh-Burma relations,* http://www.idea.int/asia_pacific/myanmar/upload/chap2.pdf.

৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*- ১৬ মে ২০০২।

৬. *প্রাগুক্ত*- ২৯ জানুয়ারী, ২০০৬।

৭. Kaiser Morshed, *Bangladesh-Burma relations,* http://www.idea.int/asia_pacific/myanmar/upload/chap2.pdf.

৮. দৈনিক ইত্তেফাক - ২৯ জানুয়ারী, ২০০৬।

৯. Sonia Farhana Rahman, *Bangladesh-Myanmar Bilateral Relations and Regional Implications,* M. Phil. thesis in International Relations, University of Dhaka, (Dhaka University Institutional Repository, July 2014), p. III.

১০. Kaiser Morshed, *Bangladesh-Burma relations*, http://www.idea.int/asia_pacific/myanmar/upload/chap2.pdf.

১১. Obayedul Hoque Patwary, "Bangladesh-Myanmar Relations: The Security Dimension", *Bangladesh Institute of Peace and Security Studies (BIPSS).*

১২. Kaiser Morshed, *Bangladesh-Burma relations,* http://www.idea.int/asia_pacific/myanmar/upload/chap2.pdf.

১৩. Pranab Kumar Panday, *Bangladesh-Myanmar relations: smooth sailing,* https://translate.google.com/translate?hl=bn&sl=en&u=http://www.eastasiaforum.org/2012/07/28/bangladesh-myanmar-relations-smooth-sailing/&prev=search.

১৪. Kaiser Morshed, *Bangladesh-Burma relations*, http://www.idea.int/asia_pacific/myanmar/upload/chap2.pdf.

১৫. Ashfaqur Rahman. "Bangladesh-Myanmar Relations-The Economic Dimension." *Centre for Foreign Affairs Studies* (CFAS), (2013), pp.1-5.

১৬. Kaiser Morshed, *Bangladesh-Burma relations*, http://www.idea.int/asia_pacific/myanmar/upload/chap2.pdf.

১৭. Zahedul Amin, *Changing Dynamics in Myanmar Impact Bangladesh's Geopolitics*; http://thediplomat.com/2014/06/changing-dynamics-in-myanmar-impact-bangladeshs-geopolitics/.

১৮. Kaiser Morshed, *Bangladesh-Burma relations*, http://www.idea.int/asia_pacific/myanmar/upload/chap2.pdf.

১৯. Obayedul Hoque Patwary, "Bangladesh-Myanmar Relations: The Security Dimension", *Bangladesh Institute of Peace and Security Studies (BIPSS)*.

২০. Debapriya Bhattacharya & Mashfique Ibne Akbar, Recent Development in Myanmar and New Opportunities for Sub-regional Cooperation: A Bangladesh Perspective, *Centre for Policy Dialogue (CPD),* Dhaka, September, 2012, p.1.

২১. Abu Salah Muhammad Yousuf & Md. Muhibbur Rahman, "Bangladesh-Myanmar Relations: The context of Political and Economic Reforms in Myanmar", *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS),* Dhaka, Bangladesh.

২২. Debapriya Bhattacharya & Mashfique Ibne Akbar, *Op.cit.,* p.22.

২৩. Zahedul Amin, *Changing Dynamics in Myanmar Impact Bangladesh's Geopolitics,* http://thediplomat.com/2014/06/changing-dynamics-in-myanmar-impact-bangladeshs-geopolitics/.

২৪. Debapriya Bhattacharya & Mashfique Ibne Akbar, *Op.cit.,* p.23.

আলোকচিত্র

চিত্র ১- ব্রিটিশ-বার্মায় সৈন্যদের তত্তাবধানের শ্রমিকরা...

ব্রিটিশ আমলে কৃষিকাজের জন্য পূর্ববাংলা থেকে বাঙালিরা প্রায় জনমানবশূন্য আরাকানের উর্বর উপত্যকায় যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার প্রশাসনকে আরাকান অবধি বিস্তৃত করেছিল। যে কারণে সীমান্তরেখা মুছে গিয়েছিল।

উৎস- http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people

চিত্র ২- অসহায় রোহিঙ্গা মায়ের (খাদ্য জোগানে অক্ষম) কোলে ২ মাস বয়সী অপুষ্ট শিশু।
উৎস-

https://www.google.com/search?q=Rohingya+picture&sa=N&biw=1252&bih=580&tbm=isch&imgil=spczrO8dSgslLM%253A%253BJqECL9942_8hCM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.huffingtonpost.com%25252Fnews%25252Frohingya%25252F&source=iu&pf=m&fir=spczrO8dSgslLM%253A%252CJqECL9942_8hCM%252C_&usg=__aHufsCESLIAa7ZHsGXDtXTueSBE%3D&ved=0ahUKEwiu1fPt76vMAhXUCo4KHTQTCu0QyjcILg&ei=OSUfV-7UD9SVuAS0pqjoDg#imgrc=X7iajSbUS1mpuM%3A

চিত্র ৩- রোহিঙ্গা শিশু।

উৎস-

https://www.google.com/search?q=Rohingya+picture&sa=N&biw=1252&bih=580&tbm=isch&imgil=spczrO8dSgslLM%253A%253BJqECL9942_8hCM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.huffingtonpost.com%25252Fnews%25252Frohingya%25252F&source=iu&pf=m&fir=spczrO8dSgslLM%253A%252CJqECL9942_8hCM%252C_&usg=__aHufsCESLIAa7ZHsGXDtXTueSBE%3D&ved=0ahUKEwiu1fPt76vMAhXUCo4KHTQTCu0QyjcILg&ei=OSUfV-7UD9SVuAS0pqjoDg#imgrc=X7iajSbUS1mpuM%3A

চিত্র ৪- মিয়ানমারে জাতিগত রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত সহিংসতা (Systematic violence)-এর নতুন প্রমাণ।

উৎস-

https://www.google.com/search?q=Rohingya+picture&sa=N&biw=1252&bih=580&tbm=isch&imgil=spczrO8dSgslLM%253A%253BJqECL9942_8hCM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.huffingtonpost.com%25252Fnews%25252Frohingya%25252F&source=iu&pf=m&fir=spczrO8dSgslLM%253A%252CJqECL9942_8hCM%252C_&usg=__aHufsCESLIAa7ZHsGXDtXTueSBE%3D&ved=0ahUKEwiu1fPt76vMAhXUCo4KHTQTCu0QyjcILg&ei=OSUfV-7UD9SVuAS0pqjoDg#imgrc=X7iajSbUS1mpuM%3A

চিত্র ৫- বাংলাদেশে বেসরকারি কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গারা (কক্সবাজার, বাংলাদেশ- ফেব্রুয়ারী, ২০০৯)।

উৎস-

https://www.google.com/search?q=Rohingya+picture&sa=N&biw=1252&bih=580&tbm=isch&imgil=spczrO8dSgslLM%253A%253BJqECL9942_8hCM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.huffingtonpost.com%25252Fnews%25252Frohingya%25252F&source=iu&pf=m&fir=spczrO8dSgslLM%253A%252CJqECL9942_8hCM%252C_&usg=__aHufsCESLIAa7ZHsGXDtXTueSBE%3D&ved=0ahUKEwiu1fPt76vMAhXUCo4KHTQTCu0QyjcILg&ei=OSUfV-7UD9SVuAS0pqjoDg#imgrc=X7iajSbUS1mpuM%3A

চিত্র ৬- বাংলাদেশ শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গা শিশু।

উৎস-

https://www.google.com/search?q=Rohingya+picture&sa=N&biw=1252&bih=580&tbm=isch&imgil=spczrO8dSgslLM%253A%253BJqECL9942_8hCM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.huffingtonpost.com%25252Fnews%25252Frohingya%25252F&source=iu&pf=m&fir=spczrO8dSgslLM%253A%252CJqECL9942_8hCM%252C_&usg=__aHufsCESLIAa7ZHsGXDtXTueSBE%3D&ved=0ahUKEwiu1fPt76vMAhXUCo4KHTQTCu0QyjcILg&ei=OSUfV-7UD9SVuAS0pqjoDg#imgrc=X7iajSbUS1mpuM%3A

চিত্র ৭- পদ্ধতিগত গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গা জমজ শিশু।
রাখাইন রাজ্যের সিটুওয়েতে দার পেইঙ্গ শিবিরে (Dar Paing camp) অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা মা নূরবেগুন (Norbagoun) এর কোলে অপুষ্ট ২৫ দিন বয়সী জমজ শিশু, ২৪শে এপ্রিল, ২০১৪।

উৎস-

https://www.google.com/search?q=Rohingya+picture&sa=N&biw=1252&bih=580&tbm=isch&imgil=spczrO8dSgslLM%253A%253BJqECL9942_8hCM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.huffingtonpost.com%25252Fnews%25252Frohingya%25252F&source=iu&pf=m&fir=spczrO8dSgslLM%253A%252CJqECL9942_8hCM%252C_&usg=__aHufsCESLIAa7ZHsGXDtXTueSBE%3D&ved=0ahUKEwiu1fPt76vMAhXUCo4KHTQTCu0QyjcILg&ei=OSUfV-7UD9SVuAS0pqjoDg#imgrc=X7iajSbUS1mpuM%3A

চিত্র ৮- আমাদের পানি দাও: থাইল্যান্ড থেকে ফিরে আসা নৌকায় ভাসমান রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী অভিবাসীরা পানি ও খাদ্যের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।

উৎস-

https://www.google.com/search?q=Picture+of+Rohingya&tbm=isch&imgil=810PgU8mHbivQM%253A%253BR_eSXIT275m_xM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.wessexscene.co.uk%25252Finternational%25252F2016%25252F01%25252F30%25252Frecognise-the-rohingya-end-the-genocide-part one%25252F&source=iu&pf=m&fir=810PgU8mHbivQM%253A%252CR_eSXIT275m_xM%252C_&usg=__8qxltrrQV4TBaZErK6EJJleVXo0%3D&biw=1252&bih=580&ved=0ahUKEwjmrOf-wKvMAhVIFJQKHcc1C2MQyjcIMg&ei=FPQeV-bSDsio0ATH66yYBg#imgrc=810PgU8mHbivQM%3A

চিত্র ৯ - জাফরান বিপ্লবের নেপথ্যে যারা নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন ছবিতে চিহ্নিত কিং জিরো (King Zero) তাদের মধ্যে অন্যতম।
উৎস-

https://www.google.com/search?q=Saffron+revolution&client=firefox-b-ab&tbm=isch&imgil=2hqRY4r_HVXd0M%253A%253Bn3ZiB0Ox6z9U_M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Famnestyseattle.org%25252F%25253Fp%2525253D374&source=iu&pf=m&fir=2hqRY4r_HVXd0M%253A%252Cn3ZiB0Ox6z9U_M%252C_&usg=__oQLDxE5pQajRk5tGfKN19vn99aw%3D&biw=1252&bih=580&ved=0ahUKEwjx39Oth4nNAhWHP48KHcbtBXQQyjcIOA&ei=HABQV_HhJof_vATG25egBw#imgrc=7f-_PlRo8iP1iM%3A

চিত্র ১০- থাইল্যান্ড থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত ২৯ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীর মধ্যে একজনের ছবি।

উৎস-

https://www.google.com/search?q=Picture+of+Rohingya&tbm=isch&imgil=810PgU8mHbivQM%253A%253BR_eSXIT275m_xM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.wessexscene.co.uk%25252Finternational%25252F2016%25252F01%25252F30%25252Frecognise-the-rohingya-end-the-genocide-part-one%25252F&source=iu&pf=m&fir=810PgU8mHbivQM%253A%252CR_eSXIT275m_xM%252C_&usg=__8qxltrrQV4TBaZErK6EJJleVXo0%3D&biw=1252&bih=580&ved=0ahUKEwjmrOf-wKvMAhVIFJQKHcc1C2MQyjcIMg&ei=FPQeV-bSDsio0ATH66yYBg#imgrc=810PgU8mHbivQM%3A

গ্রন্থপঞ্জী

সরকারি উৎস

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, ১৫ খণ্ডে সন্নিবেশিত, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, (ঢাকা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত, ১৯৮২-৮৫)। বার্ষিক আমদানি ব্যয়, পরিসংখ্যান বিভাগ, *বাংলাদেশ ব্যাংক*। বার্ষিক রপ্তানি আয়, পরিসংখ্যান বিভাগ, *বাংলাদেশ ব্যাংক*। বাংলাদেশের বাণিজ্য চিত্র, *বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো*, ঢাকা (বিভিন্ন বছরের)।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

Statistical Yearbook of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning, Government of the Peoples Republic of Bangladesh. Annual Export Receipts, Statistics Department, Bangladesh Bank. Import Payment by Countries/Territories and Commodities, Statistical Department, Bangladesh Bank.

অপ্রকাশিত সরকারি উৎস

মুহাম্মদ সিদ্দিক খান সংগ্রহ: প্রয়াত মুহাম্মদ সিদ্দিক খান অত্যন্ত পরিশ্রম করে ভারতীয় মহাফেজ খানা হতে এই দলিল পত্র সংগ্রহ করেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছেন। এই মহান অবদানের কথা স্মরণ করেই এই গ্রন্থে ব্যবহৃত মুহম্মদ সিদ্দিক খান সংগৃহীত দলিল পত্রের শিরোনাম দেয়া হলো *M. S. Khan Collection* শব্দ সংক্ষেপ করে *M.S.K.C.*। তাঁর সংগৃহীত দলিল পত্র নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়-

Political Consultations, 1794 - 1824.
Secret Consultations, 1794 - 1824.
Political Letters to Court, 1794 - 1824.
Political Letters from Court, 1794 - 1824.
Secret Letters to Court, 1794 - 1824.
Foreign Miscellaneous Records, 1794 - 1824.
Military Department Miscellaneous Records, 1794 - 1824.
Political Department Miscellaneous Foreign Records, 1794 - 1824.
Judicial Department Miscellaneous Records, 1794 - 1824.

প্রাথমিক উৎস

1. Pacts Between Bangladesh and Myanmar Government.
2. Memorandum of Understanding (বিভিন্ন ক্ষেত্রে).
3. Bangladesh Bank Report.
4. Bangladesh Economic Relations Department (ERD) Papers.

দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎস

গবেষণা অভিসন্দর্ভ

সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, *'বাংলাদেশ-নেপাল সম্পর্ক, ১৯৭১-১৯৮১'* (অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

আবু মোহাম্মদ দেলোওয়ার হোসেন, *'বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক, ১৯৭১-১৯৮১'* (অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

খোঃ লুৎফুল এলাহী- *রোহিঙ্গা সমস্যা ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাংলাদেশে এর প্রভাব*, (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩)।

Md. Shayeed Hossain, *Bangladesh-Myanmar Relations, 1972-2010,* (Unpublished Ph.D thesis, Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi, 2014).

Sudhanshu Ranjan Ray, *Bangladesh-Malaysia Relations, 1772-2006: A Historical Analysis,* (Unpublished Ph.D. Thesis, IBS, University of Rajshahi, 2008).

সুধাংশু রঞ্জন রায়, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক, ১৮৮৬-১৯৪৭*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য পেশকৃত অভিসন্দর্ভ)।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধ (ইংরেজি)

G. E. Harvey, *History of Burma,* (London, 1967), P. 148.

D. G. E. Hall, *Burma,* London, 1950.

Maunghtion Aung, *A History of Burma,* (London, 1967), P. 195.

Surendra Prasad Singh, *Growth of Nationalism in Burma – 1900-1942,* Calcutta Firma KLM Private Limited, 1980.

Lieutenant Colonel to the Commander-in-Chief, Political Consultations (henceforth reffered p. c), 25 as April, 1794 No. 14, *Mahammad Siddiq Khan Collections* (henceforth reffered as M. S. K. C), Political Proceedings, (henceforth reffered as P.P), Vol. 1.

Imtiaz Ahmed (Editor), *The Plight of the State Less Rohingyas* (The university press limited Dhaka- 2010).

Muhammad Serajuddin Alamgir, *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong,* (Chittagong University 1971).

Martin Smith, *Burma: Insurgency and the politics of Ethnicity,* (The University press Limited, Dhaka, 1991).

Shwe Lu Maung, *Burma-Nationalism and Ideology-analysis of society culture and politics,* (The university press Limited, Dhaka-1989).

Mohammad Ali Chowdhury, *Bengal-Arakan Relations (1430-1666),* Kolkata: Firma KLM Private Limited, 2004.

David. I. Steinberg, *Burma/Myanmar what everyone needs to know,* (Oxford University press, New York), 2010.

S.M. Ali, Arakan Rule in Chittagong, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Vol. XII, No. 3, December, 1967.

Ratan Lal Chakraborty, 'Some Aspects of the Anglo-Arakanese Relations', 1760-1785', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* Vol. XX, 1975.

M. S. Khan, 'Captain George Sorrel's Mission to the Court of Amarapura, 1793-94: An Episode in Anglo-Burmese Relations', *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Vol. II, 1957.

- 'Cox of Cox's Bazar', *The Pakistan Review*, Vol. II, No. 9, September, 1954.

S. M. Ali, '*History of Chittagong'* (Dacca, 1964).

C. W. Bird, *Wanderings in Burma,* (London, 1897).

J. F. Cady, *A History of Modern Burma,* (Cornell University Press, 1958).

D. G. E. Hall (ed.), *Michael Symes: Journal of his Second Embassy to the Court of Ava in 1802,* (London 1955).

Michael Handel, *Weak states in the international system,* (London: Frank Cass, 1981).

David Vital, *The Inequality of States: A Study of the Small Power in International Relations,* (Oxford: Clarendon Press, 1969).

P. J. Boyce, *Foreign Affairs For New States,* (New York: St. Martin's Press, 1977).

A. K. Kemal, *'Economic Indicators as a Requirement for Security',* in Sayed Farooq Hasnat and Anton Pelinka, Security for the Weak Nations: A Multiple Perspective; (Lahore: Izharsons, 1987).

Robert Rothstein, *Alliance and Small Powers,* (New York: Columbia University Press, 1968).

Karl W. Deutsch, *The Analysis of International Relation,* (Englewood cliffs, N.J: Prentice-Hall Inc, 1968).

Shaheen Akhtar, *Determinants of Foreign Policy Behaviour of Small States* 'in south asia' Regional Studies (Islamabad), Vol.x111, No-2 Spring 1995.

James. J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle For Power And Peace*; New York: Alfred A Knopf, 1963.

Talukder Moniruzzaman, *The Security of Small State in the third world*---Canberra: Canberra Papers on Strategy and Deviance, NO: 5, (The Australian National University, 1986).

Erling Bjol, *"The Small States in International Politics",* in August Schou and Arne Olax Brundtland, Small States in International Relations; Stoclholm: Almqvist and Wiksell.1971.

Paul Commack, David Pool and William Tordaff, *Third World Politics*, (London: The Macmillan Press Ltd, 1988).

Golam Mostofa, *National Interest And Foreign Policy*, (Delhi: South Asian publishers, 1995).

Dr. Sushil Agarwal, *Super Powers And The Third World,* (Jaipur: Aalekh Publications, 1985).

Mohammad Ayub, *Conflict And Intervention In The Third World,* (New York: St. Martins Press, 1980).

Frederick Gaige, *The Role of Terai in Nepal's Economic Development*, Vasudha' Vol-XI, 1971.

Norman J, Padelford, George A Lincoln and Lee D. Alvey "*The Dynamics of International Politics*", (New York: Macmillan Publishing co, 1976).

Emajuddin Ahmed (ed.), *Bangladesh Foreign Policy,* (Dhaka: University Press limited, 1984).

Md. Abdul Halim, "*Foreign Policy of Bangladesh: Framework of Analysis,"* in Emajuddin Ahmed (ed.) *Foreign Policy of Bangladesh, A Small States Imperative,* (Dhaka: UPL, 1984).

S. R. Chakravarty, *Foreign Policy of Bangladesh,* (Delhi: Har Anand Publications, 1994).

A. M. A. Muhit, *Bangladesh: Emergence of A Nation,* (Dhaka University Press Ltd. 1978).

Henry Wheaton, *Elements of International Law with a Sketch of History of the Science,* (B Fellows London 1836).

Green Haywood Hackworth, *Digest of international Law,* Vol. II, (US Government Printing Office, Washington, 1941).

Arthur Nussabaum, *A Concise History of the Law of Nation,* (New York, 1961).

L. Oppenheim, *International Law:* Vol. I, law of Peace, (Longman, London 1953).

C. John Colombos, *The International Law of the sea,* (Longman London, 1968).

G. J. Mangone, *Law for the World Ocean,* (Stev & Sons, London).

D. P. O. Connell, *International Law of the Sea,* Ed .by I. A. Shearer, (Clarendon, Oxford 1982).

L. C. Green, *International Law Through case,* (Stevens, London, 1959).

L. Oppenheim, *International Law: A treatise.* Vol. II: Disputes War & Neutrality, Edited by H. Lauterpacht, (Longman London, 1955).

M. Habibur Rahman, '*Delimitation of Maritime Boundaries: A Survey of Problems in the Bangladesh Case*', Asian Survey, Vol. 24, No. 12, December 1984.

Second United Nations Conference on the Law of the Sea: Official Records Geneva, 1960.

Yearbook of the United Nations 1991, Vol. 45, United Nations New York, 1992 (Maritinus Nijhoff Publishers).

The Bangladesh Gazette: Extraordinary: Part V, (February 14, 1974, Government printing press, Dacca).

The Law of the Sea: Baselines: National Legislation with Illustrative Maps, Office of the Ocean Affairs and the Law of the Sea, United Nations. New York, 1989.

The Law of the Sea: National Legislation & E. E. 2., Office of Special Representative of Secretary General for the Law of the Sea, U.N. N.Y. 1986.

UN Law of the Sea Convention 1982, Official Text.

Sadeq Khan, '*Reorienting Ties with People of Bay of Bengal Littoral*', (Holiday, August 30, 1991).

Md. Khurshid Alam & Mizanur Rahman, '*A Study on the land Accretion in the Bay of Bengal and Session to Accelerate the Process*', Bangladesh Journal of Geology, Vol. 1982.

Coastal Environmental Management Plan for Bangladesh, Vol. One, Summary, United Nations (ESCAP) Bankok, Thailand.

Md. Ramjul Huq, 'Exclusive Economic Zone in the Bay of Bengal: Implications for Bangladesh and other Littoral States', *Social Science Review*, The Dhaka University Studies, Part-D, Vol. VII, December 1990, No. 2.

Asian Year book, 1979.

Shahed Hassan, Some Observation on Resource Potential and Depletion Trend in Coastal Areas of Bangladesh, *Social Science Review,* Vol. IX, No. 1, June 1992.

H.E. Dago Tahoring, The New Convention on the Law of the Sea: Its Present and Its Future, *ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রে পঠিত প্রবন্ধ।*

Law of the Sea Bulletin No. 9, November 1987.

Md. Habibur Rahman, '*The Maritime Jurisdiction– Where is the End?*' *South Asian studies,* (Lahore, January, 1988).

UN Law of the Sea Convention: Official Text, op. cit.; Lt. com. James Stavrides, '*Marine Technology Transfer and the Law of the Sea*', in Naval War College Review, July - August 1983.

Nurul Momen, *Bangladesh in the United Nations: A Study in Diplomacy,* (University Press Ltd. Dhaka January 1987).

The Marine Fisheries Ordinance 1983 (No. XXXV of 1983), Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 19th July 1983, pp. 16;

The Marine Fisheries Rules 1983, The Bangladesh Gazette, Extraordinary, September, 12, 1993.

The First Five Year Plan, 1973-78, Planning Commission, Ministry of Planning, Government of peoples' Republic of Bangladesh, November,1973; *The Second Five Year Plan, 1980-85,* May 1980; *The Third Five Year Plan, 1985-90,* December 1985. *The Fourth Five Year Plan, 1990-95,* May 1990.

Activities and Achievements of the Beach Sand Exploration Centre, *Bangaldeh Atomic Energy Commission,* Cox's Bazar, April 1985, p. 4/A.

Mathew Louis to the Collector of Chittagong 10 June, 1788, *B. S. R., C. D.,* Vol. 443.

Aspinal, A., English Relations with Burma in the Time of Cornwallis and Shore', *B. P. P.,* Vol. XL, 1930.

Bengal Political Consultations, 1 October, 1799, quoted in Aspinal, A., "English Relations with Burma in the Time of Cornwallis and Shore," *B.P.P.,* Vol. XL, 1930, p.125.

Envoy to the court of Ava to the Governor, *P. C.,* 21 October, 1795, No. 35*, M. S. K. C.,* Vol. 2.

Governor General's Minute, 10 November, 1794, *M.S.K.C.,* Vol. 1.

Raja of Arakan to the Lieutenant Colonel, *P. C.,* 10 November, 1794, No. 46, *M. S. K. C.,* Vol. 1.

Envoy to the court of Ava to the Governor General, *P.C.,* 21 October, 1795, No. 2, *M. S. K. C.,* Vol. 2.

Envoy to the court of Ava to the Governor General, *P. C.,* 2 March, 1798, No. 4, *M. S. K. C.,* Vol.3.

Magistrate of Dacca to the Secretary to Government, *S.C.* 11 February, 1813, No. 17, *M.S.K.C.,* Vol. 5.

Beveridge, H., *The District of Bakarganj,* (London, 1876, Reprinted by Bakarganj District Council, 1970).

Hall Hutchinson, *Burma,* (London, 1955).

Max, *Sampson Low Marston,* Burma, (London, 1901).

Hillier Frederick. S, *Burma,* (Holden Day, San Francisco, 1968).

Sir, J. George Scott, *Burma: A Handbook of Practical Information with Numerous Illustration by the Author and Other,* (Moring, London, 1996).

M.A. Taher Ba Tha, *The Rohingyas and Kamans (in Burmese),* (Published by United Rohingya National League, Myitkyina, Burma, 1963);

Maung Than Lwin, *Rakhine Kala or Rohingya,* The Mya Wadi Magazine, July 1960.

N. M Habibullah, *Rohingya Jatir Itihas (History of the Rohingyas),* (Bangladesh Co-Operative Book Society Ltd., Dhaka, 1995).

গ্রন্থ ও প্রবন্ধ (বাংলা)

রতন লাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক (১৭৮৫-১৮২৪),* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৮৪, এশিয়াটিক প্রেস)।

রতন লাল চক্রবর্তী, "বাংলাদেশ ও বার্মায় জন-অভিবাসন প্রকৃতি ও তাৎপর্য (১৭৮৫-১৯৪৮)", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্দশ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৬।

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৩।

মাহবুবুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস: কোম্পানীর আমল*, (চট্টগ্রাম, ১৯৬৬)।

সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, "মায়ানমার: গণতন্ত্রের অন্বেষা", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ঢাকা, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

ডঃ মি, মু, আ, কুদ্দুস, ও ডঃ মোঃ শফি, *বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩)।

শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া ও এ,কে,এম রাশিদুজ্জামান, *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভূ-রাজনীতিক বাস্তবতা*, (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, জুলাই ১৯৯২)।

মুহাম্মদ রমজুল হক, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ঃ সমুদ্র আইন নীতি, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, দ্বাদশ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৌষ ১৪০১।

ডঃ মিজানুর রহমান, *পরিবর্তনশীল বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইন*, (পলল প্রকাশনী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৩)।

ডঃ মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ১৯৯০-১৯৯৯।

মোঃ আখতারুজ্জামান, "মধ্যযুগের বাংলা ও আরাকানের আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, পয়ত্রিশ বর্ষ, প্রথম - তৃতীয় সংখ্যা, ১৪০৮ বাংলা।

আহমেদ শরীফ, "চট্টগ্রামের ইতিকতা (আদিযুগ)," ইতিহাস, *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রাহায়ণ, ১৩৭৪।

এন. এম. হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৫।

স্বপ্না ভট্টাচার্য, *আরাকান ইতিহাসের একপর্ব*, ১৮২৪-১৮৮৫।

বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব.), *'দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা'*, (পালক পাবলিশার্স ঢাকা-২০০৬)।

আকমল হোসেন, "বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি: সার্বভৌমত্ব ও ধারাবাহিকতার সংকট", *এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ*, চতুর্দশ খন্ড, ১ম সংখ্যা জুন ১৯৯৬।

এম. এ. হালিম, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৬) ।

বাংলাদেশ গণপরিষদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত) ৯ ঢাকা: তারিখ উল্লেখ নেই)।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও সাম্প্রতিক বিশ্ব*, (ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬)।

মুহাঃ রুহুল আমীন, *"বাংলাদেশের স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পররাষ্ট্রনীতি এবং বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্ক"*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা- ৫০, ৫১, ৫২ অক্টোবর, ৯৪ - জুন, ৯৫।

Reports

Priscilla Clapp, The Influence Foreign Policy: A Historical Perspective, Myanmar's Growing Regional Role, *NBR Reports* (Mar 2014), www.nbr.org/Publications/element.aspx?id=739

Bangladesh Population Census 1991 Preliminary Report, July 1991, *Bangladesh Bureau of Statistics,* Dhaka.

Unpublished project pro-forma, *Marine Fisheries Research Management and Development project, Directorate of Fisheries,* Bangladesh, September-October, 1987.

Fish Catch Statistics of Bangladesh: 1984-85, Dept. of Fisheries, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।*

News Papers

The Observer

Shahidul Islam, 'Land Accretion and Land Reclamation in the Bay', *The Bangladesh Observer* – 6 October, 1975.
The Bangladesh Observer - 2 October, 1984.
The Bangladesh Observer - 29 June, 1985.

প্রথম আলো

প্রথম আলো- ৫ এপ্রিল, ২০০৪।
প্রথম আলো- ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮।
প্রথম আলো- ২৩ নভেম্বর, ২০০৮।
প্রথম আলো- ১ আগষ্ট, ২০০৯।
প্রথম আলো- ৫ অক্টোবর, ২০০৯।
প্রথম আলো- ২৫ নভেম্বর, ২০০৯।
প্রথম আলো- ৯ জানুয়ারী, ২০১০ ।
প্রথম আলো- ১০ জানুয়ারী, ২০১০।
প্রথম আলো- ২৬ এপ্রিল, ২০১১।
প্রথম আলো- ২৫ নভেম্বর ২০১১।
প্রথম আলো- ১৪ মার্চ, ২০১২।
প্রথম আলো- ১৫ মার্চ, ২০১২।
প্রথম আলো- ১৭ মার্চ, ২০১২।

প্রথম আলো- ১৮ মার্চ, ২০১২।
প্রথম আলো- ২ এপ্রিল, ২০১২।
প্রথম আলো- ৭ এপ্রিল, ২০১২।
প্রথম আলো- ১১ এপ্রিল, ২০১২।
প্রথম আলো- ১৩ জুন, ২০১২।
প্রথম আলো- ১৪ জুন, ২০১২।
প্রথম আলো- ২৮ জুলাই, ২০১২।

ইনকিলাব

ইনকিলাব- ১ জানুয়ারী, ১৯৯৩।
ইনকিলাব- ৮ আগষ্ট, ১৯৯৪।
ইনকিলাব- ৬ অক্টোবর, ১৯৯৫।
ইনকিলাব- ৭ অক্টোবর, ১৯৯৫।
ইনকিলাব- ৯ অক্টোবর, ১৯৯৫।
ইনকিলাব- ২৩ অক্টোবর, ১৯৯৫।
ইনকিলাব- ৩ নভেম্বর, ১৯৯৬।
ইনকিলাব- ৬ নভেম্বর, ১৯৯৬।
ইনকিলাব- ৬ মে, ১৯৯৭।
ইনকিলাব- ১৫ মে, ১৯৯৭।
ইনকিলাব- ১৮ জুন, ১৯৯৭।
ইনকিলাব- ২ জুলাই, ১৯৯৭।
ইনকিলাব- ৮ জুলাই, ১৯৯৭।
ইনকিলাব- ২ আগষ্ট, ১৯৯৭।
ইনকিলাব- ৫ আগষ্ট, ১৯৯৭।
ইনকিলাব- ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।
ইনকিলাব- ২৩ এপ্রিল, ১৯৯৮।
ইনকিলাব- ৬ আগষ্ট, ১৯৯৮।
ইনকিলাব- ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৮।
ইনকিলাব- ১২ জুলাই, ১৯৯৯।
ইনকিলাব- ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।
ইনকিলাব- ১০ অক্টোবর, ১৯৯৯।
ইনকিলাব- ১৩ অক্টোবর, ১৯৯৯।
ইনকিলাব- ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০০।

ভোরের কাগজ

ভোরের কাগজ- ৮ অক্টোবর, ১৯৯৪।
ভোরের কাগজ- ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৪।

ইত্তেফাক

ইত্তেফাক- ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪।
ইত্তেফাক- ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪।
ইত্তেফাক- ১ অক্টোবর ১৯৭৪।
ইত্তেফাক- ২ অক্টোবর ১৯৭৪।
ইত্তেফাক- ৬ অক্টোবর ১৯৭৪।
ইত্তেফাক- ৯ আগস্ট, ১৯৮৮।
ইত্তেফাক- ৪ জানুয়ারী, ১৯৯২।
ইত্তেফাক- ৭ জানুয়ারী, ১৯৯২।
ইত্তেফাক- ১২ জানুয়ারী, ১৯৯২।
ইত্তেফাক- ২০ জানুয়ারী, ১৯৯২।
ইত্তেফাক- ২ এপ্রিল, ১৯৯২।
ইত্তেফাক - ৭ মে, ১৯৯২।
ইত্তেফাক- ১২ মে, ১৯৯২।
ইত্তেফাক- ১৪ মে, ১৯৯২।
ইত্তেফাক- ১৫ মে, ১৯৯২।
ইত্তেফাক- ২৩ আগষ্ট, ১৯৯২।
ইত্তেফাক- ২৬ আগষ্ট, ১৯৯২।
ইত্তেফাক- ২৫ অক্টোবর, ১৯৯২।
ইত্তেফাক- ২২ ডিসেম্বর, ২০০১।
ইত্তেফাক- ১৬ মে ২০০২।
ইত্তেফাক- ১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩।
ইত্তেফাক- ১৬ জুন, ২০০৫।
ইত্তেফাক- ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫।
ইত্তেফাক- ৯ অক্টোবর, ২০০৫।
ইত্তেফাক- ৪ জানুয়ারী, ২০০৬।
ইত্তেফাক- ২৯ জানুয়ারী, ২০০৬।
ইত্তেফাক- ৪ আগষ্ট, ২০০৬।
ইত্তেফাক- ২১ অক্টোবর, ২০০৬।
ইত্তেফাক- ২১ এপ্রিল, ২০০৭।
ইত্তেফাক- ৬ আগষ্ট, ২০০৭।

ইত্তেফাক- ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৭।
ইত্তেফাক- ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮।
ইত্তেফাক- ২১ আগস্ট, ২০০৮।
ইত্তেফাক- ১০ অক্টোবর, ২০০৮।
ইত্তেফাক- ১১ নভেম্বর, ২০০৮।
ইত্তেফাক- ৬ ফ্রেব্রুয়ারী, ২০০৯।
ইত্তেফাক- ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯।
ইত্তেফাক- ২১ মে, ২০০৯।
ইত্তেফাক- ১৯ জুন, ২০০৯।
ইত্তেফাক- ২৬ অক্টোবর, ২০০৯।

সংবাদ

সংবাদ- ৮ অক্টোবর, ১৯৭৭ (বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস থেকে সংগৃহীত)।

আজাদ

আজাদ- ১৫ জানুয়ারী, ১৯৪৭।
আজাদ- ২০ জানুয়ারী, ১৯৯২।

আজকের কাগজ

আজকের কাগজ- ১৯ মে, ১৯৯৪।
আজকের কাগজ- ১১ এপ্রিল, ১৯৯৭।
আজকের কাগজ- ৫ এপ্রিল, ২০০৪।
আজকের কাগজ- ৬ এপ্রিল, ২০০৪।

Journal

Burma research Society

Journal of Burma Research Society, Vol. 1-40.
Journal of Burma Research Society, Rangoon, Vol. 38, 1955.

Journal of Thought Arkansas, University Press V. 13, 1978.

Refugee studies

Journal of refugee studies, Vol.13, no. 1-4, London: Oxford University Press (2000).
Journal of refugee studies, Vol.14, no. 1-4, London: Oxford University Press (2001).
Journal of refugee studies, Vol.15, no. 1-4, London: Oxford University Press (2002).
Journal of refugee studies, Vol.24, London: Oxford University Press (2002).

Dhaka courier

Barrister Harun Ur Rashid, Forty years of Bangladesh Foreign policy, *Dhaka courier,* Vol: 31, 2011.

BIISS Journal

M. Habibur Rahman, The Continental Shelf: A Study with Reference to the Bangladesh-India Situation, *BISS Journal,* Vol. II. No. 2, 1990.

A.K.M. Abdus Sabur, Foreign Policy of Bangladesh: Challenges in the 1990, *BIISS Journal,* Vol-14, No-2, 1991.

FARZANA HUSSAIN, Authoritarianism and prospect for Democracy in Myanmar, *BISS Journal,* Vol-13, 1-4, 1992.

M. Habibur Rahman, The Legal Basis for the Delineation of Baselines, *BISS Journal,* Vol. 6, No. 2, 1985.

M. Jashim Uddin, Prospects for Attaining a New Height in Bangladesh-Myanmar Relations: Bangladesh Perspective, *BIISS Journal,* Vol. 35, No. 1, 2014.

Yunus Ali Sheik, 'Bangladesh-Myanmar Relations: Making the Best of Proximity", *BISS Journal,* Vol. 19, 1998.

Peace Research

Hakan Wiberg, "The Security of Small Nations: Challenges and Defences", *Journal of Peace Research,* Vol.24, No. 4, 1987.

Asian Development Review

Asian Development Review, Vol. 3, No. 1, 1983.

Banglapedia

K M Mohiuddin, Rohingya, *Banglapedia*.

Foreign Affairs

Dr. Cameron Hill, Defence and Security Section, *Foreign Affairs,* 22 May 2012.

Southeast Asian Affairs

Ravi A. Balaram, Case Study: The Myanmar and Bangladesh Maritime Boundary Dispute in the Bay of Bengal and Its Implications for South China Sea Claims, *Journal of Current Southeast Asian Affairs,* Vol. 31, No. 3, PP. 87-88,

Internet

www.mesingapore.org.sg/policy.html.

http://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশ.

http://bn.wikipedia.org/wiki/ বাংলাদেশের _ পররাষ্ট্র _ মন্ত্রণালয়.

http://prouroblog.blogspot.com/2013/01/aims-and-objective-of-foreign-policy of.html#sthash.4oDblAoq.dpuf.

http://www.banglapedia.org/HT/F_0164.htm.

http://studiesbangladesh.blogspot.com/2011/05/brief-history-of-bangladesh.html.

http://visitbangladesh.gov.bd/about-bangladesh/history-of-bangladesh/.

www.myanmarbsb.org/foreign_policy.html.

www.mewashingtondc.com/MM_US_Relation_5.php.

www.embassyofmyanmar.be/ABOUT/foreignpolicy.htm.

http://www.amnestyusa.org/Myanmar-Constitution-Chapter-1.

www.mofa.gov.mm/foreignpolicy/fiveprinciples.html.

bn.wikipedia.org/wiki/wgqvbgvi.

http://www.infoplease.com/country/myanmar.html.

http://foreignpolicy.com/2013/05/31/myanmars-moment/.

https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_conflict_in_Burma;

https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Burma.

https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_Burma.

http://www.everyculture.com/Bo-Co/Burma.html.

http://www.oxfordburmaalliance.org/1962-coup--ne-win-regime.html.

http://thurj.org/ss/2015/05/5286/.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Burma.

http://www.oxfordburmaalliance.org/1990-2010-military-rule-continues.html.

http://assets.opencrs.com/rpts/RS22737_20090803.pdf.

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2011-2012/Burma.

Open Net Initiative, "Internet Filtering in Burma in 2005: A Country Study", July 31, 2005.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1317171.

https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums/asia-south-east-asia-mainland/topics/myanmar-to-chittagong-bangladesh?page=2.

http://asianhistory.about.com/od/Asian_History_Terms_N_Q/g/Who-Are-The-Rohingya.htm.

http://docslide.net/documents/chronologythe-timeline-of-burmas-rohingya-history-in-arakan-by-abid-bahar.html.

http://www.rohingya.org/portal/index.php/rohingya-library/26-rohingya-history/53-rohingyas-are-not-british-era-settlers.html.

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/261-myanmar-the-politics-of-rakhine-state.pdf.

www.bbc.com/news/world-asia-18395788-3 July, 2014.

org/about/Burma/conflict-and-human-rights/rohinga-ethnic-cleansing.html June, 2012

www.genocidewatch.org/mynmar.html 28 August 2013.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?News ID=45142#VWA SV6 Nxxjs-June 2013.

http://www.unhcr.org/pages49c4877d6.html2013-2014.

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/BGD_1974_Act.pdf.

http://www.nbr.org/publications/asia_policy/Preview/AP10_D_Maritime_preview.pdf

http://www.indoburmanews.net/archives-1/2009/july-2009/dhaka-delegation-in-naypyidaw-for-border-talks.

http://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2008/1104/p99s01-duts.html.

https://joynal.wordpress.com/2009/03/29/status-of-bangladesh-myanmar-trade-negotiations/.

http://www.muslimpopulation.com/pdf/Bangladesh_myanmar_relation.pdf.

http://www.globalsecurity.org/military/world/bangladesh/forrel-mm.htm .

http://www.idsa.in/event/myanmar-bangladeshrelation_ubsingh_150509.

http://www.freit.org/WorkingPapers/Papers/TradePolicyRegional/FREIT575.pdf.

http://www.newstoday.com.bd/index.php?option=details&news_id=2349350&date=2013-06-30.

http://www.idea.int/asia_pacific/myanmar/upload/chap2.pdf.

http://www.biiss.org/seminar%202013/papers/myanmar_presentation.pdf.

http://repository.library.du.ac.bd/xmlui/handle/123456789/769.

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lang=en&id=164383.

https://translate.google.com/translate?hl=bn&sl=en&u=http://www.eastasiaforum.org/2012/07/28/bangladesh-myanmar-relations-smooth-sailing/&prev=search.

http://thediplomat.com/2014/06/changing-dynamics-in-myanmar-impact-bangladeshs-geopolitics/.

http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/view/571/569.